সায়ন্তনী পুততুণ্ড

ছায়াগ্রহ

ছায়াগ্রহ

সায়ন্তনী পূততুণ্ড

সাহিত্যম্‌॥ কলকাতা
www.nirmalsahityam.com

CHAYAGRAHA
A Bengali Novel
by Sayantani Putatunda

SAHITYAM
18B, Shamacharan Dey Street,
Kolkata-700 073
Ph. : 2241 9238 / 4003 • Fax : 2241 3338
Email : nirmalsahityam@gmail.com
Web : www.nirmalsahityam.com

Price : ₹ 150.00

প্রথম সাহিত্যম্ সংস্করণ :
১লা বৈশাখ ১৪২৩

প্রকাশক :
শ্রীনির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান :
নির্মল বুক এজেন্সি
২৪বি, কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

© লেখক

মুদ্রক :
লোকনাথ বাইন্ডিং অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
কসবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল, কলকাতা-৭০০ ১০৮

প্রচ্ছদ :
সৌরিশ মিত্র

অক্ষর বিন্যাস :
টেকনোগ্রাফ
১/৯৮, নাকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৪৭

দাম : ১৫০.০০

উৎসর্গ

যিনি মহীরুহের মতো সবসময় আমায় ছায়ার শান্তি দিয়েছেন,
যাঁর উৎসাহে প্রথম উপন্যাস লেখার কাজে হাত দেওয়া,
সেই মহান মানুষটি—

শ্রীযুক্ত হীরেন চট্টোপাধ্যায়কে

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.bengaliboi.com

Click here

ছায়াগ্রহ

লকারটার একেবারে যাচ্ছেতাই দশা।

প্রোফেসর বিদ্যুৎ মুখার্জির ভুরুতে সামান্য ভাঁজ পড়ল। কতদিন এই লকারটা খোলা হয়নি কে জানে! স্টিলের আয়তাকার পরিসরটুকু ঢেকে আছে নুন মরিচ রঙের পাতলা স্তরে। দু-চারটে হালকা নকশা কাটা আঁশের উপর মাকড়সার পরিপাটি সংসার। ছোটো ছোটো একজোড়া বাচ্চা আরশোলা তাদের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারময় শীতল আশ্রয়ে বেশ শান্তিতেই দিন কাটাচ্ছিল। হঠাৎ একরাশ আলো এসে পড়তেই কোথায় গিয়ে লুকোবে ভেবে পেল না। কয়েকজোড়া কড়কড়ে পা নিয়ে প্রোফেসরের হাতে তড়বড় করে উঠে এল।

'আহ্...' ঘেন্নায় কুঁকড়ে দিয়ে তিনি সবলে হাত ঝাড়লেন—'যাঃ... যাঃ...'।

ঝাঁকুনির চোটে প্রাণী দুটো টুপ টুপ করে খসে পড়েছে। তারপর হুড়মুড় করে চেয়ারের হাতলে উঠে পড়ে জুলজুলে চোখে প্রোফেসরকে দেখছে।

প্রোফেসর সজোরে লকারটার পাল্লা আটকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—'কেষ্টদা...কেষ্টদা...।...।...।...।'

প্রোফেসর্স রুমের একপাশে বহুদিনের কালি ওঠা কেটলিতে টগবগ করে জল ফুটছে। কেরোসিন পোড়ার গন্ধে ঘর ভরপুর। প্রাচীন বটগাছের ঝুরির মতো শক্ত শক্ত শিরা ওঠা হাতে কেষ্টদা ফুটে ওঠা জলে চায়ের পাতা ফেলছিল। সচকিত হয়ে বলল—'কী হল?'

'একটা ঝাড়ন হবে?'

'ঝাড়ন! কী হবে!'

'লকারটা পরিষ্কার করব।'

'অন্য লকারে রাখো না! ওটা ছাড়া কি আর নেই?

প্রোফেসর একটু বিরক্তি মাখা চোখেই তাকালেন। রোদ্দুর পড়ে কালো

চুলের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারা রুপোলি তারগুলো ঝলসে উঠছে। আত্মমগ্ন বাদামি চোখদুটো সঙ্কুচিত করে বললেন—'উঠতে না পারো, কোথায় আছে বলে দাও। আমিই নিয়ে নিচ্ছি।'

কেষ্টদা গরম জলে চায়ের পাতা ফেলে দিয়ে উঠে এসেছে। চোখমুখে একরাশ অসন্তোষ। ঘ্যানঘ্যানে গলায় অভিযোগের তিক্ততা—'তুমি নিতে যাবে কোন্ দুঃখে? এখন কি আর ছোটোটি আছ! এখন তো তুমিই হত্তাকত্তা। কী যেন বলে। হেড অফ্ ডিপার্টমেন্ট্।

প্রোফেসর অস্ফুটে বললেন—'হেড অফ্ দ্য ডিপার্টমেন্ট'।

ওই হল। লোকে তোমায় ঝাড়ন হাতে দেখলে কী বলবে। না অমুক কলেজের হেড ঝাড়ু হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেটা শুনতে কি আমার ভালো লাগবে? না ভালো লাগার কথা? কেউ বলুক দেখি হাত পা থাকতে কেষ্টা সারের কোনো কাজ করে দেয়নি?

কেষ্টদা আর পাল্টাল না। প্রোফেসর হেসে ফেলে বললেন—'ঠিক আছে...ঠিক আছে। প্রোফেসর নীলাব্জ চৌধুরীর লকারটায় বড্ড ধুলো। একটু পরিষ্কার করে দাও দেখি। আমি ওখানেই আমার খাতাপত্র রাখব।'

'দিচ্ছি। সবুর করো।'

কেষ্টদা লাল, নীল, হলুদ, সবুজ মেশানো পাঁচ রঙা রোঁয়াওঠা ফুল ঝাড়ু নিয়ে ধুলো, ময়লা দূরীকরণের কাজে নেমে পড়ল। প্রোফেসর ঘর ছেড়ে করিডোরে বেরিয়ে এলেন।

কলেজের এই করিডোরটা তার চিরকালই বড়ো প্রিয়। আজকালকার দেশলাই বাক্স বিল্ডিং-এর একচিলতে বারান্দার মতো নয়। বরং বেশ প্রশস্ত। সবুজ রঙের গ্রিলের ঘেরাটোপে আবদ্ধ। মাধবীলতা এঁকেবেঁকে লোহার শক্ত শরীর জড়িয়ে ধরেছে। এ ছাড়াও নাম না জানা অনেক বনফুলের ঝাড়ে গোলাপি, হলুদ, সবুজের উজ্জ্বল সমারোহে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

প্রোফেসর মুখার্জি সেই একান্ত পরিচিত করিডোরে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত দৃষ্টিতে নিজের যৌবনের ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলেন। কত বছর আগের কথা হবে? তা প্রায় তিরিশ বছর। এই করিডোরটা ছিল তাদের আড্ডার জায়গা। সুচিত্রা সেন থেকে ডস্টয়েভস্কি, মাদাম কুরি থেকে পেলে সব প্রসঙ্গেরই ছিল অবাধ বিচরণ। আড্ডাধারীদের তর্কে-বিতর্কে, গানে-গল্পে সরগরম হয়ে উঠত এই করিডোর। সদ্য যৌবনে পদার্পণ করা

বিদ্যুৎ তখন তড়াক তড়াক করে সিঁড়ি টপকে লম্বা বারান্দার ও প্রান্তে এসে দাঁড়াত...সেই না-গুঁজে-পরা শার্ট, সেই ভারী পাওয়ারের চশমা, সেই উস্কোখুস্কো চুল...।

'হয়ে গেছে', একরাশ ঝুল জড়ানো ঝাড়ন আর বহুদিনের ধুলোপড়া বিবর্ণ একটা খাম হাতে নিয়ে কেষ্টদা বাইরে বেরিয়ে এসেছে—'যাও'।

প্রোফেসর কয়েকমুহূর্তের জন্য হারিয়ে গিয়েছিলেন অতীতে। কেষ্টদার ডাকে আলোকরশ্মির গতিবেগে সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশে ফিরে এলেন বর্তমানে। তিরিশ বছর পরে। যখন তিনি আর ছাত্র নন—একজন অধ্যাপক। উত্তরবঙ্গের কলেজে বহুদিন অধ্যাপনা করার পর বদলি হয়েছেন চেনা ক্যাম্পাসে—তার নিজের কলেজে।

কেষ্টদার ঘাড় বেড়ে ছোট্ট একটা পোকা সুড়সুড় করে উঠছিল। সেটাকে টোকা মেরে ফেলে দিয়ে বলল—'তুমি বাড়ি যাবে কখন? সবাই তো গেল।'

'যাব, তার আগে এককাপ র'চা খাওয়াও।' তিনি হাসলেন—'তোমার সেই বিখ্যাত লেবু চা'।

'তোমার এখনো মনে আছে?' তার চোখ চকচক করে উঠেছে—'দিচ্ছি এখনই, ভালো কথা, এটা কী দেখো তো! নীলাব্জবাবুর লকার ঝাড়তে গিয়ে বেরুল।' কেষ্টদা ফ্যাকাশে খামটা এগিয়ে দিয়েছে—'নীলাব্জবাবুর রিটায়ারের পর ও লকারে কেউ হাত দেয়নি। নোংরার একেবারে হদ্দ হয়েছিল। থাকগে, এ জিনিসটা কী দেখো। ফালতু জিনিস হলে জঞ্জাল-বাক্সে ফেলে দিয়ো।'

খামটার দশা সত্যিই শোচনীয়। তবু আন্দাজ করা যায় যে কোনোকালে ওটা গোলাপি ছিল। রঙের পুরোটাই বিলুপ্ত। শুধু রেশটুকুই যা বাকি। বিদ্যুৎ মুখার্জি খামটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। একটা চিঠি। নীলাব্জ চৌধুরীকে কেউ হায়দরাবাদ থেকে পাঠিয়েছে।

'দেখছি, তুমি আমায় চা দিয়ে যাও।' খামটা নিয়ে তিনি তার চেয়ারে এসে বসলেন। ভারী পাওয়ারের চশমাটা টেবিলের উপর পড়েছিল। সেটাকে নাকে লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে খাম পর্যবেক্ষণ করছেন। নিতান্তই সাধারণ খাম। সুন্দর সুছাঁদ টানা হস্তাক্ষরে নীলাব্জ চৌধুরীর নাম লেখা। প্রেরকের নাম নেই।

প্রোফেসর খামটা খুলতে একটু ইতস্তত করছিলেন। কে বলতে পারে যে এর ভিতরে কোনো প্রেমপত্র নেই! গোলাপি রংটা যথেষ্টই রোম্যান্টিক।

নীলাব্জ চৌধুরী মানুষটাও কম রোম্যান্টিক ছিলেন না। সৌম্যকান্তি, সদা হাস্যময়। 'রাগ' শব্দটা তার অভিধানে ছিল ব্রাত্য।

দ্বিধার সাথেই অবশেষে খামটা খুলে ফেললেন তিনি। ভিতরে চারভাঁজ করা সাদা কাগজ। সাদাটা অবশ্য অনুমান করে নিতে হল। বহুদিন পড়ে থাকার জন্য কাগজটা প্রায় হলদে। আবছা নীল রঙে চমৎকার হাতের লেখায় গোটা গোটা অক্ষরে সুস্পষ্ট প্রেরকের নাম—কৌশিক রুদ্র।

প্রোফেসর কৌশিক রুদ্র! হারিয়ে যাওয়া মানুষ! চোখের সামনে বিদ্যুৎ চমকের মতো ভেসে উঠল সুগঠিত দীর্ঘ শরীর। একজোড়া তীব্র চোখ। চাপ দাড়ি গোঁফে ঢাকা আকর্ষণীয় মুখ। তার সাথে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর...যা একসময় বিদ্যুতের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু তারপরই সব ছেড়েছুড়ে কাথায় যে হারিয়ে গেলেন ভদ্রলোক...!

নীলাব্জদা,

কাল রাতে আবার সেই সমস্যা হয়েছিল। তোমার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্যই হচ্ছি যে তোমরা কেউ সমস্যাটা বুঝতে পারছ না। এ আমার খামখেয়ালিপনা নয়। এই চৌত্রিশোর্ধ বছর বয়সে তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করার বেয়াড়া মানসিকতাও নেই। তুমি বিশ্বাস করো, আর না করো, একথা ঠিক যে আমি ভয় পাচ্ছি। রিসার্চের কাজটা আমায় প্রতিষ্ঠা এনে দেবে ঠিকই, কিন্তু সে প্রতিষ্ঠাই বা কী যদি আমার অস্তিত্ব না থাকে, যদি আমিই না থাকি!

কয়েক সপ্তাহ হল আমি ফোর্টে এসে বসবাস করছি। আমার কাছে একটা বাচ্চা ছেলেও রয়েছে। এখানকার এক প্রসিদ্ধ গাইডের ছেলে। ও-ই রান্না-বান্নার কাজটা দেখে। অবশ্য এ জন্য কাঠখড়ও পোড়াতে হয়েছে বিস্তর। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের অনুমতি পেতেই জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে যাওয়ার উপক্রম। তবু হাল ছাড়িনি। রিসার্চের কাজ ছেড়ে মাঝরাস্তায় রণে ভঙ্গ দেওয়ার কথা ভাবিনি। কিন্তু এখন ভাবছি। কারণ কাল রাতে যা ঘটল তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। এমন যে হতে পারে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। তুমিও পারো কি?

কাল খাওয়াদাওয়া সেরে একটা টর্চ নিয়ে সুলতান কুলির মসজিদের দিকে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গী বাচ্চা ছেলেটা তখন ঘুমিয়ে কাদা। বেচারার

সারাদিন খুব পরিশ্রম গেছে। আমার সাথে সাথে পুরো ফোর্টটা ঘুরে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই ওকে আর ডাকিনি।

ঘড়িতে তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। কলকাতায় এই সময়ে সবে সন্ধে। অথচ এখানে মধ্যরাত্রি। ফোর্টের আলোগুলো অনেকক্ষণ হল নিভে গেছে। পাথরের নিরেট দেওয়ালের জানলাগুলোয় অন্ধকার জমেছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। শিশির পড়ার টুপটাপ শব্দও যেন কান পেতে শোনা যায়। জনপ্রাণীহীন দুর্গে দাঁড়িয়ে আবার সেই অস্বস্তিকর অনুভূতি। টর্চের জোরালো আলোয় দেওয়ালটা পরীক্ষা করতে করতেই হঠাৎ মনে হল এই দেওয়ালের প্রতিটি নকশা আমার পরিচিত! দুর্গের প্রত্যেকটা স্তম্ভ, গম্বুজ, খিলান আমার বহুবার দেখা! এই পাথরের মেঝের উপর অস্থির পদক্ষেপ ফেলে কতদিন যে পায়চারি করে বেরিয়েছি তার হিসাব নেই। আমার রক্তে, আমার প্রতিটা হৃৎস্পন্দনে মিশে আছে এই দুর্গ!

তোমার চিঠির কথা আমার মনে ছিল। টের পেলাম একটা অশরীরী ভয় প্রতিমুহূর্তে আমায় গ্রাস করছে। চতুর্দিকে কাদের অবাঞ্ছনীয় উপস্থিতি। আমাকে ঘিরে যেন উত্তাল ইতিহাসের আবর্ত তরঙ্গে তরঙ্গে বয়ে চলেছে। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমি বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছি লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ আগে! প্রাণপণে ভাবার চেষ্টা করলাম যে সব মিথ্যে। পুরোটাই আমার অসুস্থ মস্তিষ্কের ভ্রমমাত্র, কিন্তু আমার শরীর? সে যে শূন্যে ভেসে চলেছে! ঠান্ডা হাওয়া সাঁৎ সাঁৎ করে সরে সরে যাচ্ছে আমায় ছুঁয়ে—এ সবকিছুই কি মিথ্যে! সবটাই কি স্বকপোলকল্পিত!

চোখের সামনে গভীর অন্ধকার যেন তেড়ে আমায় গ্রাস করতে এল। ভয়ে চোখ বুজে ফেললাম। শিথিল হাত থেকে টর্চটা যে কখন খসে পড়ে গেছে টেরই পাইনি। অন্ধকারের মধ্য থেকেই কানে এল দূরে কোথাও শোরগোলের শব্দ...দূর থেকে ইমনের সুর ভেসে আসছে...তার কড়ি মধ্যম পাথরের দেওয়াল...ছাদ...ফুঁড়ে বেরুচ্ছে...পানপাত্রে কুলকুল করে ঢালা হচ্ছে আঙুরের রস। ঝাড়বাতির কাচের টুংটাং...সারেঙ্গির সুর...ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি... পাখোয়াজের শব্দ...নূপুরের ঝঙ্কার...নামাজের আর্ত ব্যাকুলতা...কে যেন চেঁচিয়ে উঠল... 'বেওকুফ...কোতল করব...!'

সব শব্দগুলো অশান্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে মস্তিষ্কের কোণে কোণে। গুরুমস্তিষ্কে তোলপাড় করছে। আবার তালগোল পাকিয়ে শরীরের রোমকূপ

বেয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমি ডুবন্ত মানুষের মতো দু'হাত তুলে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছিলাম। এ কোন্ অন্ধকূপ!...আমি মুক্তি চাই...মুক্তি! এই অন্ধকার থেকে মুক্তি...এই শব্দ থেকে মুক্তি...আমার সহ্যশক্তির শেষবিন্দু অতিক্রম করে ধ্বনিগুচ্ছ তীব্র শূলের যন্ত্রণা নিয়ে মাথায় বিঁধছে...বিঁধছে...।

কতক্ষণ ওভাবে ছিলাম জানি না। আচমকা মনে হল আমার পিছনে কেউ চুপিসাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে দেখা সম্ভব নয়। তার উপর আমি চোখ বুজেই ছিলাম। তা সত্ত্বেও স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে ছায়ামূর্তিটার হাতে ঝলসে ঝলসে উঠছে তরবারির নিষ্ঠুর ফলা। যে-কোনো মুহূর্তে ধারালো চুম্বন এঁকে দেবে আমার গলায়। বিদ্যুৎ গতিতে এসে আছড়ে পড়বে এখনি...আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে...।

'সাব।'

কেঁপে উঠেছি। কে?...কে ডাকে?

'সাব!'

উজ্জ্বল আলো এসে আছড়ে পড়ল আমার মুখে। এই প্রথম বুঝলাম যে দরদর করে ঘামছি। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস হয়ে উঠেছে উত্তাল। ওর হাতে ওটা কী! টর্চ না তরবারি! ও কি আমায় মারবে?

একজোড়া স্বচ্ছ, নিষ্পাপ চোখে তাকিয়ে ছেলেটা বলল—'প্রোফেসর সাহিব! ইঁহা পর ক্যায়া কর রহে হ্যায়! রাত কো শোয়ে নেহি?

আমার বুকের ভিতরটা তখনো কাঁপছে! ঠোঁটদুটো অসম্ভব ভারী। গলা শুকিয়ে কাঠ। কী আশ্চর্য সুন্দর চোখ ছেলেটার! দেবশিশুর মতন সারল্যে ভরা! তবু কেন ওকে ভয় পাচ্ছি! কেন মনে হচ্ছে ও এখনই আমার বুকে একটা আস্ত ছুরি ঢুকিয়ে দেবে, অথবা...।

'আইয়ে সাব। আপ কা তবিয়ত কুছ ঠিক নেহি লাগ রাহা। সো যাইয়ে। উসব বাদ মে হোগা। আইয়ে...।' ও অভিভাবকের মতন সস্নেহে হাত ধরে আমায় সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলাম। অপরিসীম ক্লান্তি আমার চিন্তাশক্তি ও শরীরের দখল নিয়ে নিচ্ছিল। তবু যতবার ঘুমিয়ে পড়তে চাই ঠিক ততবারই স্নায়ু শিউরে শিউরে ওঠে। ওই বুঝি সে এল, ওই বোধহয় শীতল ইস্পাত আমার কণ্ঠনালী ছিন্নভিন্ন করে...।

কিন্তু কেন? প্রোফেসর কৌশিক রুদ্রকে কে মারবে? কেন মারবে? আমি ভয় পাই কেন? তবে কি 'আমি' আসলে 'আমি' নই!' 'আমি' আমার পরিচিত

গণ্ডির বাইরে অন্য কেউ?...কৌশিক রুদ্রের মোড়কে অন্য কেউ? ...তবে আমি কে? ...আমি কে?...

এরপরের শব্দগুলো আবছা হতে হতে ক্রমশ মিলিয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও পড়া গেল না।

প্রোফেসর মুখার্জি একমনে চিঠির কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। অজান্তেই তার মুখের উপর একরাশ সংশয়ের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। অস্থির আঙুলগুলো টেবিলের উপর পেপার ওয়েটটাকে নিয়ে খেলা করছিল। একটা মৃদু শব্দে সচকিত হয়ে দেখলেন কেষ্টদা চায়ের কাপটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখেছে।

তিনি চিঠিটা টেবিলের উপর রেখে মৃদু মাথা ঝাঁকালেন। যেন নিবিড় হয়ে আসা অবাস্তবতার ঘোর কাটিয়ে উঠতে চাইছেন।

কৌশিক রুদ্র! তাঁর প্রিয় অধ্যাপক। তাঁর স্বপ্নের পুরুষ! তাঁর আদর্শ! ...এখন কোথায়?

তিস্তার কথা

—'অ্যামেইজিং'!

অসচেতন মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিজিতের শিথিল ঠোঁটের ফাঁক গলে একরাশ ধোঁয়ার সাথে কথাটা বেরিয়েই গেল। তার সারা শরীরের রোম হঠাৎই খাড়া হয়ে উঠেছে। সে একটা জোরালো শ্বাস টেনে আবার বলল—'ইটস্ মার্ভেলাস।'

গাড়িটা একটা লেফ্‌ট্ টার্ন নিতেই আমাদের চোখের সামনেও ভেসে উঠেছে, সেই একই দৃশ্য। শিরদাঁড়ায় আচমকা এক ঝলক শিরশিরানি। এই তবে গোলকোন্ডা! প্রাচীন দক্ষিণ ভারতের অন্যতম কিংবদন্তী! অটল গাম্ভীর্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন প্রাচীন ভারতের অধিপতিদের উন্নাসিক ঔদ্ধত্য! আভিজাত্য ও রহস্যের সংমিশ্রণ।

আমাদের টাটা সুমোটা শহর ছেড়ে একটু প্রত্যন্ত অঞ্চলের দিকেই এগিয়ে চলেছিল। ভাঙাচোরা বিরাট বলশালী প্রাচীর ভেসে উঠতেই গা শিরশির করে উঠল। আমি হিংসুটে দৈত্যের বাগানের প্রাচীরটা দেখিনি। তবে গোলকোন্ডার প্রাচীরটা দেখে মনে হয় সেটা এই জাতীয়ই হবে।

—'তিস্তারানি, তখন থেকে একমনে কী ভাবা হচ্ছে?' দমাস করে পিঠে এক চাপড় মেরে আমার মোহাবেশটুকু ভেঙে দিল অভিজিৎ—'চেনাচেনা লাগছে বুঝি'?

চেনাচেনা। পেট ফেটে হাসি পেল। আমি আবার জাতিস্মর কবে হলুম যে চেনা চেনা লাগবে! জাতিস্মর বুঝি আজকাল মাঠেঘাটে পাওয়া যাচ্ছে!

—'নাঃ...চিনতে পারলাম না। তুই পেরেছিস?'

—'হ্ম্ম্ম্...' অভিজিতের চোখে দুষ্টুমি ঝিকমিক করছে। ও চিরকালই

ফাজিল রয়ে গেল। কলেজে পড়ার সময় থেকেই দুষ্টু দুষ্টু কথা আর খাড়া খাড়া কানই ওর বৈশিষ্ট্য বহন করে এসেছে। আজও তার কিছুই বদলায়নি।

—'কে বলতে পারে? হয়তো আমি এখানকার রাজা ছিলাম, আর আমার পাঁচ রানি ছিল?'

আমাদের দলের প্রবীণ সদস্য দাসবাবুর মেয়ে অনেকক্ষণ ধরেই এলোচুলে অভিজিতের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সুযোগ পেয়ে একটা খোঁচা মারার লোভ সামলাতে পারলাম না—'ঠিক! আর ও তোর সেই পাঁচরানির একরানি ছিল।'

—'কে? ওটা?' অভিজিতের ভুরু কৌতুকে নেচে উঠেছে—'ওটা তো চাকরানি ছিল।'

হেসে ফেললাম। আমার স্বামী অর্ক আবার কোনো কিছুই আস্তে করতে পারে না। সে এমন জোরে 'হো হো' করে হেসে উঠেছে যে সামনের সিটে বসে থাকা প্রোফেসর মুখার্জিও চমকে তাকালেন। পিছনের সিটের গোমড়ামুখো সম্রাট মুখ থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে রাগ রাগ স্বরে বলল—'ব্যাড জোক।'

সম্রাটকে আমি এর আগেও বার কয়েক দেখেছি। কলেজে বড়োলোকের বিগড়ে যাওয়া ছেলে হিসাবে ওর কুখ্যাতি ছিল। অভিজিতের কাছেই শুনেছি যে, শুধু মুদ্রা নয়, মদ আর মেয়ের ব্যাপারেও সে এক্সপার্ট এবং বর্তমানেও সেই কুখ্যাতি সগৌরবে রক্ষা করে চলেছে। ছেলেটার সাথে আমার বিশেষ পরিচয় নেই। করতেও চাই না। ওর আসার ব্যাপারে আপত্তিও ছিল। কিন্তু অর্কর যে কী দুর্বলতা ওর উপর তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অভিজিৎ খুব আমুদে ছেলে। তার উপর সে আমার ও অর্কর বেস্ট ফ্রেন্ড। তাকে নিয়ে আসার কারণটা নাহয় বোঝা গেল। কিন্তু ওই মাতাল, লম্পট কুলচূড়ামণিটিকে আমাদের সাথে আনার কোনো যৌক্তিকতা অনেক খুঁজেও আমি পাইনি। অবশ্য খোঁজার চেষ্টা যে বিশেষ করেছি তা বলতে পারি না। যার ম্যাও সে সামলাবে,—আমার কী?

—'আরে! ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছিস যে?' অভিজিতের ফোড়ন সম্রাটকেও নিষ্কৃতি দেয়নি।

—'শালা, তুই আগের জন্মে নির্ঘাত ঔরঙ্গজেব ছিলি। হাসতে জানিস না, না কি? ঠিক যেন ওই খিটকেলে বুড়ো। ফাটা ঠোঙার মতো মুখ করে বসে

আছিস। তোর কীসের এত দুঃখ রে? দিব্যি তো আছিস...খাচ্ছিস দাচ্ছিস আর বাঁশি বাজাচ্ছিস। গোপিনী নিয়েও তো কম লীলা করছিস না। কতবার বললাম দু-চারটেকে এদিকেও পাশ কর...।'

সম্রাটের রাগত চোখে আরো রাগ জমেছে। শক্ত চোয়াল চুঁইয়ে বেরিয়ে এল গোটাকয়েক শব্দ 'Mind your language...'

সারা সফরে বোধহয় এই প্রথম ওর কণ্ঠস্বর স্পষ্টভাবে শুনলাম আমি। ওর সবল পুরুষালি চেহারার সাথে মানানসই ভারী কণ্ঠস্বর। উষ্ণ, সান্দ্র।

—'ইয়ার্কি মারছি ইয়ার।' অভিজিৎ ওর কাঁধে আলতো চাপড় মারল—'চটছিস কেন? Just joking... ।'

—'It's allright'। সম্রাটের মুখ ঢেকে দিল সংবাদপত্রের প্রথম পাতা।

—'ওকে ঘাঁটাচ্ছিস কেন? ছেড়ে দে না।' অর্ক সস্নেহ সুরে বলল—'সবাই তো সব কিছু বোঝে না। ওর সাথে ঠাট্টা করতেই বা যাস কেন? ওটা তো চিরকেলে বেরসিক।'

—'তুই ওটাকে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলছিস অর্ক। বন্ধুবান্ধবরা একটু ঠাট্টা ইয়ার্কি করবে না তো কি পদির শাশুড়ি এসে করবে? তাতে ওর যদি গায়ে ফোস্কা পড়ে তবে বন্ধুত্ব করার কী দরকার?'

—'বাদ দে।'

—'বাদ দিয়েই তো চিরকাল সর্বনাশটি করেছিস। ওর বোঝা দরকার যে ও সম্রাট হতে পারে, কিন্তু আমরা ওর আমলা নাই।'

অর্ক হেসে ফেলল—'ঠিক আছে, তোর অভিযোগ গৃহীত হল। তবে আমার মনে হয় যে আমাদের শাস্তিস্বরূপ বিশেষ কিছুই করার দরকার নেই। স্রেফ পাকড়াও করে একটা বিয়ে দিয়ে দাও। বউ এসে ওকে সোজা করে দেবে।'

অভিজিতের চোখে একরাশ কৌতুক উপচে পড়েছে—'মনে হচ্ছে তুই এ ব্যাপারে বিশেষ এক্সপিরিয়েন্সড।'

অর্ক চোখমুখ ঘুরিয়ে কথাটার প্রবল প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল। তার আগেই বাদ সেধেছে শিবাকুমারণ—আমাদের গাড়ি—'স্যার...এবার আমাদের নামতে হবে। আপনারা রেডি?'

বিদ্যুৎ মুখার্জি মাথা নীচু করে কী যেন ভাবছিলেন। তড়িদাহতের মতন মুখ তুলে বাইরের দিকে তাকালেন। তার দু চোখে চাপা উত্তেজনা।

বাইরে সকালের রোদ গায়ে মেখে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে গোলকোন্ডা ফোর্ট! অনবদ্য, অদ্ভুত!

সম্রাট বাদে সকলের সমবেত কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হল—'রেডি'।

গোলকোন্ডা দুর্গে গেটের সংখ্যা সর্বমোট আট। এই আটটি গেট হল যথাক্রমে জামালি, নয়াকিলা, ফতে, মোতি, পাঠান চেরু, বহমনী, মকাই এবং বানজারা দরওয়াজা। আমরা ঢুকলাম বানজারা দরওয়াজা দিয়ে। এর প্রবেশপথটা 'S' আকৃতির। বানজারা দরওয়াজার বাইরে একটা মস্ত পুকুর। এটাই নাকি তৎকালীন সর্ববৃহৎ মোটর ট্যাঙ্ক—নাম 'কাটোরা হাউস'। এখানে রাজারা গোলাপজল ভরে স্নান করতেন। শখ বলিহারি।

সম্পূর্ণ গোলকোন্ডা অঞ্চলের দৈর্ঘ্য প্রায় সাত মাইল। যে পাহাড়টির উপর দুর্গটি অবস্থিত তার নাম 'ডেকান রক'। এই অঞ্চলের জনসংখ্যা একসময় আশি লাখ ছিল। আর তারা শাসিত হয়েছিল পাঁচটি রাজবংশের দ্বারা। ১১৪৩ সালে দেবগিরির যাদব বংশ থেকে গোলকোন্ডার ঐতিহাসিক ও গৌরবময় যাত্রা শুরু হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে বরাঙ্গলের কাকতীয় বংশ, ১৩৬৩ সালে বহমনী রাজা, ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে কুতুবশাহী বংশের দ্বারা শাসিত হয়ে অবশেষে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের আক্রমণের ফলে গোলকোন্ডার পতন ঘটে। এরপর আসফজাহি বংশের হাত ধরে ইতিহাসের ধারা অন্যদিকে বয়ে গেছে। গোলকোন্ডা তার সাথে তাল মেলাতে পারেনি। আস্তে আস্তে সে তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অন্ধকারে। ভাঙন ধরেছে ইটে। বাসা বেঁধেছে চামচিকে, বাদুড়, মাকড়সা...ম্লান হয়ে এসেছে তার উজ্জ্বল ইতিহাস।

মুখে প্রায় ফেনা তুলে পরমোৎসাহে বকে যাচ্ছিল শিবকুমারণ। তার বক্তৃতা শ্রোতারা আদৌ কেউ শুনছে কি না সেদিকে খেয়ালই নেই। একমাত্র ইতিহাসের অধ্যাপক বিদ্যুৎ মুখার্জি ছাড়া বাদবাকি সবাই যে নিমের পাচন খাওয়ার মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে তা যেন সে দেখেও দেখছে না।

—'পাব্লিকটা দিমাগ চেটে চেটে যে ভরসা করে দিল মাইরি।' অভিজিৎ নিজের মনে গরগর করছে—'মাধ্যমিকের পর যদি বা হিস্ট্রিটাকে কাঁচকলা দেখালুম তাতেও রক্ষে নেই। আবার এখানেও সেই উৎপাত এসে জুটেছে।'

গোলকোন্ডার প্রধান প্রবেশপথের বাইরের দৃশ্যটি সত্যিই নয়নাভিরাম। অসাধারণ সব বাগান দিয়ে সাজানো। সবুজ ভেলভেটের মতো ঘাসের উপর

কোথাও বা বোগেনভিলিয়ার ঝাড়। ক্যাকটাসের কাঁটায়, মসের কোমল পেলবতায়, ফুলের রঙিন প্রেক্ষাপটে বাগানগুলো আশ্চর্য রূপে রঙে ঝলমল করছে।

এমন সুন্দর প্রকৃতির মধ্যে ক্ষুব্ধ অভিজিতের বেগুনভাজার মতো মুখ দেখে হাসি পেয়ে গেল। আহা রে! বেচারা! ইতিহাসের গুঁতোয় একেবারে নাজেহাল অবস্থা।

—'ইতিহাস ছাড়া এখানে আরো অনেক কিছু দেখার আছে।' আমি ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম—'ওগুলো দেখ না। ওদিকে কান দিচ্ছিস কেন?'

—'আমি কান দিচ্ছি!' ওর চোখ প্রায় ব্রহ্মতালুতে গিয়ে ঠেকেছে—'ওকি আর কান দেওয়ার অপেক্ষায় আছে? শালা, পারলে যেন কান ধরে টেনে শোনায়।'

হাসি আর চাপা গেল না।

—'তুই হাসছিস!' অভিজিৎ রেগে গিয়ে একতাল হালুয়ার মতো মুখ করে চলে গেল।

দুর্গের যে প্রধান প্রবেশপথ দিয়ে আমরা ঢুকলাম তার নাম বালাহিসার গেট। তীক্ষ্ণ স্পাইক-শোভিত দরজাটা দেখলেই কেন জানি না সজারুর কথা মনে পড়ে যায়। এই দরজা দিয়ে একটু এগোলেই গ্র্যান্ড পোর্টিকো বা প্রতিধ্বনি কক্ষ।

—'24 Cut diamond shape'। সিগ্রেটে একটা মস্ত বড়ো টান দিয়ে বলল সম্রাট—'Echo তৈরি করার জন্য কী technology! ভা-বা যায় না!'

—'Right Sir'। শিবাকুমারণ জানায়—'এখানে হাততালি দিলে ঠিক চারশো আশি ফুট উপরে দরবার মহলে, মানে বারাদরি থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। তখন এটাই ছিল জনপ্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা।

—'ঠিক...এখান থেকে হাততালি দেওয়া হত আর আমি আমার মহল থেকে পরিষ্কার শুনতে পেতাম। একবার বর্গী আক্রমণ হয়েছিল আর...।'

ওই...অভিজিতের ফিচলেমি আবার শুরু হয়েছে। এ ছেলেটার স্বভাব মরলেও যাবে না।

—'আর তুই খাঁড়া হাতে উপর থেকে লাফ মেরে নীচে পড়েছিলি'। সম্রাট বাদবাকিটা পূরণ করে দিল।

—'যা বলেছিস। কিন্তু তুই জানলি কী করে?'

অর্ক এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার মুচকি হেসে বলল—'সিম্পল, উপর থেকে লাফ মেরে তুই ওর ঘাড়েই পড়েছিলি কিনা। বেচারাকে এরপর বোধহয় সারাজীবন কুঁজো হয়ে হাঁটতে হয়েছিল।'

সম্রাট গম্ভীরমুখে মাথা হেলিয়ে সমর্থন জানাল। ওর ভাবলেশহীন মুখ আবছা করে দিয়েছে ইন্ডিয়া কিংসের ধোঁয়া।

—'ওকে তো শুধু কুঁজো হয়ে হাঁটতে হয়েছিল, আর আমি যে পটল তুলেছিলাম সেটা তো বললি না!'

—'যাচ্চলে, এর মধ্যে পটলও তুলে ফেললি!' অর্ক সজোরে হেসে উঠেছে—'এত কষ্ট করে যখন নিজের মৃত্যুসংবাদটা দিলি তখন নিজের পরিচয়টাও দিয়ে ফ্যাল। সে জন্মে তুই কী ছিলি?'

—'দ্য গ্রেট ওয়ান অ্যান্ড ওনলি হায়দর আলি। যার নামে হায়দরাবাদের নামকরণ হয়েছে সেই হায়দর আলি।'

বিদ্যুৎ মুখার্জি প্লাস্টিকের বোতলে মুখ লাগিয়ে জল খাচ্ছিলেন। অভিজিতের কথা শোনামাত্রই একটা পেল্লায় বিষম। উপস্থিত সকলের 'আহা উঁহুঁ, ফুঁ' এবং চাপড় বর্ষণের ফলে কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে কটমট করে তাকিয়ে বললেন—'হায়দর আলির নামে হায়দরাবাদের নামকরণ হয়েছে এ খবর তোমায় কে দিল?'

অভিজিৎ আমতা আমতা করে বলল—'না না...মানে আমি এমনিই...'

—'হায়দর আলি মহীশূরের লোক। তার সাথে হায়দরাবাদের সম্পর্ক নেই। হায়দরাবাদের প্রথম নাম ছিল ভাগ্যনগর। এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবশাহী বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক মহম্মদ কুলির স্ত্রী ভাগ্যমতীর নামেই নামকরণ হয়েছিল। পরে ভাগ্যমতী মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে হায়দর বেগম হয়ে যান। তার সাথে সাথেই শহরের নাম পালটে হয়ে যায় হায়দরাবাদ। বুঝেছ? এরপর থেকে না জেনে উলটোপালটা কথা বলবে না।'

ধমক খেয়ে বেচারার মুখ একেবারে চুপসে যাওয়া ফানুসের মতো হয়ে গেল। মুখে প্রকাশ না করলেও মনে মনে খুশিই হলাম—বেশ হয়েছে! ইয়ার্কিটা মাঝেমধ্যে বড্ড বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে যায়। সবকিছুরই একটা লিমিট আছে।

অভিজিৎ মুখ চুন করে এগিয়ে গেল। পিছন পিছন সম্রাটরাও। আমি ওদেরই অনুসরণ করে এগোতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই অর্ক খপ করে হাত

চেপে ধরেছে—

—'অ্যাই...দাঁড়াও।'

—'কী হল?'

—'বড্ড ঘামছ', সে ঝোলাব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে এনেছে—'নাও'। এই হচ্ছে আমার ওয়র্সহাফ! মুখ ফুটে কিছু বলার প্রয়োজনই হয় না। অর্ক কী করে যেন সবকিছুই আগে জানতে পেরে যায়। আমার বান্ধবীরা বলে—'কপাল করে স্বামী পেয়েছিস বটে।'

কিন্তু শুধু কপাল থাকলেই তো হয় না। আমি সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, ইন্টেলেকচুয়াল। চোখ ধাঁধানো একটা ডিগ্রিও আছে। যে-কোনো পুরুষের কাছেই যে আমি আকর্ষণের বিষয়বস্তু সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না—এখনো নেই।

অভিজিৎ, সম্রাটরা শিবাকুমারণের সাথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। অর্ক আমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। প্রিয় পুরুষের বুকের উষ্ণতা বড়োই আরামদায়ক। ওর চোখ যেন কথা বলে।

—'দেব নাকি একটা ছোট্ট করে? এখানে কেউ নেই কিন্তু...।'

এখন প্রায় দ্বিপ্রহর। মাথার উপর সূর্যদেব অবিরাম অগ্নিদৃষ্টি ফেলে চলেছেন। পায়ের তলায় গনগনে পাথর প্রায় জ্বলন্ত চিতা। ওরকম অবস্থায় ধৈর্য ধরে সমস্ত দুর্গটা চষে বেড়ানো সত্যিই কষ্টকর। মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের মতো অভিজিতের ছোট্ট ছোট্ট রসিকতা একটু হলেও বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ধমক খেয়ে সেই যে সে মুখে কুলুপ এঁটেছে তার পরে বহু সাধ্যসাধনা করেও সে-কপাট ভাঙা সম্ভব হয়নি। আমাদের ওয়েসিস ওখানেই বালি চাপা পড়ে গেছে। এখন শুধু উষ্ণ হাওয়ার আঁচড় আর চামড়ায় জ্বালা ধরানো রোদই পাথেয়।

প্রোফেসর বিদ্যুৎ মুখার্জি অবশ্য এই বয়সেও দারুণ ফিট। ভদ্রলোককে আমি ঠিক চিনি না। অর্কর মুখে যতটুকু শুনেছি তাতে এইটুকু বুঝতে পারি যে উনি আমার শ্বশুরমশায়ের এককালীন প্রিয় ছাত্র। সেই সূত্রেই অর্কর সাথে ওর আলাপ। হায়দারাবাদে নিছক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আসেননি। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কোনো কারণ আছে। জনৈক কৌশিক রুদ্রকে তিনি খুঁজছেন। এখানে আসার পর থেকেই পুলিশ স্টেশন আর স্থানীয় হাসপাতালগুলোয়

খোঁজখবরও করেছেন, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি।

বর্তমানে তিনি শিবাকুমারণকে নিয়ে ব্যস্ত। সবার আগে, গাইডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হেঁটে চলেছেন। ক্লান্তিহীন, শ্রান্তিবিহীন।

প্রোফেসরের পরই যার ফিটনেস সত্যিই প্রশংসার যোগ্য সে সম্রাট। ওকে ওর ঔদ্ধত্যের জন্য দু'চক্ষে দেখতে পারি না ঠিকই, তা সত্ত্বেও স্বীকার করতেই হয় যে ছেলের দম আছে। দুর্গে ঢোকার কিছুক্ষণ পরেই 'সুমুখে' সিঁড়ির ধাপ। নিজের বাড়ির নিতান্তই ভালোমানুষ, শান্তশিষ্ট সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই যাদের জিভ বেরিয়ে যায়, তারা এই জাতীয় তিরিক্ষি মেজাজের সিঁড়ির কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। যেমন তার আকৃতি, তেমনি তার ঢাল। একটু পা ফসকালেই ব্যস—হাত-পা ভেঙে একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ।

আমরা একসারি সিঁড়ি ভেঙেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অভিজিতের কপাল থেকে টপটপ করে ঘাম পড়ছে। অর্কর মুখ লাল। নাক দিয়ে সজোরে শ্বাস টানছে। আমার অবস্থাও তথৈবচ। কিন্তু সম্রাট দিব্যি তেজি ঘোড়ার মতো টপাটপ সিঁড় ভেঙে অনেকটাই উঠে গেল।

—'ও অমন ঘোড়দৌড় লাগিয়েছে কেন?' অর্ক হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'অভি, ওকে ডাক। উলটে-টুলটে পড়লে সর্বনাশ!'

অভিজিৎ আড়চোখে তাকাল। সম্রাট অনেক দূরে। এখান থেকে চেঁচালে সে শুনতে পাবে কি না সন্দেহ।

—'অর্ক'। ছোটো ছেলেকে তার বয়স্ক দাদু যেভাবে বোঝায় অবিকল সেই স্বরে সে বলল—'সম্রাট একটা পূর্ণবয়স্ক ছেলে। ও নিজেকে সামলাতে জানে। তুই সবসময় ওকে আগলে রাখতে চাস কেন?'

—'আগলে রাখতে চাই না। কিন্তু ওর দিকে কাউকে না কাউকে তো নজর দিতেই হবে। সেটা নাহয় আমিই দিলাম।'

—'অর্ক...বি সিরিয়াস।' গম্ভীর মুখে অভিজিৎ বলে—'তুই সবসময় সব জিনিসই উড়িয়ে দিস। সম্রাটকে তুই খুব ভালোভাবেই চিনিস। হি ইজ আ লেডিকিলার ম্যান। তার উপর আবার প্লে বয়। বন্দনাকে কেমন লাটিয়ে নিয়েছে দেখেছিস?'

বন্দনা হল দাসবাবুর মেয়ে। এতক্ষণ অভিজিতের সামনে চুল এলিয়ে দিয়ে ঘুরছিল। এখন সে সম্রাটের পিছন নিয়েছে।

অর্ক এক মুহূর্ত অভিজিতের দিকে তাকাল। পরক্ষণেই হাসিতে আরেক-বার সবার কান ফাটিয়ে দিয়ে বলে—'দেখছি, তার সাথে এটাও দেখছি যে তুই এখনো আগের মতোই হিংসুটে রয়ে গেছিস।'

—'ইয়ার্কি নয়। ওকে আনার সিদ্ধান্তটা তোর একার ছিল। তুই ভুলে যাচ্ছিস যে এই সিদ্ধান্তের মাশুল দিতে হলে তোকেই দিতে হবে। একটা লম্পট, তাকে টেনে নিয়ে এলি কতগুলো ভদ্রমেয়ের সামনে। যাই বলিস... কাজটা তুই ঠিক করিসনি।'

অর্ক অদ্ভুতদৃষ্টিতে অভিজিৎকে জরিপ করেছে—'একথা তুই বলছিস অভিজিৎ!'

তার শীতল চাউনিতে অভিজিৎ কেমন যেন কুঁকড়ে গেল।

—'আশ্চর্য!' অর্ক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে—'একেই বলে মনুষ্যচরিত্র! ওই লোকটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিলে আজ তোকে বাবার দোকানে কাজ করে বড়ো হতে হত। পড়াশোনা, কলেজ এসব অধরাই থেকে যেত। আজ যে চাকরিটা করে তুই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিস সেটাই বা হত কোথায়? সম্রাটকে বাদ দিয়ে নিজের জীবনটা একবার শুরু থেকে ভেবে দেখেছিস! ভেবে দ্যাখ, শিউরে উঠবি।'

অভিজিতের মাথা নীচু হয়ে গেছে।

অর্কর কঠিন চোয়াল এবার নরম হয়ে গেল—'প্রত্যেকটা মানুষেরই কিছু না কিছু drawback থাকে অভি। দুনিয়ার কেউই শুধু সাদা বা কালো নয়। আমরা সবাই ধূসর। সাদাটা মেনে নেওয়া খুব সহজ। কিন্তু কালোটাকে মেনে নিয়ে সাদাটাকে চোখের সামনে তুলে ধরাও খুব কঠিন নয়। চেষ্টা কর... পারবি। আর তারপরও যদি কিছু বলার থাকে তবে সেটা ওর সামনে বলিস, পিছনে নয়। এসো তিস্তা।'

অর্ক অভিজিতকে ফেলে লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে গেল।

আমি নিতান্তই দর্শক। যদিও মনে মনে অভিজিৎকেই সমর্থন করছিলাম। কিন্তু মুখে প্রকাশ করার সাহস নেই।

—'দেখলি কাণ্ডটা।' অভিজিৎ আমার কাঁধে হাত রেখে নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। 'শালা, কার মুখ দেখে যে আজ ঘুম থেকে উঠেছিলাম। সব জায়গাতেই ঝাড় খাচ্ছি।'

ওর ক্ষোভ দেখে আবার হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু সামনে হাসাটা সমীচীন

নয়। তাই যতদূর সম্ভব হাসি সংবরণ করে বলি—'যতদূর মনে হচ্ছে হোটেলের আয়নায় নিজের মুখটাই দেখেছিলি।'

—'যা বলেছিস।' সে একটা ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে সম্ভবত নিজের পিতৃপ্রদত্ত খানদানি মুখটাকে গালমন্দ করছিল। আমি বাধা দিয়ে বললাম—'এবার এগোনো যাক?'

—'As you wish baby'।

আবার শুরু হল সেই খাড়া সিঁড়ি ভেঙে উঠে যাওয়া। সিঁড়ি তো নয়! যেন কুতুবশাহী রাজবংশের উদ্ধত স্পর্ধা। মোগলেরাও তাকে অবলীলাক্রমে পদদলিত করতে পারেনি তো আমরা কোন্ ছার!

—'বাবা শিবাকুমার,...আর কত সিঁড়ি ভাঙতে হবে বাবা? এর চেয়ে যে সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক মেলানোও সহজ।' অভিজিৎ এতক্ষণে নিজের ফর্মে ফিরেছে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'এর মধ্যেই যে চোখের সামনে দিগন্তবিস্তৃত সর্ষের খেত দেখতে লেগেছি। শেষে কি পটলের চাষ দেখিয়েই ছাড়বে।'

—'এই তো, প্রায় চলে এসেছি স্যার। অর্ধেকের উপর তো হয়েই গেছে। সামনে চতুর্থ কুতুবশাহী রাজা ইব্রাহিম কুলির মসজিদ। তারপর মহাকালী মন্দির। আর তারপরেই বারাদরি।'

—'এই শেষের 'তারপর'টায় পৌঁছতে আর ক'টা সিঁড়ি ভাঙতে হবে?'

—'বেশি নয় স্যার, এই ধরুন আর শ'খানেক।'

অভিজিৎ ধপাস করে ওখানেই বসে পড়েছে—'ইমপসিবল, আমি এখানেই রণে ভঙ্গ দিলুম। তোমরা যাও বাপু।'

সম্রাট ভুরু কুঁচকে তাকাল—'ন্যাকামি করিস না। ওঠ...।'

—'আয়'। অর্ক হাত বাড়িয়ে দিয়েছে—'আরেকটু কষ্ট করে চল। তারপর বারাদরিতে গিয়ে বিশ্রাম নিবি।'

—'আমি আর পারছি না।' অভিজিৎ জুতো খুলে দেখাল। তার পায়ে একটা টোপাকুলের মতো ফোসকা ফেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে।

—'পারবি। আয়।' সে ওর হাত ধরে টেনে তুলল—'আমার জুতোটা পরে চল। সুবিধা হবে।'

জুতো বদলে নেওয়া হল।

—'এই দুর্গটার নাম গোলকোণ্ডা না রেখে সিঁড়িকোণ্ডা রাখা উচিত।' অভিজিতের স্বগতোক্তি—'গাদা গুচ্ছের সিঁড়ি...আর সিঁড়ি...।'

—'টোট্যাল ছ'শোটা আছে স্যার। ওঠার সময় তিনশো ষাটটা। আর নামার সময় দুশো চল্লিশটা।'

—'মা-তা-রা!' তার চোখ দুটো প্রায় ব্রহ্মতালুতে চেপে বসেছে...'রক্ষে করো।'

বারাদরিই দুর্গের দরবার মহল। তিনতলা বিল্ডিং। গোটা বারো আর্চ রয়েছে। এখান থেকে পুরো হায়দরাবাদের দৃশ্য দেখা যায়। ছাতের পূর্বদিকে লঙ্গর হুজ ট্যাঙ্ক, চারমিনার, মক্কা মসজিদ, ওসমানিয়া হসপিটাল, হাইকোর্ট, সলার জঙ্গ মিউজিয়াম, দক্ষিণ দিকে হিমায়ত সাগর ট্যাঙ্ক, পশ্চিমে ওসমান সাগর ট্যাঙ্ক, উত্তর-পূর্বে কুতুবশাহীদের সমাধি আর উত্তর পশ্চিমে হুসেন সাগর লেক।

তখন সূর্যের তেজ অনেকটাই মরে এসেছে। ঝকঝকে হলুদ সোনার পিণ্ডটা গলে গিয়ে লালচে সোনালি রং ছড়িয়ে দিচ্ছে, আস্তে আস্তে এবার নামবে অন্ধকার, আকাশটা তারই প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত।

শিবাকুমারণ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। ঘড়ির কাঁটা চারটের ঘর অতিক্রম করে আরো পনেরো মিনিট এগিয়ে গিয়েছে। এখানে যখন-তখন ঝুপ করে নেমে আসে অন্ধকার। সটান দাঁড়িয়ে থাকা দুর্গের আনাচকানাচ থেকে হয়তো হিংস্র শ্বাপদের মতো গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসে পুরোনো স্মৃতির কঙ্কাল। তাদের শূন্যগর্ভ চোখে অতীতের ধূসর কুয়াশা জমাট বেঁধে আছে। পাঁজরে চাপা পড়ে আছে না-জানা কত অধ্যায়...।

—'চলুন, এবার নীচে নামা যাক।' শিবাকুমারণ আত্মমগ্ন স্বরে বলল—'সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আর বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়।'

অর্ক এরমধ্যেই অভিজিতের পায়ে শুশ্রূষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওর শান্তিনিকেতনি ঝোলায় চিরকালই একটি ভ্রাম্যমাণ ফার্স্ট এইড বক্স থাকে। অভিজিতের পায়ে ব্যান্ডেজ লাগাতে লাগাতে সে মুখ তুলে তাকাল—'কেন? এখানে ভূত টুত আছে না কি?'

অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রশ্ন। অর্কর কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট ইয়ার্কির আভাসও ছিল। কিন্তু বিকেলের ফ্যাকাশে আলোয় শিবাকুমারণের মুখ দেখে চমকে উঠলাম। তার মুখ কেমন রক্তশূন্য হয়ে গেছে।

—'কী হল?' আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম—'ওরকম চমকে উঠলেন।'

—'কই না তো!' সে সামলে নিয়েছে—'জানি না স্যার। তবে ভূত

ছাড়াও তো এরকম প্রাচীন দুর্গে আরো অনেক কিছু থাকতে পারে।'

—'ইন্টারেস্টিং।' সম্রাট এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সিগ্রেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল। এবার মুখ খুলল—'কী এমন ভয়ঙ্কর জিনিস থাকতে পারে এখানে? সাপ-খোপ, বিছে? নাকি হিংস্র জন্তু!'

—'এর মধ্যে কোনোটাই নয়।' শিবাকুমারণ একটু হাসল—'ওসব থাক স্যার। আপনারা শিক্ষিত মানুষ। এসব বিশ্বাস করেন না। চলুন নীচে নামি।'

সম্রাট চোখ কুঁচকে অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার চুলে বিকেলের পড়ন্ত আলো এসে লালচে সোনালি আভা লাগিয়ে দিয়েছে। ওর ঠোঁট ফাঁক হয়ে দেখা গেল দন্তপঙ্‌ক্তির অস্ফুট আভাস—'Is there anything wrong?'

—'তেমন কিছু না...আসুন...।' সে এগিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। সবুজাভ স্বচ্ছ চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচকে হয়ে উঠেছে—'শুধু এইটুকুই এখন বলতে পারি যে এই দুর্গের চেয়ে বিপজ্জনক এখানে কিছু নেই। তা-ও সবার কাছে নয়। বিশেষ কয়েকজনের কাছে এই দুর্গ ভয়ঙ্কর। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন সেই "বিশেষ কয়েকজনের" একজনও যেন আপনাদের দলে না থাকে।'

বিদ্যুৎবাবু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন। শান্ত স্বরে বললেন—'বোধহয় তুমি ঠিকই বলছ।'

—'টুনি, জল খাও।'

দাসবাবু সারা সফরে হাতে গোনা কয়েকটি কথাই বলেছেন। এটি তার মধ্যে অন্যতম। ছোট্টখাট্টো চেহারার এই ভদ্রলোক এমনিতে স্বল্পভাষী। তবে পছন্দমতো বিষয় পেলে নিজের মতামত প্রকাশে দ্বিধা করেন না। পেশায় কম্পাউন্ডার। অন্যান্যদের তুলনায় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একটু পিছিয়ে থাকা এই ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর কদাচিৎই শোনা যায়। যা বেশি শোনা যায় তা হল এঁর স্ত্রীর গর্জন। যখনই ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর ক্রমশ গিয়ার চেঞ্জ করে মন্দ্রসপ্তক থেকে তার সপ্তকে উত্তরোত্তর চড়তে থাকে তখনই বোঝা যায় যে দাসবাবু বাড়িতে আছেন। আর যখন কিছুক্ষণ বাদেই আবার আরোহ ছেড়ে সুর অবরোহ ধরে নেমে আসতে আসতে শূন্যে পৌঁছে নীরব হয়ে যায় তখনই বুঝতে হবে যে ভদ্রলোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন।

এই দম্পতি এবং তার কন্যাটি সম্পর্কে আমাদের প্রতিবেশী। সুরঞ্জন দাস মানুষ মন্দ নন। হাঁ-করে হাসলে যে ডায়রিয়া থেকে শুরু করে যক্ষ্মা পর্যন্ত যে-কোনো মহামারীতেই মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয় তা প্রথম এর কাছেই জানতে পারি। আমাদের শহরে হাওয়ায় যে কত লক্ষ লক্ষ জীবাণু ঘাপটি মেরে বসে থেকে মনুষ্যপ্রজাতির বিলোপের গোপন ফন্দি আঁটছে তাও এর সাথে দেখা না হলে জানতেই পারতাম না। আমাদের সৌভাগ্য যে এমন একটি প্রতিবেশী পেয়েছি।

—'টুনি, জল খেয়েছ?'

—'বাবা, তোমার অন্য ডায়লগ থাকলে বলো। এই এক কথা বারবার ভালো লাগে না।'

—'ভালোর জন্যই তো বলি মা। তুমি জন্ডিস থেকে উঠেছ। তোমার এখন প্রচুর জল খাওয়া দরকার।'

—'আমার মনে আছে। বারবার মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই।' টুনি ওরফে বন্দনা একটু বিরক্ত হয়ে বলল—'আমি কচি খুকি নই।'

—'ঠিক আছে।' তিনি চুপ করে গেলেন।

অন্যান্য দিন হলে ভদ্রলোকের এই হেনস্থা দেখে দুঃখিত হতাম। একটু করুণাও হয়তো হত। কিন্তু আজ আর এসব সাংসারিক দ্বন্দ্ব নিয়ে চিন্তা করার মানসিকতা নেই। বারবার শিবাকুমারণের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। ও কি কিছু চেপে গেল? ওর শেষ কথাটার মানে কী? কারা এই 'বিশেষ কয়েকজন'?

—'অর্ক, ড্রাইভারকে একটু বলে দিয়ো যেন আমায় থানায় ড্রপ করে দেয়।'

অর্ক বিদ্যুৎবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসল—'আপনি হাল ছাড়েননি দেখছি।'

—'হাল ছাড়ার জন্য তো আসিনি ভাই।'

—'পেলেন কিছু?'

—'অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই পাইনি। লোকটা যেন হাওয়া হয়ে গেছে। কেউই তার সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না।' তিনি মাথা নাড়লেন—'এভাবে বোধহয় হবে না।'

—'না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তিরিশ বছর পরে একটা লোককে খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়।' অর্ক একটু চিন্তা করে বলল—'বাই দ্য বাই। আপনি শিবাকুমারণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন?'

—'করেছিলাম। সে এ বিষয়ে কিছুই জানে না।' প্রোফেসর অন্যমনস্ক হয়ে বলেন—'যদি তার সঙ্গী সেই বাচ্চা ছেলেটির খোঁজও মিলত! সে একজন বিখ্যাত গাইডের ছেলে ছিল। বড়ো হয়ে তার গাইড হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি'।

—'এতদিন সে নিশ্চয়ই রীতিমতো একটা লোক হয়ে গেছে। তার বয়স অন্তত চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হওয়া উচিত। অর্থাৎ আমাদের শিবাকুমারণের সমবয়সি, আর কোনো উল্লেখযোগ্য চিহ্ন আছে?'

বিদ্যুৎ মাথা নাড়লেন—'উঁহু, মনে পড়ছে না...।'

—'ঠিক আছে কাল শিবাকুমারণকে বলে গাইড অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আপনার কথা বলিয়ে দেওয়া যাবে। ওখানে যা খুঁজছেন তা পেয়েও যেতে পারেন।'

—'থ্যাঙ্কস অর্ক।'

—'নো থ্যাঙ্কস।' অর্ক গভীরস্বরে বলল—'আমি সবসময় আপনার পাশে আছি। শুধু আমিই নই। আমাদের পুরো টিমটাই আপনার সঙ্গে আছে। যে-কোনো মুহূর্তে দরকার পড়লেই ডাকবেন। দ্বিধা করবেন না।

প্রোফেসর হেসে তার কাঁধে হাত রাখলেন।

ওদের কথা গাড়িতে বসে আবছা শুনতে পাচ্ছিলাম। অবশ্য মনোযোগটা ছিল অন্যদিকে। আমার পাশের জানলায় তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রাতের গোলকোন্ডার ছবি। আলোয় আলোয় ঝলমল করছে প্রাচীন দুর্গ। সেদিকে তাকিয়েই তন্ময় হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল একটু আগেই দিনের আলোয় যে ভাঙাচোরা, দীনহীন দুর্গ দেখেছিলাম তা যেন এক দুঃস্বপ্নের মতো সত্য। বরং এই মধুর মিথ্যাটাই যেন মনে মনে মেনে নিতে ইচ্ছে হয় যে গোলকোন্ডা তার গৌরবের দিনগুলির মতো সুন্দরী আছে। তার যৌবন আজও অক্ষয়। তার উপর কোনো দুর্বৃত্তের হাত পড়েনি, কেউ তাকে অসম্মান করেনি, কেউ তার অঙ্গহানি ঘটায়নি...।

কিন্তু সত্য বড়োই নির্মম। রাতের অন্ধকারে সে প্রচ্ছন্ন থাকলেও সকালের আলো তাকে প্রকট করে তোলে।

—'ডার্লিং...দেখেছ কী দারুণ লাগছে?' অর্ক আমার পাশের সিটটায় জমিয়ে বসে বলল—'অপূর্ব, না?'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। অপূর্ব তো বটেই। কিন্তু এই সৌন্দর্যের মধ্যে কোথায় কোন্ ভয়ঙ্কর লুকিয়ে আছে কে জানে! অবশ্য সুন্দর যদি ভয়ঙ্কর

না হয় তবে তার সৌন্দর্য শুধু সৌন্দর্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অমোঘ আকর্ষণী শক্তি হয়ে ওঠে না।

কী অদ্ভুত মোহে জানি না, কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। চেতনা ফিরল বন্দনার ডাকে।

—'তিস্তাদি, সম্রাটদাকে দেখেছেন?'

আপাদমস্তক জ্বলে গেল। কী নির্লজ্জ মেয়ে রে বাবা!

কোনোমতে মেজাজের উপর রাশ টেনে বলি—'না তো! কেন রে? কিছু দরকার আছে?

—'না...তেমন কিছু নয়। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি তাই একটু লাইনটা সম্পর্কে খোঁজখবর...।'

—'অ'। অর্ক মিটমিট করে হাসছে—'তোমার ইঞ্জিয়ারিং লাইন সম্পর্কে খোঁজ দরকার। তা বেশ তো। এখানে আমি, তিস্তা, অভিজিৎ এই তিনজন ইঞ্জিনিয়ার মিলে তোমার প্রবলেম সল্‌ভ করে দিতে পারি। সম্রাটকে প্রয়োজন নেই।' সে একটু থেমে আবার বলল—'অবশ্য আমাদের যদি তোমার পছন্দ না হয়, আর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চেয়ে হ্যান্ডসামটির প্রয়োজনই বেশি হয়ে থাকে তবে এখান থেকে নেমে ফুটপাথ ধরে সোজা চলে যাও 'ডায়মন্ড কুল ড্রিঙ্ক' শপে। সে ওখানেই কিছু হার্ডড্রিঙ্কের সন্ধানে গেছে।'

—'হার্ড ড্রিঙ্ক!'

—'বোঝো না!...মাল বোঝো?...তাও বোঝো না...বেশ, মদ নিশ্চয়ই বোঝো।'

—'আঃ...অর্ক?'

বাধ্য হয়ে একটা ধমক দিতেই হল। আমার এসব বিশ্রী কথাবার্তা একেবারেই পছন্দ নয়।

—'রিল্যাক্‌স...সোনা...রিল্যাক্‌স। আমি তো ওটা খেতে যাচ্ছি না। চটছ কেন?'

সে হেসে বলে—'অবশ্য ঘ্রাণেন অর্ধভোজনের মতো যদি উচ্চারণেন অর্ধপানের দোষ হয়ে থাকে তবে এখুনি হুকুম করো। বান্দা নাকে খৎ দিতেও রাজি...।'

—'তোমার আদিখ্যেতা থামাবে?'

—'আহা...চটো কেন? আমি তো এমনি এমনিই...এই তো আসল

কালপ্রিট হাজির...।'

সম্রাট হাতে মস্ত বড়ো একটা প্যাকিং বাক্স নিয়ে সিটে রাখছিল। অর্কর কথা শুনে মুখ তুলে তাকাল—'কী ব্যাপার?'

—'কোথায় ছিলি এতক্ষণ? তোকে এত মিস করছিলাম যে...।'

সে তার রাগী রাগী চোখদুটো অর্কর দিকে নিবদ্ধ করে বলল—'কাজের কথায় আয়।'

অর্ক এবার ভয়ানক গম্ভীর হয়ে পড়েছে—'তুমি দিনরাত টো টো করে ঘুরে বেড়াবে আর লোকে তোমায় খুঁজে খুঁজে মাথার চুল ছিঁড়বে—This is not fair। উত্তর দিতে দিতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হচ্ছে। আমি তো তোমার জন্য enquiry department খুলে বসিনি। Either তুমি নিজের বিড়াল ট্যাকে গোঁজো or... ।'

সম্রাট হেসে ফেলল। হাসলে ওর মুখটা যেন ঝলমল করে ওঠে। যার হাসি এত সুন্দর সে সর্বক্ষণ অমন বাংলার পাঁচের মতো মুখ করে ঘোরে কেন বুঝি না।

—'এসো টুনি।' তার কাঁধে আলতো চাপ মেরে সম্রাট গাড়ির পিছন দিকে চলে গেল। তার পিছন পিছন বন্দনাও। আমি শুনতে পেলাম সে বলছে— 'সম্রাটদা তুমি মদ খাও?'

—'ওটা খাওয়ার জিনিস নয়।'

—'আমি মাতালদের দু'চক্ষে দেখতে পারি না।'

—'সেটা তোমার Problem। আমার নয়।'

কী বোকা বোকা কথাবার্তা মেয়েটার!

—'এটা তো ঠিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কথা হল না।' অর্ক হাসছে। সে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই...

—'তুমি থামবে! This is too much অর্ক।'

কথাটা এত জোরে বলতে চাইনি। কিন্তু টের পেলাম আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেটা বেশ জোরে হয়ে গেছে। শিবাকুমারণ, অভিজিৎরা তো চমকে তাকালই...। এমনকি সম্রাটও এই প্রথম পূর্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে দেখছে।

অর্ককে রূঢ়ভাবে কথাটা বলার জন্য একটু একটু অনুতপ্ত হচ্ছিলাম। ওভাবে বলাটা যে ঠিক হয়নি তা-ও উপলব্ধি করেছি। কিন্তু সম্রাটের দৃষ্টি দেখে

মনটা আরো খিঁচড়ে গেল। ওভাবে তাকানোর কী আছে! আমি কি মঙ্গলগ্রহ থেকে খসে পড়া অ্যালিয়েন?

অর্ক আমার দিকে হতভম্ব হয়ে তাকাচ্ছিল। একটা সামান্য কথায় আমার এমন প্রতিক্রিয়া হবে তা ও আদৌ আশা করেনি।

—'তোমার শরীর খারাপ লাগছে না তো তিস্তা?'

এতক্ষণ অজুহাত খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অর্ক কাজটা সহজ করে দিল।

—'বড্ড মাথা ধরেছে!' মুখ চোখ কুঁচকে মাথার রগ চেপে ধরেছি—'কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

—'ভালো না লাগলে বোলো না।' সে সযত্নে মাথায় হাত রাখল—'মাথার আর দোষ কী? দিনভর রোদের মধ্যে ঘুরলে মানুষের জান কয়লা হয়ে যায়।'

আমি ভয়ে ভয়ে সিটে শরীর এলিয়ে দিলাম। কে জানে! এরপর হোটেলে ফিরে হয়তো একগাদা বাম আর অডিকোলন মেখে বসে থাকতে হবে।

—'বাবু...'

জানলা দিয়ে আচমকা একজোড়া শীর্ণ হাত উঠে এল। শিরাওঠা বৃদ্ধ হাত। করতল প্রসারিত। কিছু একটা চাইছে।

—'কে?' অর্ক হাতের মালিকটিকে দেখার জন্য ঝুঁকে পড়েছে—'কী চাও?'

—'বড্ড খিদে বাবু...তিনদিন কিছু খাইনি।' গোঁফ-দাড়িওয়ালা অস্পষ্ট একটা মুখ। চুল প্রায় ঘাড় ছাড়িয়ে পিঠের দিকে নেমে গিয়েছে। পিঁচুটি-কাটা চোখে আচ্ছন্ন ঔজ্জ্বল্য। পরিষ্কার বাংলায় বলল—'বুড়ো মানুষকে সাহায্য করুন বাবু...আল্লা আপনার ভালো করবেন।'

—'আল্লা চিরকালই আমার ভালো করেছেন।' সে হেসে বলে—'তবু তোমার যাতে ভালো হয় সে চেষ্টা করতেই পারি। দাঁড়াও বাপু।'

অর্কর মানিব্যাগ চিরকালই তার হিপ পকেটে থাকে। তা সত্ত্বেও সে প্রথমে তার সিক্স পকেট জ্যাকেটের সব ক'টা পকেট হাতড়াবে। আর বিরক্ত হয়ে উঃ আঃ করবে। এটাই তার নিয়ম। অনেকবার বলে দেখেছি। কিছুতেই কিছু হয়নি। একবারে মানিব্যাগ খুঁজে পাওয়া ওর স্বভাবেই নেই।

—'আঃ...গেল কোথায়?' যথারীতি মানিব্যাগ খুঁজে না পেয়ে সে

ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠেছে—'এইখানেই তো ছিল...।'

—'হিপ পকেটে।'

—'আঃ...ডার্লিং...এইজন্যই তো তোমায় এত ভালোবাসি।'

সে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা দশ টাকার নোট এগিয়ে ধরল 'এই যে নাও...।'

—'কী করছেন স্যার!...কী করছেন!... What the hell are you doing...!'

বলতে বলতেই শিবাকুমারণ কোথা থেকে এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে অর্কর উপরে। তাকে এক ঝটকায় জানলা থেকে সরিয়ে এন শাটার টেনে দিয়েছে। অর্কর হাতের টাকা হাতেই রয়ে গেল।

—'একী'! সে স্তম্ভিত।

—'Start the car! ...start the car right now...I say...!' পাগলের মতো ছুটে গেল শিবাকুমারণ।

ড্রাইভার তখন শান্তমনে খৈনি বানাচ্ছিল। তার রুদ্রমূর্তি দেখে ঘাবড়ে গিয়ে খৈনি টেনি ফেলে দিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

গরগর করে গর্জন করে উঠেছে টাটা সুমো। পরক্ষণেই একরাশ ধুলো উড়িয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটতে লাগল।

শিবাকুমারণ তখনো শান্ত হয়নি। সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো গাড়ির প্রত্যেকটা জানলার কাচে আঁকিবুকি কাটছে আর বিড়বিড় করছে।

—'লোকটা পাগল হয়ে গেল নাকি?' অভিজিৎ এতক্ষণ বাদে মন্তব্য করল—'বিড়বিড় করে কি বলছে? গালমন্দ করছে না তো?'

—'আমি এই মন্ত্রটা চিনি।' সম্রাটের গলায় উদ্বেগ—'শক্তিমন্ত্র পড়ছে। অশুভ শক্তিকে দূরে ঠেকিয়ে রাখার জন্য এই মন্ত্র পড়া হয়। সেটাই ও পড়ছে। কিন্তু কেন?'

যা ভেবেছিলাম।

স্বামী যদি একটু বেশিই স্নেহশীল হয়ে থাকেন তবে প্রত্যেক স্ত্রীর-ই তাকে নিয়ে গর্ব করা উচিত। 'তোহারি গরবে গরবিনী হাম'—ভাবতেও ভালো লাগে। কিন্তু কখনো কখনো ভাগ্যের দোষে সেই 'যতন'ও হয়ে ওঠে 'যাতনা'। এই যেমন এখন আমার হচ্ছে। কী কুক্ষণে যে মাথা ধরার কথা বলেছিলাম!

এখন অস্তুতাঞ্জনের ঝাঁঝালো গন্ধে, অডিকোলনের ঠান্ডা স্পর্শে আর আইসব্যাগের ধাক্কায় হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি যে স্নেহ কী পরিমাণ বিষম বস্তু!

—'যাক...এতক্ষণ বাদে অবশেষে তোমায় পেয়েছি।' আমার বিন্দুমাত্রও মতামত না নিয়ে আধখানা ব্ল্যাঙ্কেট অধিকার করে ফেলেছে অর্ক। ছেলেমানুষের মতো দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে বলল—'ওঃ...আর একটু দেরি হলে নির্ঘাত পাগল হয়ে যেতাম।'

—'তুমি সুস্থ কবে ছিলে?'

—'তোমার সাথে বিয়ে হওয়ার আগে ছিলাম সোনা।'

—তখন আধপাগল ছিলে। এখন পুরোপুরি।'

—'আমি তোমার প্রেমে পাগল।' ও আমার ঘাড়ে, গলায় মুখ ঘসছে—'বলো তো প্রমাণ করে দিই।'

সারাদিনের ক্লান্তির পর এই উষ্ণ আদরটুকু বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিলাম। চিড়বিড়ে ঠান্ডা বামের কল্যাণে মাথাটাই আদৌ আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। অর্ক কপালে চুমু খেতে বুঝলাম—আছে।

—'এখন কেমন লাগছে?'

—'ভালো না লেগে উপায় আছে?...কিন্তু...'

—'কিন্তু কী? উম্ ম্ ম্...।'

ও আদর করতেই ব্যস্ত। কথাগুলো কতদূর কানে ঢুকবে সন্দেহ। তা সত্ত্বেও বললাম—'শিবকুমারণের কাণ্ডটা খুব ভাবাচ্ছে গো।'

—'কে শিবাকুমারণ?'

—'ধ্যাৎ...।' ছোট্ট একটা ধাক্কা মেরে ওকে বুকের উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছি—'আমার একটা কথাও কি তুমি কানে তুলবে না! আমি কি হাওয়ার সঙ্গে কথা বলছি?'

—'অগত্যা।' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ তুলল—বলো কী বলবে! কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার বক্তব্য শেষ কর। নয়তো শেষের কথাগুলোও কানে ঢুকবে না।'

—'তোমার ওই শিবাকুমারণটিকে একটু অস্বাভাবিক মনে হয়নি?'

—শিবাকুমারণটা কে ছাই তাই-ই তো বুঝলাম না।' অর্ক উঠে বসে ড্রয়ারের দিকে হাত বাড়াল—'তুমি কি গাইডের কথা বলছ?'

—'নয়তো কি ওয়েটারের কথা বলছি? আশ্চর্য।'

—'ওকে...ওকে...বলো।'

—'ওর ব্যবহার তোমার অস্বাভাবিক ঠেকেনি? বিশেষ করে শেষমেশ ও যে কাণ্ডটা করল তার কোনো যুক্তিই আমি খুঁজে পাইনি। একটা বুড়ো ভিখারি! —সে আমাদের খেয়ে ফেলত না কামড়ে দিত! তাকে ভয় পাওয়ারই বা কী আছে?'

—'একটু ইম্পালসিভ মনে হয়েছে ঠিকই। বুড়োটাকে দেখে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা কি খুব ইম্পর্টান্ট? তুমি আমার ছোট্ট সুন্দর আদুরে বউ। আমার বুকে চুপ করে শুয়ে আদর খাও। তোমার অত চিন্তা করে কাজ কী?'

ওর মুখটা আবার বিপজ্জনক কাছে নেমে এসেছে।

—'অর্ক, আমার ভালো লাগছে না।' আমি মুখ সরিয়ে নিয়ে বললাম— 'চলো, আমরা এখান থেকে চলে যাই। শিবাকুমারণের হাবভাব ভালো ঠেকছে না। কিছু একটা গোলমাল নিশ্চয়ই আছে। চলো, বরং ভাইজাগ যাই। মায়ের কাছে শুনেছি খুব সুন্দর জায়গা।'

—'ভাইজাগও যাব...তবে পরের বছর,' ও আমায় একরকম জোর করে বুকে টেনে নিয়েছে—'এটা কী পরেছ? এটার বোতাম কোথায়?'

বুঝলাম কথা বলে লাভ নেই। ও কানে তুলবে না।

—'এটা ওভাবে খোলে না, পিছনে ফিতে...।'

—এ সব উলটোপালটা জিনিস কেন যে পরো।'

সে বাচ্চাছেলের মতো আশ্রয় খুঁজছে। চুমু খেতে খেতে শরীরটা উলটে দিল। নারীদেহটা নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরতেই টের পেলাম কেমন একটা শৈত্য আমায় ঘিরে ধরেছে। অভ্যাসবশত। চোখ বুজে আসছিল। কিন্তু শরীর তেমন করে বেজে উঠছে না।

কানে গরম ঠোঁট ঘষতে ঘষতে অর্ক বলল—'I love you...love you!'

–'Love you too...!'

রিফ্লেক্স অ্যাকশনেই কথাটা বেরিয়ে গেল। বিয়ের পর থেকেই একবছর ধরে প্রায় প্রতিটি রাতে এই একই কথা বলে আসছি। আজও তার অন্যথা হল না।

এরপরেই মিনিট দশেক শুধু ঘন নিঃশ্বাসের জোয়ারে ভেসে বেড়ানোর ইতিহাস। শরীরের সাথে শরীরের কথা বলা। ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে পরস্পরের

সত্তাটুকু শুষে নেওয়ার প্রচেষ্টা। অর্কর হাতদুটো, ঠোঁট, জিভ শরীরের যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরুষের উষ্ণ বুক থেকে উঠে আসা অদ্ভুত একটা গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা মারল।

—'এরকম স্টিফ হয়ে আছ কেন?' অর্ক গলায় কামড়ে দিয়েছে—'তোমার হচ্ছে না?'

হতে তো চাইছে, পায়ের পাতা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত হবার জন্য তৈরি। কিন্তু তেমন হচ্ছে কই! অর্ক বোঝে না—ওর এই ছেলেমানুষি আদরে আমার মন ভরে না। সব যেন উপর দিয়ে চলে যায়। এ যেন সুইমিং পুলের টলটলে জলের উপর দিয়ে সাঁতার কাটা। সমুদ্রের গভীরে, অজানায় ডুবে যাওয়ার রোমাঞ্চ নেই, নেই জ্বালা ধরানো অনুভব, অর্কর সব ভালো, শুধু যদি ও আরেকটু পুরুষ হত।

ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই টের পেলাম কোমরে উদ্ধৃত পুরুষাঙ্গের খোঁচা। অর্ক তার শীস উন্মুক্ত করে ফেলেছে। স্তনের উপর, স্তন বৃন্তের উপর, নাভির খাঁজে অল্প অল্প করে লিঙ্গ ঘষছে সে। ওর পুরুষাঙ্গ বেশ দীর্ঘ। তার উপর রোমশ।

—'প্লিজ, সাক্ মি।'

অর্কর ঘন নিঃশ্বাসের সাথে কয়েকটা কথা বেরিয়ে এল। প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই সে দু পা ছড়িয়ে দিয়েছে আমার মুখের উপর। ভেজা ভেজা অথচ দৃঢ় কঠিন, ঘন কালো অঙ্গটা মুখে ঘষা খাচ্ছে। আমার মুখে যৌনাঙ্গ ঘষতে ঘষতে বলল অর্ক—মুখে নাও তিস্তা...।'

যৌন মিলনের আগে ফোর প্লে খুব জরুরি। আর ফোর প্লে বলতে অর্ক শুধু বোঝে সিক্সটি নাইন পশ্চার। পরস্পরের যৌনাঙ্গ লেহন, চোষণ। হয়তো পুরুষের লিপ্সা ও সুখ শুধুমাত্র লিঙ্গেই সীমাবদ্ধ বলে তারা বোঝে না নারীর আকুতি শুধু যোনিতে নয়। তার দৃঢ় হয়ে ওঠা স্তন চায় শক্তিশালী মর্দন। একটা সাপের মতন জিভ আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরবে স্ফীত হয়ে ওঠা স্তনবৃন্ত। লালচে বাদামি স্তনগোলক কেঁপে উঠবে। চাইবে, পুরুষ গোটা স্তনটুকুই মুখে নিয়ে নিক। দৃঢ় হয়ে ওঠা বৃন্তকে প্রথমে আদর ও পরে ছিন্নভিন্ন করুক। প্রথমে লেহন, পরে চোষণ...আর তারপর? ....তারপর একটা কামড়। একটু একটু করে সে কামড় তীক্ষ্ণতর হবে—আঃ...!

অর্ক—ততক্ষণে যোনিমুখে জিভ রেখেছে। ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় জানাল—

'আঃ...আঃ...দাঁত বসাও তিস্তা...জোরে...আরো জোরে...আঃ...আঃ...ও মাঃ...'

আমি ভিজছি। অর্কর জিভ, ঠোঁট আরো গভীরতর বিবরে প্রবেশ করেছে। নিম্নাঙ্গে দারুণ বেসামাল অবস্থা। পেশিগুলো যেন ক্ষুধার্ত অজগরের মতো কী যেন একটাকে গিলে খাবার জন্য উত্তাল। আমার মুখের মধ্যেই অর্কর লিঙ্গ স্ফীত হয়ে উঠেছে। ক্রমাগতই নোনতা হয়ে পড়ছে। ও আর পারবে না। অথচ আমি চাই ও আরেকটু অত্যাচারী হোক। আরো অনেকক্ষণ ধরে আমায় মর্দন, চোষণ, চর্বন করুক। এখনই যোনিতে ওকে প্রবেশ করতে দেওয়ার মতো উন্মত্ততা আমার আসেনি। ও কি আরেকটু টিকে থাকতে পারে না? ও কি বোঝে না এই আমন্ত্রণী ভঙ্গিতে স্ফুরিত স্তনবৃন্ত নিয়ে আমি কোথায় যাব? কবে বুঝবে? কবে হবে সে বিস্ফোরণ!

আস্তে আস্তে ইন্দ্রিয়ের জানলাগুলো বন্ধ হয়ে এল। চোখের সামনের আলো নিভে যাচ্ছে। কানের ভিতর শেষ শব্দটুকুও ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল। অনাবৃত চামড়ার উপর আরো একটা গরম চামড়ার স্পর্শ। বিছানার উপর শরীরের মৃদু উত্থান পতনের আওয়াজও চলে যাচ্ছে চেতনার বাইরে...।

—'দুম্...দুম্...দুম্...।'

বন্ধ দরজায় এসে আছড়ে পড়েছে প্রবল সাইক্লোন। তার সাথে অভিজিতের কণ্ঠস্বর—'বলি রাত আটটাতেই ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? দরজা খোল শালা।'

মুহূর্তের মধ্যেই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসেছি। জামাকাপড় ক্ষিপ্র হাতে ঠিকঠাক করে নিতে নিতে দেখলাম অর্ক বিছানার উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে। উত্তেজনার মুখে রাশ টানতে টানতে সে ধরা গলায় বলল—'আসছি...আসছি...।'

ওর সমস্ত শরীরটা উত্তাল হয়ে উঠেছে। রীতিমতো কষ্টও হচ্ছে। কেমন মায়া লাগল। বেচারা! ফুলস্পিডে চলা গাড়িতে হঠাৎ ব্রেক কষে দিলে যা হয় আর কী।

—'কী রে! কতক্ষণ ধরে আসছিস!...এ কি রিল্লে না কি? তাড়াতাড়ি খোল বলছি!'

—'আসছি রে বাবা আসছি!' সে ততক্ষণে খানিকটা সামলেছে। শার্টের বোতাম আটকাতে আটকাতে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েও থমকে গেল। ইশারায় বলল—'আমার চুল ঠিক আছে?' তারপর নিজেই আঙুল চালিয়ে ঠিক

করে নিল। কী মনে হতেই বিছানার চাদরটাও টানটান করে দিয়েছে। তারপর ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

—'আরেঃ!...বলি মরে গেলি না কি!'

—'উঃ!...আসছি।'

দরজা খুলে গেল। অর্ক যেন অভিজিতের সামনে দাঁড়াতে একটু সঙ্কোচ বোধ করছে। মুখ নীচু করে মৃদু স্বরে বলল—

—'আয়।'

—'একটা দরজা খুলতে এতক্ষণ লাগে!' অভিজিতের মুখে একরাশ বিরক্তি—'কতক্ষণ ধরে নক করে যাচ্ছি।'

—'বোস...বসুন দাসদা। আমি একটু আসছি...।' সে মুখ নীচু করেই বাথরুমে ঢুকে গেল। অভিজিতের লম্বা-চওড়া চেহারার পিছনে দাসবাবুর স্বল্প পরিসর চেহারাটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। এবার স্পষ্ট দেখা গেল। ভদ্রলোক সঙ্কুচিত স্বরে বললেন—'ডিস্টার্ব করলাম না তো?'

—'একেবারেই না।' হেসে বলি—'বরং রুমে বসে বোর হচ্ছিলাম। আপনারা এসে ভালোই করেছেন।'

—'তিস্তা, একটু অ্যাকটিভ হ তো!' অভিজিৎ ধ্যানী বুদ্ধর মতো বিছানায় গ্যাঁট হয়ে বসল—'অর্ক তোকে পটের বিবি করে রেখে ফিগারটার সর্বোনাশ করছে। দিনকে দিন মোটা হয়ে যাচ্ছিস।'

আমি!...মোটা!...সামনের আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব পড়েছিল। চকিতে একবার দেখে নিলাম। কোথাও একটু বেশি মেদ লেগেছে কি? গলার কাছটায় একটু যেন চর্বির আভাস...।

—'নে, তোকে একটা কাজ দিলুম। বয়কে বলে কয়েকটা গ্লাস আর বরফ জোগাড় করে আন। আর একপ্লেট কাজুও যদি ম্যানেজ করতে পারিস তবে তো সোনায় সোহাগা!'

—'মানে?' মাথাটা দপ্ করে গরম হয়ে গেল—'তোরা এখন ওইসব গিলবি!'

—'নয়তো কি হরিনাম করব? ওই শিবাকুমারণটা এমনিতেই বিকেলটা মাটি করল। তার উপর তুই আর প্যানপ্যান করে মস্তিটা নষ্ট করিস না।'

খুট করে ছিটকিনি খোলার শব্দ। অর্ক বেরিয়ে এসেছে। তার চোখে মুখে জলের ছোটো ছোটো বিন্দু। এবার অনেক সহজ ও সংযত স্বরে সে বলল—

'শিবাকুমারণ আবার কী করল?'

—'আরে ইয়ার...।' বিরক্তিতে তার মুখ ভয়ানক পাঁশুটে হয়ে গেছে—'মালটার কী হয়েছে বল তো? ফোর্ট থেকে ফেরা অবধি থোবড়া লটকে বসে আছে। হায়দ্রাবাদের বিরিয়ানি বিখ্যাত জানিস তো? এখানে 'বাহার' বলে একটা রেস্টোর‍্যান্ট আছে। এখানে নয়—বশিরবাগে। ভাবছিলাম ওখান থেকেই কয়েক প্যাকেট নিয়ে এলে রাতে বেশ মৌজ করে খাওয়া যাবে। সে কথা বলতেই প্রায় তেড়ে মারতে এল। বলে কিনা 'রাতে কেউ হোটেল ছেড়ে বেরোবে না। This is my order। তা সত্ত্বেও যদি যেতে চান তবে আপনার দায়িত্ব, আমার নয়।'

শিবাকুমারণের অস্বাভাবিক হাবভাব নিয়ে কিছুক্ষণ আগেই আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। তখন প্রসঙ্গটা কানে তোলার প্রয়োজনও বোধ হয়নি। এখন অভিজিতের কথায় অর্কর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল।

—'লোকটা একটু অদ্ভুত না?'

—'অদ্ভুত তো ছিল না। আজ বিকেল থেকেই কেমন যেন ব্যবহার করছে।'

অভিজিৎ কাঁধ ঝাঁকায়—'বাদ দে, কী হল? দাঁড়িয়ে আছিস যে? তোকে বললাম না গ্লাস নিয়ে আসতে।

এমনিতেই ওর কথাবার্তা শুনে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। তার উপর আবার সবার সামনে এমন তাচ্ছিল্য করে কথা বলা! প্রবল একটা জবাব ঠোঁটের সামনে এসে ঘুরঘুর করছিল। অতিকষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে এনেছি—'আমার মাথা ধরেছে...পারব না।'

—'পারবি না!...ঠিক আছে।' সেনিজেই দুমদাম করে পা ফেলে বেরিয়ে গেল—'ভাবিস না, আমি চলে যাচ্ছি। এখুনি ফিরে আসছি with bottle and bottle–সম্রাট।'

বুকের ভিতরে ধক করে উঠল। এ কী জ্বালা! ওই মাতাল লোকটা এখন এখানে এসে জ্বালাবে। বিপুল বিতৃষ্ণার সাথে কেন জানি না ভয় ভয়ও করছে। কী দরকার ছিল ওকে এখানে ডাকার? অভি জানে আমি লোকটাকে পছন্দ করি না, তবুও...।

—'কেমন আছ তিস্তা?' দাসবাবু একরাশ সঙ্কোচ নিয়ে বললেন—'আমার আগেই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।'

মুচকি হেসে বললাম যে এখন অনেকটাই ভালো আছি। উনি জানতে চাইলেন আমি পেইন কিলার ব্যবহার করেছি কি না। করিনি শুনে খুব খুশি হয়ে এ-ও জানালেন যে পেইন কিলার ব্যবহার করা একেবারেই উচিত নয়। তাতে অ্যাসিড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এমনকি বেশি খেলে নাকি আলসারও হয়ে যেতে পারে।

আমি পরম উৎসাহে ওঁর কথা শুনছি। যেন ওঁর কথাই আমার বেদবাক্য। ওঁর কথা শোনার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই মুহূর্তে থাকতেই পারে না। এমনকি দুটো পায়ের শব্দ যে করিডোর থেকে এগিয়ে আমার ঘরের দিকে আসছে তাও যেন আমি শুনতে পাইনি।

—'তোমার বউদি আর টুনিকে পই পই করে বলেছি পেইন কিলার না খেতে। কেউ আমার কথা শোনেই না। যেদিন পেটে জ্বালাপোড়া হবে সেদিন বুঝবে মুঠো মুঠো ট্যাবলেট খাওয়ার কী...।

—'কেমন আছেন?' কানের কাছে একটা ভারী, উষ্ণ কণ্ঠস্বর—'Feeling better?'

বাব্বাঃ! কে জিজ্ঞাসা করছে! আমার মাথা ধরা একেবারে সার্থক।

—'এখন অনেকটাই ভালো।

—'গুড...অর্ক...।' সম্রাট আর প্রশ্ন না করে প্রসঙ্গান্তরে গেল—কাল আমাদের সকালে কী কী প্রোগ্রাম?'

—'কাল আমরা একটু রেস্ট নেব। সকালবেলা ইচ্ছে করলে কুতুবশাহী টুম্বসটা দেখে আসতে পারিস। কিন্তু গেলে একাই যেতে হবে। আমার এসব কবর-টবর দেখতে মোটেই ভালো লাগে না।'

—'আমারও ভালো লাগে না।' অভিজিৎ বলল—'তার উপর শিবাকুমারণ যা ঝামেলা করছে তাতে ওর সাথে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই। আজ একটা বুড়োকে দেখে ভয় পেয়েছে। কাল যে-কোনো বুড়িকে দেখে মুচ্ছো যাবে না তার গ্যারান্টি কী?'

ওদের কথা শুনতে শুনতে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। আমার চিরকালই 'হেরিটেজ'-এর প্রতি দুর্বলতা। অতীতের কুয়াশামাখা ইতিহাসের পাঁজর দেখতে ভালো লাগে। বুকের ভিতর রোমাঞ্চও অনুভব করি। তার উপর সেই প্রাচীন ইতিহাসের সমাধিস্থল হলে তো কথাই নেই। কেমন একটা গা ছমছমে অনুভূতি নিয়ে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ানোর আলাদা মজা আছে।

—'কবরটাও কি দেখার জিনিস নয়? আমার তো দেখতে ভালোই লাগে।'

অর্ক সস্নেহে আমার কাঁধে হাত রেখেছে—'শুধু তোমার ভালো লাগলেই তো হবে না সোনা। আমাদেরও যে ভালো লাগা চাই। আমি মনে করি না তুমি ওইসব সমাধি টমাধির মধ্যে কোনো ইন্টারেস্ট পাবে। তা ছাড়া যখন আমরা কেউ যাচ্ছি না তখন তোমারই বা যাওয়ার দরকার কী?

বাধ্য হয়ে চুপ করে গেলাম। ও যখন বলছে তখন হয়তো সত্যিই কিছু দেখার নেই। কিংবা দেখার থাকলে হয়তো সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমিই হয়তো একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছি।

একটা সিগ্রেট মুখে গুঁজে ফস্ করে লাইটার জ্বালাল সম্রাট। টুংটাং করে হালকা অথচ মিষ্টি সুরে মোজার্টের সোনাটা বাজছে। মিউজিক্যাল লাইটার।

—'Sorry for interfering' তার মেঘমন্দ্র স্বরে কাটা কাটা স্পষ্ট শব্দগুলো উচ্চারিত হল—'কিন্তু তোর মনে করাটাও কিন্তু ultimate নয় অর্ক।'

—'মানে?'

—'তোর কবর দেখতে খারাপ লাগতেই পারে। কিন্তু তা বলে তিস্তারও যে খারাপ লাগতেই হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই। তুই নিজের পছন্দ-অপছন্দ ওর ঘাড়ে চাপাচ্ছিস।'

অর্ক একটু থমকে গেল। চিরকালই ও সকলের কাছে 'গুডবয়ের' শিরোপা পেয়ে এসেছে। সবসময়ই সে প্রমাণ করে এসেছে যে ও ভালো মানুষ, ভালো সন্তান, ভালো বন্ধু...এমনকি ভালো স্বামীও বটে। কিন্তু আজ ওর আত্মবিশ্বাস বোধহয় এক জায়গায় এসে হোঁচট খেল।

—'আমি তো ওকে যেতে বারণ করিনি।' সে আহত স্বরে বলে—'শুধু বলছিলাম যে ওর ওসব হয়তো ভালো লাগবে না।'

—'ওর ভালো লাগা-না-লাগাটা ওর উপরেই ছেড়ে দে না।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল সম্রাট—'মোটের উপর কাল সকালে আমি কুতুবশাহী টুম্বস দেখতে যাচ্ছি। তিস্তা ইচ্ছে করলে আমার সাথে যেতে পারেন।' সে তার উজ্জ্বল অথচ শান্ত দৃষ্টি অর্কর উপর ফেলেছে 'If you allow me... ।'

'Sure'। অর্ক একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—'Why not? এতে allow করার কী আছে? তিস্তার ইচ্ছে করলে যাবে। আমি তো বারণ করিনি।'

তার চোখদুটো কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে এসেছে। গলার স্বরটাও যেন

কেমন। ওর মুখ দেখে আমার কান্না পেয়ে গেল। অর্ক নিশ্চয়ই অভিমান করে এমন বলছে। ও চিরকালই চাপা স্বভাবের। দুঃখ পেলেও মুখে প্রকাশ করে না।

—'না...থাক...আমি যাব না...।'

সম্রাট মুখের ধোঁয়া গিলে ফেলে হো হো করে হেসে উঠল। হাসির দমকে ওর চওড়া বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আমরা প্রত্যেকেই ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। এতে এত হাসির কী হল?

সে অতিকষ্টে হাসি থামিয়ে বলল—'দাড়িওয়ালা বুড়োর একটা কোটেশন মনে পড়ে গেল রে...পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নইলে খরচ বাড়ে... অভি...গ্লাস আন...

আবার সেই বিরক্তিকর অট্টহাসি।

বাধ্য হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হল।

আমাদের হোটেলের করিডোরটা বেশ লম্বা। ছোটো ছোটো টবে সযত্ন লালিত পাথরকুঁচি, অর্কিডের চারায় ঝলমল করছে। কাচে মোড়া জানলায় নীচের শহরের ব্যস্ত আলোকবিন্দুর প্রতিচ্ছবি। ছোটো ছোটো চলমান বিন্দুগুলো স্বচ্ছ কাচের উপর দিয়ে মসৃণগতিতে ছুটতে ছুটতে টুক করে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। আবার নতুন আলোকবিন্দু এসে তার জায়গা দখল করে নিচ্ছে। দুনিয়ার এটাই দস্তুর। কোনো জায়গাই কখনই খালি থাকে না। অর্থাৎ কোনো ক্ষতিই অপূরণীয় নয়।

কখন যে নিজেরই অজান্তে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি জানি না। এখান থেকে কত নীচে হায়দরাবাদের মেইন রোড। গাড়িগুলো যেন দেশলাইয়ের বাক্স। মানুষ তো চোখেই পড়ে না। এখান থেকে পড়লে আর দেখতে হবে না। 'পপাত ধরণী তলে' হওয়ারও প্রয়োজন নেই। শূন্যেই হার্টফেল করে নামের আগে চন্দ্রবিন্দু লেগে যাবে।

আমি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সটান নীচের দিকে তাকিয়েছিলাম। তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগছিল। নীচে অতলান্তিক মৃত্যু হাঁ করে শিকারের অপেক্ষায়। তা সত্ত্বেও কী আশ্চর্য রোমান্টিক! একটু হাত বাড়ালেই বুঝি ছোঁয়া যায়। আস্তে আস্তে শরীর একটু শিথিল করে দিলেই সবল দুটো হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নেবে।

মৃত্যুও শিকারী। সম্রাটের মতো শিকারী। কী শিকার করতে চায় ও?...

আমার চোখের সামনে হায়দরাবাদের ব্যস্ততা। কিন্তু মনটা গজেন্দ্র গমনে এগোচ্ছে। কিছুতেই একটা নির্দিষ্ট বৃত্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারছি না। সম্রাটের মনে কী আছে? ও কী চায়? আমার সাথে কুতুবশাহী টুম্বস দেখতে যাওয়ার পিছনে কি অন্য কোনো গোপন ইচ্ছে।...! একটু শিথিলতার অপেক্ষা। ...! শিকারী...! শিকারী...!

হঠাৎ সমস্ত অন্তঃকরণ কেঁপে উঠল। কানের ভিতরে একঝলক গরম হলকা। ছিঃ...ছিঃ...এ কী অসভ্যতা। বর্বর...ছিঃ...। না, কিছুতেই যাব না আমি। ওকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে সবাই বন্দনা নয়। অর্ক এত ভালোমানুষ...আর তার সাথে এমন প্রবঞ্চনা। বিশ্বাসঘাতক! ওর মুখোশটা ছিঁড়ে দেওয়া উচিত! সুন্দর চেহারার পিছনে একটা রাক্ষস! ...ছিঃ...!

মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। মনকে শান্ত করতেই সময় লাগল। অবশেষে ধীরে সুস্থে শান্ত সমাহিত মনে উঠে দাঁড়ালাম। স্নায়ুযুদ্ধে মাথা ঠান্ডা রাখা আবশ্যক। যেখানে প্রতিপক্ষ পেশাদার খেলোয়াড় সেখানে টেম্পারামেন্টটা বড়ো ফ্যাক্টর।

করিডোর থেকে ঘরের দিকে এগোতে এগোতেই আমার যা যা বক্তব্য তার একটা সংক্ষিপ্ত খসড়া তৈরি করে নিয়েছি। না যাওয়ার কারণ হিসাবে যে যে অজুহাতগুলো ভেবে রেখেছি সেগুলো মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালাম। ভেজানো দরজায় আলতো করে ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে ভেসে এল অভিজিতের অপ্রকৃতিস্থ কণ্ঠস্বর—'ক-উ-ন হা-য়?'

এই সম্ভাবনাটার কথা একেবারে মাথায় আসেনি। থমকে দাঁড়ালাম। এত ঘটা করে, এত সময় নিয়ে ভেবেচিন্তে কাদের সামনে ভাষণ দিতে যাচ্ছি! বক্তা প্রস্তুত। কিন্তু শ্রোতারা?

বক্তৃতা আমার মাথায় থাক। দরজা খুলে ভেতরে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে চক্ষু চড়কগাছ। সম্রাট তার স্বভাবসিদ্ধ রাজকীয় ভঙ্গিমায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে পড়ে আছে। চোখ বোজা। হুঁশ আছে কি নেই বোঝা দায়। অভিজিৎ তার বুকের উপর চড়ে বসে 'ঘোড়াঘোড়া' খেলছে। দাসবাবু সটান মেঝেতে।

আর অর্ক? সে-ও আছে বই-কি। সে বিছনার এককোণে বসে শেক্সপিয়র আওড়াচ্ছে—'Care is no cure, but rather a corrosive for things that are not to be remedied;'

—'শা-লা'। অভিজিৎ একহাতে সম্রাটের মাথার চুল খামচে ধরে

ঠাসঠাস করে সপাটে চড় মারল। মারার চোটে সে নিজেই উলটে পড়ে আর কি! কোনোমতে সামলে নিয়েছে—'শা-লা হা-রা-মি...দা-তা কন্‌ণো! অ্যাঁ... তোর পয়সা ছিল...তাই দিয়েছিলি। দ-য়া করেছিলি! ...মাথা কিনে নিয়েছিলি না-কি! ...থুঃ...খান্‌কির বাচ্চা!...এই দ্যাখ...আমি নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি!... দ্যাখ শালা! এটা আমার ক্যা-লি! ...স্রেফ আ-মার ক্যালি!...তুই কে?...তুই কী? শত্রু...শত্রু আমার ঘাড়ে একটা পাথর চাপিয়ে দিয়েছিস...ঋণ...ঋণ... তোর কাছে আমার ঋণ...হাসছিস শুয়োর! হা...হাস! ...hate you...hate you! ...থুঃ! থুঃ! থুঃ!'

প্রবল আক্রোশে একরাশ থুতু ছিটিয়ে দিতে দিতে সম্রাটের বুকের উপর এলিয়ে পড়ল অভিজিৎ।

আমি শুধু নীরব দর্শক।

পরদিন সকালে গন্তব্যস্থল কুতুবশাহী টুম্বস।

সম্রাট আজ একটা নীল পুলওভার পড়েছে। ওর চেহারাটাই এমন যে যে-কোনো পোশাকেই ওকে চমৎকার মানিয়ে যায়। কিন্তু আজ ওকে আশ্চর্য লাগছিল। বেশ টের পেলাম ওর সেই নীরব ও গম্ভীর সৌন্দর্যের পাশে আমার উগ্র সাজসজ্জা খেলো হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইচ্ছে করছিল শেষবারের মতো বেঁকে বসি। কুতুবশাহী টুম্বস তো আর 'ভ্যালি অব দি কিংস' নয় যে দেখতেই হবে।

—'কী রে? তোরা চললি তা হলে?'

অভিজিতের মুখ ব্যাজার। সে কাল রাতে ছড়িয়ে ছত্রিশ করেছে। আমাদের সামনে যা করেছে তা তো করেছেই। উপরন্তু মাতাল অবস্থায় নাকি মোবাইল থেকে বাড়িতে ফোন করে ওর বাবাকে বলেছে—'তুমি আমার বাবা নও। আমায় সাপে কামড়াল আর তুমি টের পেলে না!'

ওর বাবা তো আকাশ থেকে পড়েছেন-ই। তার সাথে সাথে অভিজিৎ নিজেও প্রায় মহাশূন্য থেকে পড়েছে। সাপটা যে এর মধ্যে কোত্থেকে এল তা সে নিজেই ভেবে পাচ্ছে না। মাঝখান দিয়ে সকাল থেকে এখনো পর্যন্ত বাড়ি থেকে প্রায় বাযট্টিটা উদ্বিগ্ন ফোন এসে গেছে। আরো আসার আশা করা যেতেই পারে।

—'কাল রাতে হেভি থিন্নি করেছি না রে?' সে অনুতপ্ত মুখে বলল—'সরি ইয়ার। কাল আমার ট্যাঙ্কি ওভাবে ওভারলোডেড হয়ে যাবে আমি বুঝতে

পারিনি।'

—'ওভারলোডেড!' আমি হেসে বললাম—'কাল তোর ট্যাঙ্কি ভেসে গিয়েছিল রে।'

—'সে তো বুঝতেই পারছি।' ও মুখ নীচু করে বলে—'সম্রাটটা পাঁড় মাতাল। ওর সাথে তাল মেলাতে গিয়ে...!

কথাটা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। সম্রাট লম্বা লম্বা পা ফেলে এদিকেই আসছে।

—'রেডি?'

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

—'চলুন।'

কুতুবশাহী টুম্বসটা প্রপার হায়দরাবাদ থেকে বেশ খানিকটা দূরে। গোলকোন্ডা ফোর্ট থেকে এর দূরত্ব প্রায় এক কিমি। বেশ নির্জন জায়গায় নিশ্চুপে কুতুবশাহী রাজারা শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন। শ্বেতপাথরের তৈরি সমাধিস্থল। বর্গক্ষেত্রাকৃতি কারুকার্যময় দালানের উপর বিশাল গম্বুজ—মোটামুটি এই হল সমাধিক্ষেত্রগুলির সাধারণ চেহারা। তবে ব্যতিক্রমও আছে। যেমন অভিজাতদের ক্ষেত্রে চৌকো দালানটা দ্বিতল। অন্যদের ক্ষেত্রে একতলা। কিন্তু স্থাপত্যের মধ্যে দেখা যায় পদ্মফুল, শিকলের কারুকাজ, বড়ো বড়ো স্তম্ভ প্রভৃতি। সর্বমোট পাঁচটি আর্কিটেকচারের সংমিশ্রণে সমাধিগুলো তৈরি। ইন্দোসেরাসেনিক, হিন্দু, পার্শিয়ান, রাজস্থানী ও ইউরোপীয়ান স্থাপত্যের মিলনে শিল্পের এ এক পঞ্চবেণী সঙ্গম।

প্রত্যেকটা সমাধিস্থলের লাগোয়া একটা করে মসজিদ আছে। সেখানে উদ্ভট উদ্ভট সব ছবি।

—'ক্যালিগ্রাফি!' সম্রাট বলল—'ক্যালিগ্রাফিতে এগুলো কী লেখা?'

—'কোরান লেখা আছে স্যার।' শিবাকুমারণ একটা পাথরের ফলকের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে—'সামনে যে ফলকটা দেখছেন ওটাতে স্বয়ং ঔরঙ্গজেব রাজমাতা হায়াতবক্সি বেগমের প্রশস্তি খোদাই করে দিয়েছিলেন।'

—'ঔরঙ্গজেব প্রশস্তি লিখেছেন? তা-ও আবার এক মহিলার জন্য!' প্রোফেসর বিদ্যুৎ মুখার্জি অবাক!—'ভাবতেই পারছি না।'

—'কেন স্যার? মেয়েরা কি মানুষ নয়?' শিবাকুমারণের চটজলদি জবাব—''মেয়েরা শক্তির অংশ। তার সামনে মাথা নোয়াতে হয় সবাইকেই।

যারা মহান তারা বলে কয়ে হার মানেন। আর যারা কাপুরুষ তারা গোপনে হার স্বীকার করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলেরই গতি এক।'

মিথ্যে বলব না। মনে মনে বেশ একটু স্ফীতি অনুভব করছিলাম। নিজেদের প্রশংসা শুনলে কে না আনন্দিত হয়? যে হয় না, সে হয় বিনয়ের নলকূপ নয়তো একটি আকাট মুখ্যু।

সম্রাটের বোধহয় কথাটা বিশেষ পছন্দ হয়নি। সে উদ্ধত অথচ মনোরম গ্রীবাভঙ্গি করে বিড়বিড় করে বলল—'ঔরঙ্গজেব মহানই বটে! মহান বজ্জাত...।'

—'মি. শিবাকুমারণ, মনে হচ্ছে অন্তত একজন আপনার সঙ্গে একমত নয়।' আমি আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললাম, ওর এই ঔদ্ধত্য অসহ্য।

সে হাসল। স্মিত হাসিটুকু যতখানি মিষ্টত্ব বয়ে আনে তার চেয়েও অনেক বেশি বহন করে অম্লরস।

—'আমার একমত হওয়া-না-হওয়ার কী আসে যায়?'

—'তবু সেই অন্য মতটাই একটু শোনা যাক।'

—'আমার কোনো মত নেই। তবে যেখানে-সেখানে কোঁকানোর চেয়ে মাথা কেটে ফেলতেই আমি পছন্দ করব।'

আপাদমস্তক জ্বলে গেল। তুমি কোথাকার বীরপুঙ্গব হে! তোমার মাথারই বা মূল্য কী?

আমি এর একটা কড়া উত্তর মনে মনে তৈরি করছিলাম। কিন্তু সেটা শিবাকুমারণের হস্তক্ষেপে পেটেই রয়ে গেল—'ওই যে সমাধিটা দেখছেন না ওটা শেষ কুতুবশাহী রাজা আবুল হাসান তানাশা-র সমাধি।'

—'ওটা তো Incomplete!'

—'হ্যাঁ স্যার। আসলে প্রত্যেক রাজাই তাঁর জীবদ্দশায় সমাধির অধিকাংশ কাজ সেরে ফেলতেন। বাকিটা তাঁর মৃত্যুর পর সন্তান সন্ততিরা করে দিত। কিন্তু আবুল হাসান সে সুযোগ পাননি। সমাধি গড়ে তোলার কাজ যখন অর্ধেক হয়েছে তখনই কুতুবশাহী বংশের পতন হয়। তাই সুলতান বা তার উত্তরপুরুষরা সমাধিটা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। এখন শেষ ভরসা দয়াবান অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। আসুন...। শিবাকুমারণ এগিয়ে গেল।

এই সমাধিগুলোর মধ্যে মূলত মহম্মদ কুলি আর আবদুল্লা কুতুব শাহের সমাধিটাই দেখার মতো। কুতুবশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান কুলির

কবরটাও নিশ্চয়ই কোনো এককালে দেখার মতো ছিল। বর্তমানে প্রাচীনত্বের ভারে ন্যুব্জ।

—'সুলতান কুলির মৃত্যুটাও খুব দুর্ভাগ্যজনক। প্রোফেসর মুখার্জি বললেন—'১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেরই ছেলের হাতে খুন হন।'

এতে দুর্ভাগ্যের কী আছে তা বুঝতে পারলাম না। ছেলের হাতে বাপ, আর বাপের হাতে ছেলের খুন হওয়ার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে আছে। মসনদ দখল করার জন্য নিজের রক্তও যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, স্নেহ, মমতার চেয়েও যে ক্ষমতা আর লোভের শক্তি বেশি তা ভারতবর্ষের ইতিহাস পদে পদে প্রমাণ করে এসেছে। আর শুধু ভারতবর্ষই বা কেন? সারা পৃথিবীর এই একটাই ইতিহাস। অর্থের কাছে চিরকালই দুনিয়ার তাবৎ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা পরাভূত।

নিজের মনেই কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে কখন যে বুঁদ হয়ে গিয়েছি তা টেরই পাইনি। পাঠক্রম বহির্ভূত ইতিহাসের যে একটা অদ্ভুত মাদকতা আছে তা অস্বীকার করা যায় না। পাঠক্রম অন্তর্ভুক্ত ইতিহাসেরও যে নেই তা নয়। কিন্তু সেটা আফিমের নেশা। সাল তারিখের খোঁচা খেতে খেতে সবে দু লাইন পড়েছি কি পড়িনি—অমনি দু চোখ একেবারে বুজে আসতে লেগেছে। কিন্তু এ তেমন নয়। এ যেন প্রাচীনের রহস্যময় আবরণ খুলে দেওয়ার একটা প্রচণ্ড ইচ্ছে। ওটা আফিম হলে এটা ট্যারান্টুলা ড্যান্সের নির্যাস।

কতক্ষণ সেই নেশার মধ্যে ডুবে ছিলাম জানি না। প্রাচীন গম্বুজ আর মোটা মোটা স্তম্ভের মধ্য থেকে অতীতের গন্ধ নিতে নিতেই অবচেতনে লীন হয়েছিলাম। চেতনা ফিরল আর একটা গন্ধে—ব্রুট, ফ্রেঞ্চ পারফিউম।

—'এবার কি আমরা এগোতে পারি?'

সম্রাট আমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর শরীর থেকে উঠে আসা উষ্ণতার আঁচ পাচ্ছি। হঠাৎ কেন জানি না কেঁপে উঠলাম। ও কী গরম! অসভ্য চোখ মুহূর্তে নিষেধের বেড়া টপকে ওর পুলওভারের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল। কী রোমশ বুক! আমাজন অরণ্য কি ওর বুকে এসে আশ্রয় নিয়েছে?

—'না...চলো।'

—'সে কী!' সজোরে হেসে উঠেছে সম্রাট—' ''আপনি'' নয়? সেই সম্মানটুকুও গেল দেখছি।'

সত্যিই তো! অভিজিতের সাথে আমার রীতিমতো মারপিটের সম্পর্ক।

ওকে 'তুই' বা 'তুমি' বলাটা কোনো ব্যাপার-ই নয়। কিন্তু সম্রাটের সাথে আমার কোনোদিনই তেমনভাবে আলাপ ছিল না। দূর থেকে কয়েকবার দেখেছি মাত্র।

—'Sorry...Slip of tongue'.

—'No Problem.' সম্রাট মুচকি হাসল—'হয়'।

ও একবারও বলল না যে—'তুমি আমাকে "তুমি"ই বলতে পারো।' অথচ কথাটা আমি আন্তরিকভাবেই শুনতে চেয়েছিলাম।

দুজন হেঁটে চললাম। পাশাপাশি। কাছাকাছি। অথচ কারো মুখেই কোনো কথা নেই। আমাকে এখানে নিয়ে আসার পিছনে সম্রাটের যে দুরভিসন্ধি কাল রাতে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম তার বিন্দুমাত্র প্রকাশও দেখা গেল না। সজ্ঞানে তো দূরের কথা, অন্যমনস্ক হয়েও আমায় ছোঁয়ার চেষ্টা সে করেনি। বরং ইচ্ছাকৃত এবং সচেতনভাবেই একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলছে।

ওর ব্যবহারে আমার খুশি হওয়ারই কথা। কিন্তু...।

প্রোফেসার বিদ্যুৎ মুখার্জির কথা

—'কিছু পেলেন বাবুজি?' গাইড ছেলেটি আমার দিকে অপলকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল।

এই প্রশ্নটা বারবারই আমায় একরাশ হতাশা দিয়ে যায়। আমি যে কতখানি ব্যর্থ তা বুঝতে পারি এই প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়ার সময়। 'না' শব্দটা ছোট্ট। কিন্তু নিষ্ঠুর।

—'উঁহু' সংক্ষেপে জানালাম।

—'গাইডরা কেউ কিছু বলতে পারল না?'

—'ত্রিশ বছর আগের কথা—কেউই ভালোভাবে মনে করতে পারল না।'

—'আর সেই ছেলেটি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম—'তাকে পেলে তো হয়েই গিয়েছিল। কিন্তু হয় সে এখানে নেই, গাইডের পেশা নেয়নি, নয়তো নিজের পরিচয় প্রকাশ করছে না। থানাও কিছু জানাতে পারল না। লোকটার মৃত্যুর খবর পেলেও নাহয় বোঝা যেত। কিন্তু...'

—'তবে আপনি কী করবেন?'

—'শেষ পর্যন্ত খালি হাতেই ফিরতে হবে মনে হচ্ছে।'

—'ফিরেই যান বাবুজি। ত্রিশ বছর আগেকার কথা কে মনে রাখে বলুন। তা ছাড়া সে লোক যদি বেঁচে থাকত তবে কি এতদিনে ফিরে যেত না?'

—'হয়তো ফেরার ইচ্ছে তাঁর নেই।'

—'যদি তাই হয় তবে তাকে এখানেই থাকতে দিন না সাব। ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কী করবেন!'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম, উপস্থিত এ কথা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। নিজেকে ব্যর্থ ঘোষণা করার চেয়ে সবটুকু দোষই ভাগ্যের ঘাড়ে তুলে দেওয়াই ভালো। চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু কপাল খারাপ।

—'ওঁরা কোথায় গেল?' গাইড হঠাৎ চলতে চলতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে। কারা কোথায় গেল তা দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আমার নেই। এমনিতেই মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। তার উপর হায়দরাবাদের ট্র্যাজেডিও মনটাকে বিষণ্ণ করে তুলেছে। এই যে মহান ইতিহাসের এক টুকরো এখানে এসে ভেঙে পড়েছে, তার জন্য ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে বরাদ্দ মাত্র কয়েক-লাইন! অথচ এর পুরুষকারকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। মহাকালের সঙ্গে যুদ্ধে সে পরাজিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু রেখে গেছে গৌরবময় অতীতের কাহিনি। বার্নিয়ে, তাভের্নিয়ের মতো পর্যটকও এর ঐশ্বর্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। একুশটি সরকার ও পাঁচশো পঞ্চান্নটি পরগনায় বিভক্ত এই রাজ্যের মোট আয় ছিল প্রায় এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ আশি হাজার টাকা। 'সিন্দবাদ দ্য সেইলর' ও 'দ্য ভ্যালি অফ ডায়মন্ডস'-এ সেই গৌরব-কথা আজও অম্লান। অথচ কতজন জানেন যে সম্রাট শাহজাহানের প্রিয় হীরে কোহ্-ই-নুর এই গোলকোন্ডার খনি থেকেই উত্তোলিত? কজন খবর রাখেন যে কুচিপুরী নামের বিখ্যাত নাচটির জন্ম এইখানেই?

—'স্যার...আমি একটু দেখে আসি ওরা কোথায় গেল'...।

চুপ করে থেকেই সম্মতি জানাই। তিস্তা নামের মেয়েটাকে আমার বিশেষ পছন্দ হয় না। মেয়েরা যদি কোনোমতে জেনে ফেলে যে সে সুন্দরী তবেই মুশকিল। ওর স্বামী অর্ক নেহাতই ভালোমানুষ। অভিজিৎটা বেড়ে পাকা। কাজ করার চেয়ে কথা বলে বেশি।

ওই চারজনের মধ্যে যদি কেউ একটু কাণ্ডজ্ঞানবিশিষ্ট হয়ে থাকে তবে সে সম্রাট। ছেলেটা গভীরমনস্ক। একটু খামখেয়ালি ঠিকই কিন্তু চেহারাটি চমৎকার। এককথায় বলতে গেলে ভীষণ যৌন আবেদনময়। প্রথম দর্শনেই ওর পুরু ভিজে ঠোঁটজোড়া চুম্বকের মতো চোখে আটকে গেল। এমন ঠোঁটে চুমু খেতে না জানি কেমন লাগবে! ভীষণ ইচ্ছে করে ওকে ভালো করে দেখি। ঠিক যেমন করে মা তার সন্তানকে দেখে, স্ত্রী স্বামীকে দেখে কিংবা প্রেমিকা তার প্রেমিককে। নগ্ন, নিঃসঙ্গ, অসহায়। মনে হয় সম্রাটকে এই সমাজ থেকে

ছিঁড়ে নিয়ে চলে যাই অন্য কোথাও। অন্য কোনো অপরিচিত দেশে। যেখানে ও শুধু আমার—শুধুই আমার।

—'বাবু দুটি ভিক্ষে পাই...।'

চমকে তাকালাম। দড়ির মতো রুক্ষ চেহারা। একরাশ দাড়ির মধ্যে জীর্ণ মুখের অস্পষ্ট আভাস। আরে! সেই লোকটা না! গতকাল গোলকোন্ডা ফোর্টের সামনে একে দেখেই তো গাইডটা ভয় পেয়েছিল। কাল সন্ধের আবছা আলোয় ঠিকমতো দেখতে পাইনি। আজ সকালের আলোয় দেখে লোকটাকে ভয়ঙ্কর কিছু বলে মনে হল না। বরং বহুদিনের পুরোনো লালজামা আর ছেঁড়া নীল পাজামায় বেশ হাস্যোদ্রেক-ই করে।

—'তিনদিন না খেয়ে আছি বাবু...।'

একটু মজা করার শখ হল। বললাম—'কালকেও তো একই কথা বলছিলে। আজ তো চারদিন হওয়ার কথা। তিনদিন হল কী করে?'

লোকটা কালো কালো দাঁত বের করে হাসছে। হঠাৎ মনে হল হাসিটা খুব চেনা। আগে কোথাও দেখেছি।

—'বলতে হয়। আপনারা ছেলেমানুষ...বুঝবেন না।'

আবার চমক! কী! আমি ছেলেমানুষ! বয়স প্রায় আটচল্লিশ হতে চলল। চোখে নেহাত ছানি না পড়লে কেউ একথা বলবে না। তবে কি এটা লজ্জ! একি সেই পরিচিত লজ্জ!

লোকটা আমার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে আছে। এ দৃষ্টিও কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকছে। ও চোখ তো কোনো ভিখিরির নয়! প্রজ্ঞা আর ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণ এ-চোখ কোনো পেটসর্বস্ব উদ্বাস্তুর হতে পারে না। এ চোখও আমি চিনি। কিন্তু তা-ও কি সম্ভব! নয়ই বা কেন?

টের পেলাম বুকের ভিতর ভয় জমাট বাঁধছে।

বুকপকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার কয়েন তুলে নিয়ে দিতে গেলাম। আশ্চর্য! লোকটা কেমন লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—টাকার দিকে নয়। আমার হাতের দিকে! নিষ্পলকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজছে।

—'থাক...লাগবে না।'

সে পিছন ফিরে হনহন করে হাঁটা মারল।

আরে! কী হল!

মনের মধ্যে পুষে রাখা সন্দেহটা বোকার মতো লাফ মেরে মুখে চলে

এল।

—'প্রোফেসর রুদ্র!'

লোকটা বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তার মুখমণ্ডলে সেই প্রশান্ত ভাব আর নেই। চোখদুটো কেমন হিংস্র।

—'চোপরও বুড়বক!' সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—'কে প্রোফেসর রুদ্র! আমি এই রাজ্যের সুলতান—সুলতান কুলি কুতুব শাহ্!'

এ লোক প্রোফেসর কৌশিক রুদ্র না হয়েই যায় না!

সে দিনটার কথা আজও মনে পড়ে।

বাইরে তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝেমধ্যে আকাশে চমকে চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। জোলো হাওয়া থেকে থেকে শরীর স্পর্শ করে যাচ্ছে। গোটা ক্লাস মন্ত্রমুগ্ধ। নিশ্চুপ হলঘরে একটা গম্ভীর স্বর অবিরত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অসামান্য জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব আর মোলায়েম কণ্ঠস্বরের ম্যাজিকে প্রত্যেকটা মিনিট যেন থমকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। আমরা বেঞ্চে বসে আছি। স্থির, নিষ্কম্প, অভিভূত।

প্রোফেসর রুদ্র সেদিন পলাশীর যুদ্ধ পড়াচ্ছিলেন। তীব্র চোখদুটো গভীর আত্মমগ্নতায় ডুবে আছে। মৃদু স্বরে সিরাজদ্দৌল্লার ট্র্যাজেডি বর্ণনা করে চলেছেন। তার মুখমণ্ডল কখনো হয়ে উঠছে বেদনার্ত, কখনো বা বীররসাত্মক।

ক্লাস শেষের ঘণ্টা পড়ল। তিনি নীরবে উঠে গেলেন।

তখন প্রোফেসর্স রুমে অন্য স্যারেরা কেউ ছিলেন না। ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিতে গান্ধীজি নিয়ে একটু সমস্যায় পড়েছিলাম। সে ব্যাপারেই কৌশিক-বাবুর সাথে কথা বলার দরকার ছিল। অন্য প্রোফেসরদের তুলনায় তাঁর দরজাই আমাদের জন্য বেশি খোলা থাকত। ভদ্রলোক ডিভোর্সি ছিলেন। তার তিনকুলে আর কেউ ছিল না। তাই ছাত্র-ছাত্রী নিয়েই দিনরাত ডুবে থাকতে ভালোবাসতেন। আমাদের সময় প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ার প্রচলনও ছিল না। তাই অসুবিধেয় পড়লে কৌশিকবাবুই ভরসা।

প্রোফেসর্স রুমে ঢুকে দেখি স্যার আমার দিকে পিছন ফিরে জানলা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি জানলার গরাদ ছাড়িয়ে পিছনের মস্ত বড়ো খেলার মাঠটার দিকে প্রসারিত। নিষ্পলক, বিস্মিত।

—'স্যার...গান্ধীজিটা একটু...।'

—'শ্ শ্ শ্...।' তিনি ঠোঁটে আঙুল রেখে চাপা গলায় বললেন—

'চুপ...ওই দেখো...ওই দেখো...।'

আমি জানলার গরাদে নাক ঠেকিয়ে মাঠের দিকে দেখলাম। কোথায় কী? গোটা কয়েক শালিখ তিড়িং তিড়িং করে এক্কা দোক্কা খেলছে। এ ছাড়া সবই ভোঁ ভাঁ।

—'শালিখ স্যার।'

—'না...ওই দেখো...দেখতে পাচ্ছ না? ...ওই যে হাতির উপর!'

—হাতি! কোথায়?

—'হাতির উপর কী স্যার?'

—'মীরমদন, ওই যে কামান নিয়ে লর্ড ক্লাইভ। ওই মীরজাফর! যুদ্ধ শুরু হওয়ার পথে। দেখো...দেখতে পাচ্ছ না?'

আমি হাঁ করে স্যারের দিকে তাকিয়ে আছি। কী বলছেন উনি? এই ভরদুপুরে কলেজের মাঠে পলাশীর প্রান্তরই বা এল কোথা থেকে?

—'কী হল? দেখতে পাচ্ছ না?' কৌশিকবাবু উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকালেন আমার দিকে, আমি স্থাণুর মতো সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি।

ভদ্রলোক ক্লান্ত, বিধ্বস্তের মতো আস্তে আস্তে সেখানেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন। জোরে জোরে শ্বাস টানছেন। আস্তে আস্তে তার নাক মুখ লাল হয়ে উঠল।

এক মুহূর্ত নৈঃশব্দ। পরক্ষণেই দুহাতে মুখ চেপে অত বড়ো মানুষটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তার দীর্ঘদেহ যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছে।

আজও সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসে।

এই ঘটনার মাসদুয়েক বাদে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস নিয়ে রিসার্চ করতে গেলেন তিনি। বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের উপর কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। সেগুলোর সত্যতা যাচাই করতে একদিন ফলকনামা এক্সপ্রেসে চড়ে বসলেন। আমরা সজল চোখে তাকে অনুরোধ করলাম—

—'তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন স্যার। মনে রাখবেন আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন।' তিনি সস্নেহ হেসেছেন—'আসব...আবার দেখা হবে।'

স্যার মনে রাখেননি। কিন্তু কথা রেখেছেন। প্রায় ত্রিশ বছর পর আজ তার সাথে আবার আমার দেখা হয়েছে। বোধহয় দেখা না হলেই ভালো হত। কোথায় সেই ঝকঝকে স্মার্ট অধ্যাপক! আর কোথায় এই উন্মাদ ভিখারি!

—'আমি বারণ করেছিলাম স্যার।'

হোটেলের ঘরে বসে বিষণ্ণ স্বরে বলছিল গাইডটি। তার চোখদুটোয় অকৃত্রিম বিষাদ!

—'বার বার বলেছিলাম যে এটা ঠিক হচ্ছে না। ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি, ওই দুর্গে হাজার হাজার মানুষ মরেছে। ওই অভিশপ্ত দুর্গে থেকে কাজ নেই। কিন্তু উনি শুনলেন না।'

—'তারপর?'

—'উনি বললেন ওঁর রিসার্চের জন্য ওখানে থাকা দরকার। বাধ্য হয়ে সব ব্যবস্থা করলাম। তবে ওঁকে একা ছাড়িনি। সঙ্গে আমিও ছিলাম।

'প্রথম দুটো দিন ভালোই কাটল। প্রোফেসর এমনিতে ভালোমানুষ ছিলেন। আমি তখন একেবারেই বাচ্চা ছেলে। বাবা গাইড ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে সংসারের হাল ধরার জন্য এই লাইনে আসতে হল। হিস্ট্রির 'হ'-ও জানতাম না। তাই ভুলত্রুটি হামেশাই হত। প্রোফেসর কিন্তু মোটেই রাগ করতেন না। বরং খুব আদর করে সেগুলো শুধরে দিতেন। টানা দুটি মাস আমি তার সাথে ছিলাম। আর ওই দুই মাসেই বাংলা ভাষাটা আমি রপ্ত করে ফেলেছিলাম। তার সাথে সাথেই জানতে পেরেছিলাম প্রচুর তথ্য যা এখানকার আর কোনো গাইড জানতে পারেনি।'

সম্রাট বিছানার উপর বসে বুকের উপর হাতদুটো জড়ো করে একমনে কথাগুলো গিলছিল। গাইডের মন্থর ভঙ্গিতে সে অনেকক্ষণ ধরেই অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

—'কিন্তু এই দশা হল কী করে?'

—'বলছি স্যার।' সে বলল—'আস্তে আস্তে প্রোফেসর কেমন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। ওঁর গবেষণার বিষয়টা ছিল ইন্টারেস্টিং। ১৬৮৭ তে যখন ঔরঙ্গজেব গোলকোন্ডা আক্রমণ করেছিলেন তখন তিনি শুনেছিলেন যে দুর্গের দেওয়ালে যত হীরে, জহরত গাঁথা আছে এত রত্ন মোগল বাদশার ভাণ্ডারেও নেই। গোলকোন্ডার দেওয়াল রত্নখচিত একথা যেমন সত্যি, তেমনি একথাও সত্যি যে দুর্গ জয় করার পর ঔরঙ্গজেব সেখানে একটি রত্নও পাননি। রত্নগুলো যে কীভাবে দেওয়াল থেকে হাপিশ হয়ে গেল তা কেউ জানে না। প্রোফেসর সেই রহস্যটাই সল্‌ভ করতে চেয়েছিলেন।'

—সে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে—প্রোফেসর রাতদিন একটা আতশ-কাচ নিয়ে দুর্গের দেওয়ালের কী যেন খুঁজে বেড়াতেন। রাত্রে টর্চ নিয়ে সারা

দুর্গ চষে বেড়ানোই তাঁর কাজ ছিল। এমনও হয়েছে, গভীর রাতে ঘুম ভেঙে দেখেছি তিনি খাটে নেই। ঘাবড়ে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতেই তাকে পাওয়া যেত দুর্গের ছাতে। কত রাতে দেখেছি ছাতের উপর অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন তিনি।

এমনভাবে চলতে চলতেই হঠাৎ একদিন সকালে বললেন—"শিবা, এ জায়গাটা এত চেনাচেনা মনে হচ্ছে কেন বল দেখি। আগে কখনো এসেছি বলে তো মনে হয় না।"

'সেই তাঁর শেষ স্বাভাবিক কথা ছিল স্যার। সেদিন বিকেলে আমার এক ভাই এসে খবর দিল মায়ের শরীর খুব খারাপ। বাড়ি যেতে হবে। আমি একটু ইতস্তত করছিলাম। কিন্তু প্রোফেসরও বোধহয় একটু একা থাকতে চাইছিলেন। উনি আমায় সাতদিনের ছুটি দিলেন।

'সাতদিন পর যখন আবার ফিরে এলাম তখন যা সর্বনাশ হওয়ার হয়ে গেছে। যে ওই দুর্গ ওঁকে খেয়ে নিয়েছে।

'কাছে গিয়ে ডাকলাম—'স্যার, আমি এসেছি।'

'উনি খাটিয়ার উপর মুখ নীচু করে বসেছিলেন। মুখ তুলে তাকালেন। কিন্তু চিনতে পারলেন বলে মনে হল না। আস্তে আস্তে বললেন—"কে?"

—'আমি স্যার...আমি শিবা।'

—'কে?'

'ওঁর চোখদুটো টকটকে লাল। কেমন যেন পাগলের মতো। ভয় পেয়ে বললাম—

—'আমি আপনার গাইড স্যার।'

—'কে স্যার?' উনি ছিটকে উঠে দাঁড়িয়েছেন—'আমি মঙ্গলবরমের শাহেনশাহ্—আমিই সুলতান কুলি...চিনতে পারছিস না বেওকুফ!'

মঙ্গলবরম গোলকোন্ডার আগেকার নাম।

সে নীরব হল। একটু দম নিয়ে আবার বলল—'আমরা সবাই মিলে ওঁকে জোর করে হোটেলে ধরে নিয়ে এলাম। ভাবতে পারবেন না তখন তাঁর গায়ে কী অমানুষিক জোর! দশজন মিলেও সামলাতে পারছি না। বারবার ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আর চিৎকার করে বলছেন— "জামশেদ!.. তোকে আমি দেখে নেব। তুই কী ভেবেছিস? আমার হাত থেকে তুই বাঁচবি! যেখানেই থাকিস, তোর রক্ষা নেই। বেহেস্ত হোক আর জাহান্নম-ই হোক

তোকে আমি খুঁজে বের করবই...জামশেদ!"

'বলতে বলতেই একসময় অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আমরা তার বেহুঁশ শরীরটা ম্যানেজারের জিম্মায় রেখে ডক্টর ডাকতে গেলাম।'

শিবাকুমারণের দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এসেছে—'কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। চোখের সামনে অমন একটা ভরপুর জোয়ান লোক শুকিয়ে শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেল। ত্রিশ বছর হয়ে গেল। আজও তিনি জামশেদকে খুঁজে চলেছেন। তাঁর জন্যই, তাঁর সাথে ছিলাম বলেই আজ আমি এখানকার সেরা গাইড হতে পেরেছি, অথচ আমিও তাঁর জন্য কিছু করতে পারলাম না...।'

আমরা তিনজনেই নিঃস্তব্ধ। একটা প্রতিভা কী করে অকালেই নষ্ট হয়ে যায় তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছিলাম। কৌশিক রুদ্র আজ সুস্থ, স্বাভাবিক থাকলে কোথায় পৌঁছতে পারতেন। কিন্তু কোথায় পৌঁছেছেন!

—'আমি সেইজন্যই ওঁকে ভয় পাই।' শিবাকুমারণকে চোখ মুছল...'যদি কখনো কোনোদিন উনি জামশেদকে কারো মধ্যে খুঁজে পান তবে আর একটা নির্দোষ প্রাণ যাবে স্যার। ট্যুরিস্ট এলেই উনি তাদের মধ্যে খোঁজ করে বেড়ান। আপনারা ওঁর দেখা না পেলেই ভালো হত। আমি এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। সেইজন্যই নিজের পরিচয়টাও দিইনি।'

—'কিন্তু এ তো পাগলামি! তা ছাড়া জামশেদটাই বা কে? সে কী এমন অপরাধ...!'

সম্রাটকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল শিবাকুমারণ—'জামশেদ প্রোফেসারের কেউ না। তিনি সুলতান কুলির বড়ো ছেলে। ৯৯ বছর বয়সি সুলতান কুলিকে নামাজ-রত অবস্থায় পিছন থেকে তলোয়ারের আঘাতে তিনিই খুন করেন।'

—'মাই গুডনেস!'

সম্রাটের মেঘমন্দ্রস্বরে আতঙ্কের ছোঁয়া—'তবে তো লোকটা মরবেই... মারবেও!'

সম্রাটের কথাকে সমর্থন করেই যেন আকাশে কয়েকশো মাদল গুমগুম করে বেজে উঠল। একঝলক ঠান্ডা হাওয়া শোঁ শোঁ শব্দ করতে করতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে হুটোপাটি লাগিয়ে দিয়েছে। একঝলক রুপোলি তার দিগবিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এক অস্ফুট ইঙ্গিত নিয়ে—ঝড় আসছে!

—'আমি আজ উঠি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে শিবাকুমারণ উঠে দাঁড়াল—'মনে রাখবেন স্যার কাল ডট এগারোটায় সলার জঙ্গ মিউজিয়াম। দশটার মধ্যে রেডি হয়ে গেলে ভালো হয়। বাদবাকিদেরও একটু বলে দেবেন।'

ওকে আশ্বস্ত করলাম যে খাওয়ার টেবিলেই ওর মেসেজ আমি সবাইকে দিয়ে দেব। তার সাথে এ-ও বলে দিলাম যে আজ এখানে বসে যা যা কথা হল তা আর কাউকে বলার প্রয়োজন নেই। কথাটা আপাতত এই তিনজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকাই ভালো।

—'ওকে স্যার।' ছোট্ট একটা বাও করে বেরিয়ে গেল শিবাকুমারণ।

আমি নরম বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলাম। কুতুবশাহী টুমস দেখে যে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তা নয়। শারীরিক ক্লান্তির চেয়ে মানসিক শ্রান্তিই বেশি।

—'অতঃপর মুখার্জি সাহেব?' সম্রাট আমার বিছানায় এসে বসেছে—'অতঃকিম!"

—'বুঝতে পারছি না।'

—'প্রোফেসর রুদ্রকে কি নিয়ে যাবেন?'

—'জানি না সম্রাট।' চোখ বুঁজলাম—'যে অবস্থায় আছেন তাতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কি না সে ব্যাপারেই সন্দেহ আছে। অথচ ফেলে যেতেও মন চাইছে না।

—'তবে?'

—'শেষমেশ ছেড়েই যেতে হবে বোধহয়। তোমার কী মনে হয়?'

—'আমিও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। আমাদের কিছুই করার নেই।

সত্যিই কি কিছুই করার নেই। ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পারছিলাম না। প্রোফেসর রুদ্রর মতন একজন প্রতিভাবান মানুষ এভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অথচ আমার কিছুই করার নেই। হাত গুটিয়ে বসে শুধু দেখতেই থাকব!

বাইরে প্রচণ্ড শব্দে এসে আছড়ে পড়েছে ঝড়। কাচের জানলায় বাতাসের আঁচড়।

—'কী হল?' ওর সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর কানে এল—'মন খারাপ হয়ে গেল!'

—'নাঃ।' আমি চোখ বুজেই বলি—'শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।'

—'হুঁ...।'

টের পেলাম আমার কপালে দুটো আঙুল নড়াচাড়া করছে। মাথার চুলে বিলি কাটছে। সামান্য একটু উষ্ণ স্পর্শেই দেহের প্রতিটা রক্তকণিকা যেন উদ্দাম, উত্তাল হয়ে উঠল। উষ্ণ নিঃশ্বাস বুকের ভিতরে এসে ঝাপটা মারছে। প্রাণপণে প্রোফেসর রুদ্রর কথা ভাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি যে পলকে মস্তিষ্কের পাক বেয়ে বেয়ে কোথায় গেলেন তা খুঁজে পাওয়া গেল না।

অদ্ভুত মোহে শরীর ঢলে আসছিল। কোনোমতে ছুটন্ত ইচ্ছের মুখে লাগাম দিয়েছি...। না...এ অন্যায়, এ পাপ, অনুচিত। জানতে পারলে সবাই আমায় ব্রাত্য করে দেবে। থুতু ছেটাবে। আঙুল তুলে বলবে—'ওই দেখো...ওই লোকটা সমকামী...কী ঘেন্না....কী ঘেন্না...।'

পুরুষের তীক্ষ্ণতা শিথিল হয়ে এল।

—'মুখার্জি সাহেব?'

—'উঁ?' কথা বলতে সাহস হল না। গলা কেঁপে যাচ্ছে।

—'এখন একটু আরাম লাগছে?'

—'হুঁ।'

সে আমার কপালে হাত রেখে বলল—'মন খারাপ করে কী করবেন? এ তো আপনার হাতে নেই।'

সজোরে হেসে উঠলাম।

—'হাসছেন কেন?' সম্রাটও হাসল—'এমন কী মজার কথা বললাম?'

—'তুমি একেবারে আমার বাবার মতো কথা বলছ। ছোটোবেলায় আমার মনখারাপ হলে বাবাও এমন করেই...।'

—'ও কথা থাক।' সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে। ওর মুখা কেমন যেন বদলে গেল। শক্ত চোয়ালে বলল—'আপনার শরীর আশা করি এখন অনেকটাই সুস্থ।'

যাব্বাবা! কী হল?

আমি পাশ বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসি। সম্রাট আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। জেদি বাচ্চা ছেলের মতো সে মাটির দিকে তাকিয়ে। চোখের তলার পেশি কেঁপে কেঁপে উঠছে। যেন অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে উঠে আসা একটা তুমুল ভূমিকম্পকে ভিতরেই দমন করার চেষ্টা করে চলেছে।

—'কী হল সম্রাট?'

—'কিছু না।' সে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে মদের বোতল থেকে গ্লাসে

তরল ঢালছে। অর্থাৎ এখন থেকেই শুরু হল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম সন্ধে সাড়ে সাতটা বাজে। দশটায় ডিনার। কাল খাওয়ার টেবিলে যাওয়ার আগেই উলটে পড়েছিল। দুটো বয় কোনোমতে পাঁজাকোলা করে তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গেছে। আজও মনে হচ্ছে ছেলেটার 'রাতের খাওয়া জুটবে না!

—'এটা কী হচ্ছে সম্রাট! এখন থেকেই...!'

— 'That's none of your business...!' সে হিংস্রভাবে ঝাঁঝিয়ে উঠল— 'আমার guardian হওয়ার চেষ্টা করবেন না। Oil your onw machine!' বোতলের ছিপি খুলে গেল, সে বেশ খানিকটা তেজি তরল গলায় ঢেলে দিয়েছে—'আঃ'।

হিসাব মেলাতে পারছিলাম না। একটু আগেই যে ছেলেটা শান্তভাবে কথা বলছিল সে হঠাৎই এমন রুদ্রমূর্তি ধরল কেন? ব্যথা পেয়েছে কি? কোথায় পেল?

আমি আর কিছু বলার সাহস পেলাম না। প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরেই কিছু না কিছু যন্ত্রণা থাকে। সম্রাটের আছে। প্রোফেসর রুদ্র-ও বোধহয় ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের মতোই আপাত নিস্তরঙ্গ নিঃসঙ্গ মানুষটির হৃদয়ের তল পাওয়া একরকম অসম্ভব কাজ। তাঁর একান্ত প্রিয় বন্ধুরাও সে খবর পাননি। আমরা তো কোন্ ছাড়। তাই তার বেদনা, যন্ত্রণার কথা শিকেয় তোলাই থাক।

আমি যার কথা সবচেয়ে ভালো বলতে পারি সে স্বয়ং আমি। ইতিহাস নিয়ে এম এ করেছি। নামের আগে একটা ডক্টরেট ঝোলাতেও ভুলিনি। তার উপর আবার কলেজের প্রোফেসর। লোকের সম্ভ্রম আমার পায়ে এসে পড়ে। আর পড়ে বলেই বোধহয় সম্ভ্রমহানির ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি। এর চেয়ে যদি ম্যাদামার্কা হরিপদ কেরানি হতাম তা হলেই বোধহয় ভালো হত। যার হারানোর কিছু নেই সে-ই বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী লোক।

আশ্চর্য নয়! আমি যে হেটেরোসেক্সুয়াল নই শুধু সেজন্যই আমার প্রতিষ্ঠা, আমার তাবৎ ইন্টেলেক্ট, নলেজ সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে যেতে পারে! মানুষের পরিচয় কি শুধুই তার স্বাভাবিক যৌনজীবন! তবে এত কষ্ট করে পড়াশোনা করেছি কেন? কামসূত্র পড়ে কাটালেই পারতাম। সমাজ ঠিক করে দিয়েছে বলে একটা মেয়েকেই ভালোবাসতে হবে। সমাজ কে? তার ঠিক করে দেওয়ার কী অধিকার? যদি মেয়েদের প্রতি আমার কোনো যৌন আকর্ষণ না

থাকে তা সত্ত্বেও জোর করে তার সাথেই সঙ্গম করতে হবে! এ কেমন নিয়ম! যদি লবঙ্গলতিকা, লাস্যময়ী নারী শরীরকে ভেড়ার ঠান্ডা মাংস বলে মনে হয়, যদি পুরুষের চওড়া গরম বুক আমার বেশি ভালো লাগে তবেই আমি বিকৃতকাম হয়ে গেলাম! কেন?...কেন?...

বুকের ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে! মাথার পাশের শিরাদুটো দপদপিয়ে উঠেছে। এক রাতের জন্য যদি বিদ্রোহী হয়ে যাই তবে কেমন হয়? ওই যে আগুনের মতো এক পরিপূর্ণ পুরুষ আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ছে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লে কেমন হয়? বাধা দেওয়া ক্ষমতা ওর নেই! শার্টটাও গা থেকে খুলে পড়ছে। চোখের সামনে প্রায় উন্মুক্ত বুক, গভীর নাভি, লম্বা গলা, চওড়া কাঁধ—চড়াই উৎরাই..।

কেমন হয় যদি ওকে নগ্ন করি? কেমন হয় যদি ওর ঘুমন্ত পুরুষাঙ্গকে মুখগহ্বরে, গোপনবিবরে আমন্ত্রণ জানাই? বুকের ছোট্ট কুঁড়িটাকে জিভ দিয়ে একটু চেটে নিই! অথবা দুর্বার আশ্লেষে পেষণ করি ওকে বড়ো গভীর নাভি সম্রাটের : এ নাভিতে মুখ রেখে নিঃসীম অন্ধকারে ডুবে যেতে ইচ্ছে করে। লোভ হয়—বড়ো লোভ হয়...!

সারা শরীরে আগুন জ্বলে উঠেছে। নিজের মুখটা একবার আয়নায় দেখার ইচ্ছে হল। লোভী হায়নার মতো দেখাচ্ছে কি? আকণ্ঠ তৃষ্ণায় বুক জ্বলছে, সামনেই পরিপূর্ণ সরোবর। এত সহজে ছেড়ে দেব? কে আমায় ঠেকাবে! সমাজ! সমাজের নিকুচি করেছে! তার কাছে আমার কি কিছুই পাওনা নেই! শুধুই দিয়ে যাব! চাইতে পারব না!...না...আমিও চাই...চাই... চাই...।

সম্রাটের ঠোঁটের উপর ঠোঁট রাখলাম। ভিজে ভিজে। একটু ফাঁক করা, কবোষ্ণ।

প্রচণ্ড শব্দে কাছেপিঠে কোথাও বাজ পড়ল। জানলার কাচগুলো থরথর কাঁপছে। কে যেন আমায় একটা প্রচণ্ড চড় মারল! এ কী করছি!...একী করছি! ...না, এ অন্যায়...এ অন্যায়...এ পাপ, এ বিকৃতি,...ওঃ ঈশ্বর!

সেদিন সমস্ত রাত আমি এই মন্ত্রটাই জপ করে গেলাম। নিস্তব্ধ রাত্রির প্রেক্ষাপটে মাঝেমধ্যেই পাশের ঘর থেকে ভেসে এল দাসবাবুর কণ্ঠস্বর। ভদ্রলোক ঘুমের মধ্যেই বলে চলেছেন—'টুনি, জল খাও...।'

—'গুড মর্নিং।'

সারা রাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সম্রাটের অনাবৃত দেহ সৌষ্ঠব কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে। এমন অমোঘ আকর্ষণ অনেকদিন অনুভব করিনি। এমন কাতরভাবে ইচ্ছের গলা টিপেও ধরিনি। একদিকে আমার উদ্দাম বাসনা আর একদিকে সম্মান, সম্ভ্রম। নিক্তিতে কোন্‌টার গুরুত্ব বেশি তা মেপে দেখতে দেখতেই আমার সারাজীবন চলে গেল। আজও এমন কোনো সমাধানে পৌঁছতে পারলাম না যেটা আমার হৃদয় সমর্থন করে।

ব্যর্থতার তিক্ততা প্রায় গলা অবধি এসে পৌঁছেছিল। সকালের ম্যাটম্যাটে হলুদ আলোও মনখারাপ ধুইয়ে দিতে পারেনি। সারারাত বৃষ্টি হওয়ার পর পৃথিবী এখনো কাঁচা হয়ে আছে। মাটির সোঁদা গন্ধ, আর্দ্র হাওয়ার স্পর্শ, মন খারাপ করাটা আরো বাড়িয়ে দেয়। যেন সদ্যোজাত ধরিত্রীর বুকে এসে দাঁড়িয়েছি আমি—তার একমাত্র সন্তান। নিঃসঙ্গ—আদিম বংশধর। বিপদে পড়লে কেউ পাশে নেই। খিদে পেলে কেউ খাবার এগিয়ে দেবে না। স্বজনবান্ধবহীন অপরিচিত জায়গায় আমি একা।

ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। শীকরবিন্দুজালে আচ্ছন্ন গাছের পাতা থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে টুপটাপ। এ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

ঘরের দরজাটা আচমকা খুলে গেল। হোটেলের ম্যানেজার সোমভদ্র চক্রবর্তী মাপা হেসে বললেন—'গুড মর্নিং...স্যার।'

—'মর্নিং'। কম্বলের তলা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললাম—'ব্রেকফাস্ট রেডি?'

—'অনেকক্ষণ রেডি স্যার। নীচে আপনার জন্য সবাই ওয়েট করছেন।'

—'আসছি।' বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি। অর্ক নির্ঘাৎ নীচে ডাইনিং রুমে বসে আমার মুণ্ডুপাত করছে। এতক্ষণ লক্ষ করিনি। এবার সচেতন হয়ে দেখলাম পাশের বিছানাটা ফাঁকা। সম্রাট নেই। অর্থাৎ সে-ও গেছে। বাকি আছি আমিই।

যত দ্রুত সম্ভব দাঁত মাজা, মুখ ধোওয়া শেষ করে পাঞ্জাবিটা কোনোমতে গায়ে গলাতে গলাতে নীচের দিকে রওনা হলাম। এখানকার নিয়ম হল ব্রেকফাস্ট করতে হলে সাড়ে আটটাতেই ডাইনিং হলে হাজিরা দিতে হবে। সেটা মিস করলে পেটে কিল মেরে বসে থাকাই ভবিতব্য। আড়চোখে তাকিয়ে

দেখলাম ডাইনিং হলের ঘড়িতে ন'টা বাজছে।

—'আসুন...আসুন...।' অর্ক ওর পাশের চেয়ারটা এগিয়ে দিয়েছে—'কী ঘুম ঘুমোচ্ছিলেন মশাই। আমরা ডেকে ডেকেই হয়রান।'

—আমি লজ্জিত মুখে বলি—'Sorry'।

—'আপনি তো sorry বলেই খালাস।' অভিজিৎ শুরু থেকেই আমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট নয়। তার উপর আবার একটা খোঁচা মারার সুযোগ পেয়েছে—'এদিকে আমাদের পেটে যে অগস্ত্য খাই খাই করছেন। খিদেয় মরে যাওয়ার উপক্রম। সে কথাটা একটু বিবেচনা করুন।'

তিস্তা মুখে কিছু বলল না। কিন্তু তার হাবেভাবে বোঝা গেল সে-ও যথেষ্টই বিরক্ত। সম্রাট খবরের কাগজে নাক ঠেকিয়ে বসেছিল। এতক্ষণে চোখ তুলে তাকিয়েছে। স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর গলায় বলল—'ওঁর আধঘণ্টা লেট হয়েছে, এই আধঘণ্টায় কি তুই মরে গেছিস?'

—'Please...please...।' অর্ক দুহাত তুলে দু' পক্ষকেই থামিয়েছে—'বেড়াতে এসে এসব বকাবকি ভালো লাগে না। এসব থামা।'

সম্রাট রাগত চোখে তার দিকে তাকায়—'প্রোফেসর বোধহয় কাল অনেক রাত অবধি ঘুমোননি। নতুন জায়গায় এসে অনেকেরই এই সমস্যা হয়। সে খবর রাখিস কি? অভিজিৎ তোর সামনে ওঁর মতন একজন বয়োজ্যেষ্ঠকে অপমান করল। তুই ওকে সে ব্যাপারে সতর্ক না করে ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিচ্ছিস। এটা তোর কাছে expect করিনি অর্ক।'

—'শান্তি...শান্তি...।' অর্ক ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতেই পারলেই বাঁচে—'অভিজিৎ অন্যায় করেছে ঠিকই। আমি ওর তরফ থেকে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

—'ঠিক আছে।'

আমি ব্যাপারটাকে আর বাড়ালাম না। বয় হাতে ধূমায়িত প্লেট নিয়ে এদিকেই আসছে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে খাওয়াটাই মাটি হবে।

অন্ধ্রপ্রদেশ আসা পর্যন্ত একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ করছি। এরা খাওয়ার ব্যাপারে বড়ো বেশি বেশি পছন্দ করে। কাল সকালের ব্রেকফাস্টে ওমলেট ছিল। অনেকক্ষণ দেখেও সেটা ওমলেট না কার্পেট তা বোঝা যায়নি। বিকেলে ধোসা খেলাম। তার সাইজও দেখার মতো! এক প্রান্ত থেকে খেতে শুরু করলে কতক্ষণে ও প্রান্তে পৌঁছানো যাবে তা বলা যায় না। আজ এল

পুরি। সাইজ দেখে মনে হচ্ছিল একখানা ব্যাগে ভরে নিয়ে যাই। তাতে ট্রেনে বালিশের সমস্যা অন্তত মিটবে।

—'চমৎকার!' সম্রাট ধীর স্বরে নিজের স্টাইলেই বলল।

—'মনে হচ্ছে আজও কুকুরের ভুঁড়িভোজ হবে!'

অর্ক অর্থপূর্ণভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। এতদিন ধরে তাই-ই তো হচ্ছে। হোটেল থেকে যে খাবার দেওয়া হয় তার অর্ধেকও আমরা শেষ করতে পারি না। সম্রাট ভোজনরসিক। সে তারিয়ে তারিয়ে খেতে পছন্দ করে ঠিকই কিন্তু খায় খুব অল্প। আমিও বেশি খাওয়া পছন্দ করি না। চিবোনোর ভয়ে খাবার দেখলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। অর্ক, দাসবাবুরা মাঝারি পরিমাণ। বরঞ্চ অভিজিৎ-ই এক্সট্রিম। এই একটা ব্যাপারে সে আমাদের সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। কিন্তু একা কুম্ভ আর কত খাবে! অগত্যা বাদবাকিটা কুকুরের 'পেটায় নমঃ'।

—'টুনি, জল খেয়েছ?' খাওয়া শুরু করার আগেই দাসবাবুর সাবধান-বাণী—'ঝোলটা কম খাও...পুরি একটার বেশি খাবে না।'

বন্দনা ভুরু কুঁচকে তাকাতেই তিনি চুপ করে গেলেন। অসহায়ভাবে তিস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তার গৃহিণীর অধর স্ফুরিত হয়ে উঠল। শিগগিরিই বোধহয় মানঅভিমান পর্ব শুরু হবে।

ওই ভদ্রমহিলাও আশ্চর্য! কিছুতেই যেন শান্তি নেই। দিনরাত্রি এক গা গয়না পরে বসে থাকেন। দেখলে মনে হয় জমিদারগৃহিণী। ফর্সা গোলগাল চেহারায় অপ্রয়োজনীয় মেদ এসে জুড়ে বসেছে। ভাঁটার মতো চোখ দুটো সবসময় অপরের ত্রুটি অন্বেষণে ব্যস্ত। তিস্তার প্রতি কী কারণে যেন ভয়ানক বিদ্বিষ্ট। তবে বেড়াতে আসার পর থেকেই নিজের স্বামীটিকে চোখে চোখে রাখছেন। বলা যায় না, কন্দর্পপুরুষ স্বামীটি যদি কোনো সুন্দরীর খপ্পরে পড়েন! সাবধানের মার নেই!

তিস্তার দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি পুরি তরকারিতে মন দিলেন। মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল—'ইশ্...এটা একটা তরকারি!'

তার কথায় একমাত্র অর্ক ছাড়া আর কেউ কর্ণপাত করল না।

—'কেন? ভালো হয়নি?'

—'এটা একটা তরকারি হয়েছে? নুন নেই, তেল নেই...।' এতদিন পর্যন্ত হোটেলের ব্যবস্থাপনায় একটাও ত্রুটি না পেয়ে মিসেস দাস বিরক্ত হয়ে

উঠেছিলেন। এতক্ষণে একটা ছুতো পেয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন—'এতগুলো পয়সা খরচ করে এখানে থাকা হচ্ছে কি এইসব যা তা খেয়ে থাকার জন্য!' এ যে মুখে দেওয়াই যাচ্ছে না। এটা কী হয়েছে!...ছিঃ...।'

—'কেন? খুব খারাপ তো হয়নি। রান্না তো এরা ভালোই করে।'

—'অর্ক, তুমি আমায় রান্না শিখিয়ো না। রান্না করে করে আমার চুল পেকে গেল। কেউ বলুক দেখি একদিনও রান্নায় নুন কি তেল কম হয়েছে! তরকারিতে না আছে নুন, না আছে তেল। একেবারে অখাদ্য! তোমরা পুরুষ মানুষ! এ সবের কী বুঝবে? আজকালকার মেয়েরা কি রাঁধতে জানে? তারা জানে খালি দামি দামি শাড়ি, গয়না পরে পটের বিবি সেজে বসে থাকতে।' বলতে বলতেই তিনি জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তিস্তাকে আরেকবার সাপটে নিলেন।

—'আরি সাবাশ!...' অভিজিৎ বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল—'কোথা থেকে কোথায় গেল। হোয়াট আ ডাইভ!'

বিরক্তি বোধ করছিলাম। বয়স্ক মানুষেরা যদি ছেলেমোনুষের মতো কোমর বেঁধে ঝগড়া করে বেড়ায় তবে তার চেয়ে বিরক্তিকর আর কিছুই থাকে না।

—'প্রোফেসর!' সম্রাট এতক্ষণ খবরের কাগজে ডুবে ছিল। এসব গোলযোগ তাকে স্পর্শ করেনি। সে খবরের কাগজটা আমার দিকে বাড়াতে বাড়াতে বলল—'এই খবরটা পড়েছেন?'

আমি পুরি চিবোতে চিবোতে হেডলাইনের দিকে তাকালাম। চকিতে সমস্ত স্নায়ু টান টান হয়ে উঠল। গ্রেভ ডিগিং! গতকাল রাতে হায়দরাবাদের বিখ্যাত কুতুবশাহী টুম্বসে সুলতান কুলির কবর কারা যেন খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। ভিতর থেকে কিছু নিতে পেরেছে কি না বোঝা যায়নি। কিন্তু কবরের উপর সিমেন্টের সমাধিস্তূপ চটিয়ে ফেলেছে। আমি রুদ্ধশ্বাসে খবরটা পড়তে শুরু করেছি। গ্রেভ ডিগিং কোনো নতুন ব্যাপার নয়। এর আগে অনেকবার কবরের মাটি খুঁড়ে কঙ্কাল তুলে চড়া দামে বিদেশে বিক্রির ঘটনা কানে এসেছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্ষেত্রে কঙ্কাল বস্তুটি গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই তবে তার জন্য ইতিহাসের বুক চিরে তাকে তুলে আনতে হবে; এটা মেনে নেওয়া যায় না। তা ছাড়া একটা কয়েকশো বছরের প্রাচীন কবর থেকে কঙ্কাল বেরোবার সম্ভাবনাটুকুও নেই। তবে খামোখা একটা হেরিটেজকে নষ্ট করার মানে কী!'

—'পড়লেন? কালই দেখে এলাম...অথচ...।'

—'পড়লাম।'

—'এর পিছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

একটু অসহায় বোধ করলাম। যারা ইতিহাসের আক্র এভাবে নষ্ট করে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঠিক ওয়াকিবহাল নয়। একজন ধর্ষণকারীর মনোভাব কী, কেন সে ধর্ষণ করে তা কি সে নিজেও জানে? উদ্দেশ্য সাময়িক উল্লাস। কিন্তু সেটা অন্যভাবেও তো পাওয়া যেতে পারে। তার জন্য ক্রাইমের প্রয়োজন পড়ে না।

আসলে ক্রিমিন্যালরা ক্রাইম করে ক্রাইম করার জন্যই। নিষিদ্ধের প্রতি আকর্ষণ আমাদের মজ্জাগত। অপরাধ করার যে একটা উত্তেজনা আছে সেটাই মুখ্য। উদ্দেশ্যটা নেহাতই গৌণ।

—'আমার মনে হয় স্রেফ অ্যাডভেঞ্চার করার জন্য একদল ছেলে-ছোকরা কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। এ ছাড়া পাঁচশো বছরের পুরোনো একটা কবর খোঁড়ার কোনো কারণ আর খুঁজে পাচ্ছি না।

—'উঁহু...উঁহু...।' দাসবাবু ভর্তি মুখে গোঁ গোঁ করে আমার কথাটাকে আক্রমণ করলেন—'কবর খোঁড়াটা খুব লাভের ব্যবসা মশাই, পয়সা আছে। বিশেষ করে যদি কিছু ধনরত্ন বা আস্ত একটা কঙ্কাল পাওয়া যায় তবে তো কথাই নেই। কঙ্কাল বেচে কত লোক বড়োলোক হয়ে গেল তার ঠিক নেই।'

—কিন্তু পাঁচশো বছরের পুরোনো একটা কবরে এ জাতীয় কিছু থাকার সম্ভাবনা আছে কি?' অর্ক বলল—'এতদিন তো সব মাটি হয়ে যাওয়ার কথা।'

—'তোমার কথায় দম আছে।' তিনি মুখের গ্রাসটা গিলে নিয়েছেন—'কিন্তু ধরো যদি এমন কোনো রাসায়নিক ওঁর মৃতদেহে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যাতে পচন খুব ধীর গতিতে চলতে থাকে, কিংবা এমন কিছু...।'

সর্বনাশ করেছে! ভদ্রলোক বোধহয় মিশরের সাথে গুলিয়ে ফেলেছেন। অর্ক ঠোঁট টিপে হাসছে। তিস্তা হাসি চাপতে মুখ ফেরাল।

—'আসলে কী জানেন দাসবাবু...।' সম্রাট হেসে ফেলল—'সুলতান কুলির আমলে আপনি ছিলেন না। থাকলে অনেক কিছুই হতে পারত।'

তিস্তা একদৃষ্টে ওর দিকে তাকাল। অদ্ভুত দৃষ্টি। চোখে গোপন ইঙ্গিত। যেটা মুখ খুলেও খুলছে না। প্রকাশ হয়েও হচ্ছে না। মেয়েটার বডি ল্যাঙ্গোয়েজ মোটেই সুবিধের নয়।

দাসবাবু একটু থমকে গেলেন। সাবধানী স্বরে বললেন—'আমি কী ভুল

কিছু বলে ফেলেছি?'

—'না, না, This is a compliment। সম্রাট ন্যাপকিনে মুখ মুছে বলল—'প্রোফেসর, খাওয়া হয়েছে?'

আমার আর খেতে ইচ্ছে করছিল না। এমনিতেই খুব একটা ভোজন-রসিক নই। তার উপর তরকারিটা থেকে নারকেল তেলের খুশবু আসছে। কী অজুহাত দিয়ে এখানেই ইতি দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। সম্রাট আমায় একরকম উদ্ধার করল।

—'হয়ে গেছে।'

—'তবে চলুন ছাতে যাওয়া যাক। আপনাকে একটা জিনিস দেখাব।'

তিস্তা, অভিজিৎ, অর্ক পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ওরা বোধহয় ভাবছে যে ওদের বন্ধুটিকে আমি হাত করে ফেলেছি। অথবা অন্য কিছু। একটা বত্রিশ বছরের যুবক যখন তার সমবয়সি বন্ধুদের ফেলে বুড়োলোকের সাথে ঘুরে বেড়ায় তখন সেটা দেখতে একটু খাপছাড়া লাগে বই কি!

ভাবলাম 'না' বলে দেব। কী দরকার বন্ধুদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে। কিন্তু আমার সমস্ত শুভবুদ্ধিকে নস্যাৎ করে বুকের ভিতর থেকে উঠে এল একটা শব্দ—

—'চলো।'

—'আসুন।'

ছাতের সিঁড়িটা বেশ প্যাঁচালো। লোহার সিঁড়ি বেশ কয়েকটা পাক খেয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। হোটেলের অন্যান্য জিনিসের মতো ঝাঁ চকচকে নয়। বরং খানিকটা অবহেলিত। জায়গায় জায়গায় জং ধরে গেছে।

—'সাবধানে আসুন, পড়লে কিন্তু...।'

বাদবাকিটা না বললেও বোঝা যায়। আমি তো পড়বই, তার সাথে সিঁড়িটাও আমার ঘাড়ে পড়বে। বুড়ো হাড়ে অতটা সইবে না।

—'I'm sorry sir.' সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই সম্রাট বলল—'কাল রাতে আমিও আপনাকে যথেষ্ট অপমান করেছি।'

—'তাই বুঝি আজ অভিজিৎকে বকে খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করলে।' ভাবলাম একটু খোঁচা দিয়েই দেখা যাক না কী বেরোয়—'এই সুবুদ্ধিটা কাল ছিল কোথায়!'

সম্রাটের ঠোঁট থেকে হাসিটা মুছে গেল। এক ঝলক যন্ত্রণায় মুখটা কালো

হয়ে গেছে। সে গভীর স্বরে বলে—'আমি আপনাকে hurt করতে চাইনি। কালকের ব্যবহারের জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।'

মনে মনে হাসলাম। পাগল ছেলে! ও যে আমায় কোনোভাবে অপমান করতে পারবে না এ তথ্যটা বেচারার জানা নেই। জানতে পারলেই এই ছাত থেকেই লাফ মেরে সব জ্বালা জুড়োবে। একজন পুরুষের নিষিদ্ধ যৌন আকর্ষণ কী করে বইতে হয় তা যে ওর জানা নেই।

—'আমি কালকের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি "সরি" বললে। ভালো লাগল। কিন্তু...।'

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি উদগ্র কৌতূহলে সে আমার কথা শুনছে।

—'রাত হলে তোমার কিছু একটা হয় সম্রাট' আমি শান্তস্বরেই বললাম— 'সকালবেলায় তুমি কী সুন্দর হাসছ, কথা বলছ। সন্ধে অবধি ঠিকই থাকো। তারপর তোমার কী হয়? মদ খাওয়াটা যে খারাপ তা আমি বলছি না। কিন্তু তার তো একটা মাত্রা আছে। কতই বা বয়স তোমার? এরকম চলতে থাকলে...।'

—'মরে যাব। তাই তো?' সে মুচকি হাসলে—'ছাড়ুন না ওসব কথা...।'

বুঝলাম কথা বাড়াতে চাইছে না। তার মানে এমন কিছু আছে যা ওর ভিতরে প্রতিনিয়ত কাঁটার মতো বিঁধছে। রক্তক্ষরণ এখনো অব্যাহত। কিন্তু সেই ক্ষত ততক্ষণ নিরাময় হবে না যতক্ষণ না সেটা দৃশ্যমান হচ্ছে।

—'আপনি শেষ পর্যন্ত কী decided করলেন?'

—'কী ব্যাপারে?'

—'প্রোফেসার রুদ্র!'

প্রোফেসর রুদ্রকে প্রায় খরচের খাতায় ফেলে দিয়েছিলাম। ওর কথায় মনে পড়ল। সত্যিই তো! তার বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

—'কী জানি সম্রাট! আমি confused। সেই পুরোনো দ্বিধা এসে আবার মনে জুড়ে বসেছে 'জানি যে শেষ পর্যন্ত ফিরে যেতে হবে। তবু...।'

—'কোনো তবু নয় স্যার। আপনার ইমোশন আমি বুঝতে পারি। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করতে গেলে তাতে সমস্যাই বাড়ে। প্রোফেসর রুদ্রকে মাথা থেকে বের করে দিন। মনে করুন না তিনি মৃত!'

—'পারছি না!'

সম্রাট উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

—'আপনাকে সকালবেলা গ্রেভ ডিগিং-এর খবরটা পড়তে বলেছিলাম কেন জানেন? কারণ আপনিও গ্রেভ ডিগিংয়ের সমপর্যায়ের একটা কাজ করার কথা ভাবছেন। প্রোফেসর রুদ্র এখন ফসিল ছাড়া আর কিছু নন। তিরিশ বছর আগের কৌশিক রুদ্রের কঙ্কাল! ইতিহাসের সমাধিতে শান্তিতে রয়েছেন তাকে আবার সেখান থেকে তুলে এনে বহির্জগতের আলোর সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়াটা একরকম গ্রেভ ডিগিং ছাড়া আর কিছু নয়।'

চমৎকৃত হলাম! ছেলেটা এত তলিয়ে ভাবে! কিছুক্ষণের জন্যে ওর কথাটাই সত্যি বলে মনে হল। মনে হল ওর মুখ থেকে উচ্চারিত কথাটাই শেষ কথা। এর বাইরে আর কোনো কথা হতে পারে না! কিছুক্ষণের জন্য প্রতিবাদের ইচ্ছেটাই চলে গেল।

ওদিকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই হাঁফিয়ে পড়েছি। বয়স তো কম হল না। এখন কি আর লাফালাফি পোষায়! আমি দম নেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ি।

—'কী হল? আসুন।'

তাকিয়ে দেখলাম আমার সামনে একটা বাড়িয়ে দেওয়া হাত। শুধু ধরার অপেক্ষা।

ওর হাত ধরেই অবশেষে ছাদে উঠতে হল। এখান থেকে আকাশটা পরিষ্কার দেখা যায়। কোথাও কোনো বাধা নেই। এ একেবারে খোলা আকাশ। আমি কী বোকা! এতক্ষণ জানলায় আটকানো একটুকরো আকাশ দেখেই মন খারাপ করছিলাম। এইখানে, একগাদা আকাশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ধারণাটা আমূল পালটে গেল। কে বলেছে আমি একা? এই তো, সবাই রয়েছে আমার সাথে। অনেক কিছুই নেই—কিন্তু যা আছে তাই বা কম কী!

আমাদের চোখের সামনেই হঠাৎ একটা বিরাট বড়ো সাদা মেঘের চাদর একটু একটু করে সরে গেল। তার পিছনে ঝলমল করছে লাল, নীল, সবুজের এক অবিমিশ্র পথ। কোনো শিল্পীর তুলির টান—রামধনু।

এমন আনন্দ অনেকদিন পাইনি।

রাস্তাতেই গাইড শিবাকুমারণের মুখে শুনেছিলাম যে সলার জঙ্গ এখানকার অন্যতম বৃহৎ মিউজিয়ম। এর অ্যান্টিক সংখ্যা প্রায় সাতচল্লিশ হাজার। সলার জঙ্গের সামনে এসে দাঁড়াতেই মন সম্ভ্রমে ভরে গেল। বিরাট রাজপ্রাসাদের মতন অট্টালিকা। বিশাল বিশাল স্তম্ভগুলোর যদি কথা বলার

শক্তি থাকত তবে খুলে যেত ইতিহাসের অনেক না-জানা অধ্যায়। এমনই প্রবীণ তারা। সলার জঙ্গের বাইরে একজন আসফজাহি বংশধরের মূর্তি। নাম মহম্মদ ইউসুফ আলি খান।

—'কী বলল? জুসুফ আলি কান? কান আবার কী টাইটেল?'

শিবাকুমারণের দক্ষিণী উচ্চারণের সৌজন্যে তিক্তা নিজামের নামটা ভুল শুনেছে।

—'টাইটেলটা কান নয় রে খান। ইউসুফ আলি খান।' অভিজিৎ শুধরে দিয়েছে।

এরপরই শুরু হল নাম এবং পদবির উপর সংক্ষিপ্ত ভাষণ। সম্ভবত সে এ বিষয়ে পি এইচ ডি করেছে। তার মতে দক্ষিণী নামের শেষে নাকি একটা 'অম' বা 'অন' থাকবেই। যেমন—শঙ্করম, নন্দকুমারম, শিবাকুমারণ, সুব্রহ্মনিয়ম ইত্যাদি।

বাজে বকার উপর যদি আলফ্রেড নোবেল একটি পুরস্কার ধার্য করতেন তবে অভিজিৎ এতদিনে নোবেল লরিয়েট হয়ে যেত।

—'অমন করে তাকাবেন না স্যার।' সে বিনীত স্বরে বলল—'একটু মজাই তো করেছি।'

—'আমি তোমায় কিছু বলেছি!'

—'ওরকম একটা চোখ থাকলে কি আর কিছু বলার দরকার হয়? আপনার এক চাউনিতেই যে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। বললে তো নির্ঘাত হার্টফেল-ই করব।' সে ফিচেল হাসি হাসল—'স্যার, ও চোখ তো চোখ নয়, একডজন গাঁট্টা।'

ছেলেটার কথার মধ্যে এমন একটা ছেলেমানুষি থাকে যে রাগ করার উপায় নেই। একটু হেসে অন্য দিকে তাকালাম।

সলার জঙ্গে ঢোকার পথে মহাত্মা গান্ধীজির আবক্ষমূর্তি। তার পেছনেই শোকেসে নানারকম মূর্তি আর ফল। ঘরের চারিদিকে সাতটা ঝাড়।

সেই ঘরটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সাতজন নিজামের অয়েল পেইন্টিং। শিল্পী আর.ডব্লিউ. ডিউস্‌কর। এঁরা প্রকৃতপক্ষে কে কেমন দেখতে ছিলেন তা অয়েল পেইন্টিং দেখে বোঝার উপায় নেই। এতখানি আত্মবিশ্বাসী ও নিশ্চিন্ত মুখ নিশ্চয়ই তাদের ছিল না। কারণ শিল্পী এই ছবিগুলি এঁকেছেন ১৮৮৯ থেকে ১৯৪৯ A.D.-এর মধ্যে। শেষ দুবছর ছাড়া বাদবাকি ওই সময়টা

ব্রিটিশ শাসনাধীনেই কেটেছে। ইংরেজদের দাসত্ব করে যারা নামে নবাব ছিলেন তারা যতই অর্থবান হোন না কেন, আত্মতৃপ্তি বা সুখ তাদের ছিল না। একখানা রাইফেল হাতে নিয়ে বীরত্বব্যঞ্জক মুখ করে বসে থাকাও তাদের মানায় না। সুতরাং এ ছবি শুধুই ছবিই। তাদের আসল চেহারা নয়।

এ ছাড়া দেখার মতো জিনিস বলতে রয়েছে স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত জামা। আলখাল্লার যা দৈর্ঘ্য তাতে অর্ক আর আমি একটার মধ্যেই একসাথে ঢুকতে পারব। নিজাম ব্যবহৃত হুঁকো, আয়না, ইংল্যান্ড থেকে আনা জিনিসপত্র। এইচ.এইচ.মীর. মেহবুব আলি খান মানে ষষ্ঠ নিজামের ফরমান। সময়কাল ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

—'এইচ. এইচের ফুলফর্ম কীরে?'

—'হাড়ে হারামজাদা।' অভিজিৎ আমার দিকে তাকিয়ে জিভ কাটল—'উপ্‌স্...সরি...সরি...।'

এবার সত্যিই রাগ হল। এরা যে কেন এসব জায়গায় আসে! মীর মেহবুব আলি খান কোনো ফালতু লোক ছিলেন না। ১৮৬৯ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বেয়াল্লিশ বছরের মেয়াদেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বের পঞ্চম ধনীতম মানুষ।

তবে সবচেয়ে অপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য জিনিস অপেক্ষা করছিল ষোলো নম্বর ঘরে। এখানে একটা আপাদমস্তক ঢাকা শ্বেতপাথরের নারীমূর্তি আছে। প্রথম দর্শনেই ভেবেছিলাম মূর্তিটাকে বোধহয় ধুলো বালি এড়ানোর জন্য পাতলা অথচ স্বচ্ছ চাদর দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়েছে। মূর্তিটার পিচনে যাওয়া মাত্রই সে ভুল ভেঙে গেল। এ তো সত্যিকারের চাদর নয়। শ্বেতপাথরের উপর এমনভাবে কারুকার্য করা যাতে মনে হয় নারীটির গায়ে একটি পাতলা চাদর। তার নীচ থেকে ফুটে উঠেছে সুন্দরীর নিটোল অবয়বের অস্পষ্ট আভাস। এমনকি চাদরের ভাঁজগুলো পর্যন্ত আসল বলে মনে হয়। আশ্চর্য! স্পষ্ট দিবালোকে চোখে ধুলো দেওয়ার মতো নিদর্শন। ভাস্করের নাম জি.ডি. বেন্‌জোনি। জন্মসূত্রে ইতালিয়ান। মূর্তির নাম 'ভেইল্‌ড রেবেকা' (১৮৭৬)।

—'পিসটার ফিগার দেখেছিস। হে-ভি!'

—'বিয়ে করবি অভিজিৎ! রীতিমতো সুন্দরী কিন্তু।'

তিস্তার প্রশ্নের উত্তরে অভিজিৎ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলে—'আপত্তি নেই। কিন্তু একটা প্রবলেম আছে মাইরি। ফুলশয্যার দিন ঘোমটা

তুলব কী করে?'

তাই তো! তিনজনেই হেসে উঠেছে।

আমি এককোণে দাঁড়িয়ে পোর্সেলিন বাসনপত্র দেখতে দেখতে ওদের কথাবার্তা শুনছিলাম। যৌবন জিনিসটাই বড়ো সুন্দর। যে যা করে, যা বলে তাই চিত্তাকর্ষক। এই সময়টাই বোধহয় সারাজীবনের শ্রেষ্ঠ পুঁজি। শরীর ও মন দুটোই থাকে কোমল, তরল। সুন্দরী বা সুন্দর দেখলেই গড়িয়ে সেদিক পানে ছুটে চলে। উচিত-অনুচিত মনে রাখার কিছুই ধার ধারে না।

যেমন সম্রাট আর বন্দনা। দুজনাই বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। মাঝেমধ্যে একটা-দুটো কথা কানে ভেসে আসছে...।

—'...সম্রাটদা তোমায় একটা কথা বলব কিছু মনে করবে না তো?'

—'মনে করার মতো হলে নিশ্চয়ই করব।'

—'তা হলে বলব না।'

—'তোমার মর্জি। সম্রাটের ঠোঁটে স্মিত হাসি।'

—'নাঃ...বলেই ফেলি।'

—'বলো।'

বন্দনার গলা নীচে নেমে গেল। সম্রাট স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। আস্তে আস্তে তার ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেল। দুচোখে ফুটে উঠেছে অনাবিল বিস্ময়।

বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। জোর করে পোর্সেলিনের দিকে মন দিলাম। অসাধারণ সব পোর্সেলিনের কারুকার্য। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। স্বচ্ছ পোর্সেলিনেরও রয়েছে রকমফের—যেমন ড্রেসডেন, ওয়েজ উড, ক্যাপোডিমন্টে, সভ্রেস, স্যুভেনির, অস্ট্রিয়ান ও ভিয়েনা প্রভৃতি। অস্বচ্ছ পোর্সেলিনের মধ্যে ইংলিশটাই শুধু দেখা গেল।

—'Are your serious?'

ভিতরের তাগিদটা ইন্ধন না পেয়ে চুপ করে ঘুমিয়েছিল। এখন হঠাৎ সে একেবারে দুরন্ত হয়ে উঠেছে। আবেগ যতই সোডার মতো ভসভসিয়ে উঠছে ততই টের পাচ্ছি যে বিবেকটা মরেনি।

সামনে পেতলের ঘড়ায় সুগন্ধি বিরিয়ানি থেকে ধোঁয়া উঠছে। সম্রাট উষ্ণ স্বরে বলল—'আপনার অনুভব নিঃসন্দেহে মহান। কিন্তু সত্যিই কি

আমাদের কিছু করার আছে?'

—'মানে?'

—'সাইকোলজির ব্যাপারে আমার জ্ঞান খুব সীমিত। হতে পারে এটা স্কিজোফ্রেনিয়া বা ওই জাতীয় কিছু। যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে প্রথম দিকে চিকিৎসা করালে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারত। কিন্তু ত্রিশ বছর ধরে যে লোকটা নিজেকে সুলতান কুলি ভেবে আসছে তার সুস্থ হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই।'

ওর কথাটা যথেষ্ট বাস্তবজ্ঞানসম্মত। যৌক্তিকও বটে। কিন্তু যে পরিমাণ আবেগের বশীভূত হয়ে পড়লে মানুষ বুদ্ধি, যুক্তির তোয়াক্কা করে না আমি তার সীমারেখা ছাড়িয়ে গিয়েছি।

—'তা ছাড়া উনি এখন বদ্ধ উন্মাদ। আপনাকে চিনতেও পারবেন না। তার উপর ফেরোশাস! জামশেদ ভেবে যদি আপনারই উপর চড়াও হন তখন কী করবেন!'

কথাটা ভালো লাগল না। তাই বলে এত সহজে ছেড়ে দেব? কে বলতে পারে, হয়তো চিকিৎসা করালে এখনো সুস্থ হতে পারেন! হয়তো তার পূর্বস্মৃতি আবার ফিরে আসতে পারে। ওঁর বয়স এখন প্রায় পঁয়ষট্টি। যদি সুস্থভাবে আরো দশটা বছর বাঁচেন তা হলে ভারতের ইতিহাস অনেকটা উপকৃত হবে।

সম্রাট বোধহয় উষ্ণতার আঁচ পেয়েছে। সে মুচকি হেসে খাওয়ায় মন দিল। অভিজিৎ, অর্করা এতক্ষণ এ ব্যাপারে কিছুই জানত না। আমিই একরকম বাধ্য হয়েই ব্যাপারটা জানিয়েছি। ওদের ছাড়া আমার পরিকল্পনা সফল হবে না। আমি যা করতে চাই, বা করতে চলেছি তাতে ওদের সাহায্য একান্তই প্রয়োজন। অভিজিৎ কিন্তু সম্রাটের মতো নিরাশাবাদী নয়। বরং সে একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

—'তুই একটা "ইয়ে"র মতো কথা বলিস না তো!' ও সম্রাটের কথার প্রতিবাদ করে বলে—'আজকাল টেকনোলজির যা উন্নতি হয়েছে তাতে সবই সম্ভব। উনি একটা ভালো কাজ করতে চাইছেন, আর তুই বাগড়া দিচ্ছিস!'

সম্রাট কাঁটা-চামচ নামিয়ে রেখেছে। চিবোনো বন্ধ করে সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের গ্লাসে হালকা চুমুক দিয়ে বলল—'কখনোই না। উনি যেটা করতে চাইছেন তা অনেকেই ভাবতে পারেন না। Hat's off to him। কিন্তু তোরা বাঘের গলায়

মালা পরানোর বাহাদুরিটাই দেখছিস। বত্রিশ পাটি দাঁতের কামড়ের কথা ভাবছিস না।'

—'কী বলতে চাস? প্রোফেসর রুদ্র আমাদের কামড়ে দেবেন?'

সে হেসে ফেলল—'না...তা বলতে চাই না। কিন্তু তোরা গিয়ে বলবি আর উনিও সুড়সুড় করে তোদের সাথে চলে আসবেন, ভালোমানুষের মতো কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করাবেন। নাঃ...এটা ঠিক ভাবা যাচ্ছে না। ত্রিশ বছর আগে যা ছিলেন এখনো তাই থাকবেন এটা সম্ভব নয়। ত্রিশ বছর আগে তিনি সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে communicate করতে পারতেন। এখন পারবেন না। আর communication না হলে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানোর কোনো মানেই হয় না।'

অর্ক চুপ করে দু'পক্ষের কথাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। এবার বলল—'সম্রাট ঠিকই বলেছে। তোর মতে কী করা উচিত?'

—'বিশেষ কিছুই না। তিনি এখানে যেভাবে থাকুন না কেন, এটাই তার জন্য সবচেয়ে ভালো। কলকাতায় নিয়ে গেলে অ্যাসাইলাম ছাড়া গতি নেই। অবশ্য যদি কলকাতা অবধি তাকে নিয়ে আসা যায়। যাই হোক, অ্যাসাইলামে বন্দিজীবন কাটানোর চেয়ে এই তো দিব্যি আছেন। বন্যেরা বনে সুন্দর, ঐতিহাসিকরা ঐতিহাসিক স্থানে...।' সম্রাট হঠাৎ থেমে গেল।

তিস্তার বুক থেকে কখন যেন আঁচলটা অনেকটা নেমে এসেছে। শঙ্খের মতো বুক। বিভাজিকা সুস্পষ্ট। কালো আঁটোসাটো ব্লাউজে আরো লোভনীয় হয়ে উঠেছে। এ মেয়েটার একেবারে অসভ্যের মতো বুক। পেছনও অনুরূপ। ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা! এককথায় সর্বনাশী! পুরুষের যে কটা দুষ্প্রবৃত্তি আছে সেগুলো জাগিয়ে তুলতে অদ্বিতীয়া।

পাশে তাকিয়ে দেখি সম্রাটের চোখও ওখানেই আটকে গেছে। ওর চোখদুটো কেমন অপ্রকৃতিস্থ মনে হল। যেন ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। পারলে নরম অঙ্গটার উপর হামলে পড়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে।

চোখ দিয়েও যে কারো শ্লীলতাহানি করা সম্ভব তা জীবনে প্রথম বুঝলাম। সম্রাটের মুখ দেখে মনে হল, যেটুকু আবরণ আছে ওর চোখ বোধহয় সেটুকুও সরিয়ে ফেলেছে।

. বুকের ভেতর একটা তীব্র জ্বালা। বিরিয়ানি বিস্বাদ মনে হচ্ছে। যে সকালটার আরম্ভ এমন সুন্দর হয়েছিল তার সমস্ত আলো যেন দপ করে নিভে

গেল।

ও আঁচলটা তুলছে না কেন? ওর ঠোঁটের পাশে নীরব প্রশ্রয় কেন?

—'তা হলে এখন কী কর্তব্য?'

অর্কর প্রশ্নটা দুজনকেই সজাগ করে দিল। সম্রাট চোখ সরিয়ে নিয়েছে। তিস্তা আঁচলটা সন্তর্পণে তুলে নেয়। স্লিভলেস ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে তবু নরম মাখনের মতো শরীরের উঁকিঝুঁকি।

আমার মনটা নিমেষে তিতো হয়ে গেল। জেদি গলায় বললাম—'আমি প্রোফেসর রুদ্রকে চাই। ওঁকে নিয়েই আমরা এখান থেকে ফিরব। ধরে দিতে পারো তো দাও... । Otherwise আমায় 2nd option-এর কথা ভাবতে হবে।'

সম্রাট সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের বোতলের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল। আমার কণ্ঠস্বরে বোধহয় সামান্য হলেও উষ্মা প্রকাশ পেয়ে থাকবে। সে চমকে তাকাল।

—'2nd option-এর প্রশ্নই ওঠে না।' তার কণ্ঠস্বর ক্লান্ত, বিব্রত—'আপনি চাইলে আমাদেরই সে চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু...'

—'কিন্তু কী?' কেন জানি না ওর উপর একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলাম—'তোমার মনে "কিন্তু" আছে। তবে তুমি হোটেলেই থেকো। তোমায় আমার প্রয়োজন নেই।'

ও তড়িতাহতের মতো আমার দিকে তাকিয়েছে। অদ্ভুত যন্ত্রণাময় ব্যঞ্জনা। এমনভাবেই বোধহয় কোনো একসময় জুলিয়াস সিজার ব্রুটাসের দিকে তাকিয়েছিলেন। ওর চোখ যেন তেমনই হতাশায় বলে উঠল—'প্রোফেসর, তুমিও।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। পরিবেশটা অনাবশ্যক ভারী হয়ে উঠেছে। অর্ক বেচারা অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। এই মুহূর্তে কী করলে যে এই শীতল নিস্তব্ধতা ভাঙবে তা বোধহয় ভেবে পাচ্ছে না। অভিজিৎ যথারীতি কাঁটা চামচ নিয়ে মাথা নীচু করে মাংস ছাড়াতে ব্যস্ত। তিস্তার আঙুলে শাড়ির আঁচল জড়ানোটাই বোধহয় বদ অভ্যেস। খালি জট পাকিয়েই যাচ্ছে। পাকিয়েই যাচ্ছে।

—'ও কে।' বেশ কিছুক্ষণ বাদে সম্রাটই নীরবতা ভাঙল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'প্রোফেসর যা বলছেন তাই হবে। কিন্তু তার আগে একটা হোমওয়ার্ক প্রয়োজন।'

—'সেটা আবার কী?'

—'কৌশিক রুদ্র তো আর পাখি নন যে দানা দেখালেই জালের উপর এসে বসবেন। তাকে ধরতে হলে জানা দরকার পার্টিকুলার কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবেই। লোকটা কতটা ডেঞ্জারাস সেটাও জানা জরুরি, তা ছাড়া দরকার আছে সেডেটিভ। সেডেটিভ ইঞ্জেক্ট করতে পারবেন এমন লোক লাগবে।'

—'সেডেটিভ!'

—'নিশ্চয়ই। বেগড়বাই করলে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হবে।'

—'ভালো বুদ্ধি।' অভিজিৎ বলল—'তা ছাড়া বেশি ঝামেলা করলে তুই তো আছিস। অ্যায়সা জোরে চেপে ধরবি...।'

—'আমি নেই...।' সম্রাট উঠে দাঁড়িয়ে বলে—'আমার মনে "কিন্তু" আছে। আমি হোটেলেই থাকব। আমাকে প্রোফেসরের প্রয়োজন নেই। তোরা যা। Best of Luck।'

হোটেলে ফিরে শাওয়ারের তলায় শরীর খুলে দিয়েছি। সকালবেলায় বেরোনোর আগে স্নান করেই বেরিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু একটু নিভৃতকোণের খোঁজে শেষ পর্যন্ত এখানেই আশ্রয় নিতে হয়েছে।

চোখ দুটো জ্বালা জ্বালা করছিল। তার সাথে শরীরও। ঠান্ডা জলের প্রতিটি বিন্দু রোমকূপগুলো বুক ফাটা তৃষ্ণায় শুষে নিচ্ছে। তাতে দেহের প্রদাহ খানিকটা ঠান্ডা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু সেই শীতলতার খুব বেশি অংশ ভিতরে পৌঁছচ্ছে না।

কতক্ষণ শাওয়ার খুলে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। সময় আমার চারপাশ দিয়ে জলবিন্দুর মতো ঝরে ঝরে পড়ে পায়ের কাছে স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তিস্তার বুক! একজোড়া উত্তুঙ্গ চূড়া!...সম্রাটের দুর্বার দৃষ্টি! মুহূর্তটাকে যতই এড়াতে চাই ততই সে আমার সামনে এসে নির্লজ্জের মতো দাঁড়ায়।

বাথরুমের আয়নায় নিজেরই নগ্ন প্রতিচ্ছবি পড়েছিল। ভালো করে দেখলাম। কী আছে এই শরীরে! পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই একটা জীর্ণ, ক্লান্ত শরীর! রহস্যহীন, উপত্যকা-অধিত্যকাহীন। বুকের লোমের কিছু কাঁচা কিছু পাকা, সব মিলিয়ে একটা জন্তু ছাড়া নিজেকে আর কিছুই মনে হল না।

অজান্তেই হাতটা উরুসন্ধিতে চলে গেছে। এটা কী? এটা কেন? একটা

বিশ্রী ঠাট্টা?

মাথায় পাগলামি চেপে বসল। হাতটা ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠেছে।... পুরুষত্বের একমাত্র প্রমাণটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে...পেটের কাছে চর্বির স্তর ভেদ করে একটা তীব্র ইচ্ছে সূঁচ ফোঁটাল।...লম্বা অঙ্গটা কেমন শক্ত হয়ে উঠেছে।...ফুঁসে উঠছে। একটা উষ্ণ, সান্দ্র তরল...।

হাতটা বিদ্যুদ্‌বেগে উঠে এসে খামচে ধরল সমতল বুক। পিষছে... চটকাচ্ছে...। বিষাক্ত আক্রোশে গলা দিয়ে একটা বোবা কান্না ছিটকে বেরিয়ে এল। বুকের সব বিষ চোখ বেয়ে নেমে যাচ্ছে। একটা অদ্ভুত গোঙানি। তার সাথে কোনো ভাষা ছিল কি না জানি না। যদি থাকেও তবে সে ভাষা আমার নিজেরও জানা নেই।

একটু পরে স্নান সেরে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন দেখে বোঝার উপায় নেই যে একটু আগেই বুকের ভিতরে সুনামি এসে আছড়ে পড়েছিল। এই শান্ত সৌম্যমূর্তি দেখলে কে বলবে এর ভিতরের মানুষটার মধ্যে কখনো কোনো দুরন্ত জেহাদ জেগে উঠেছে!

হোটেলের জানলায় তখন সন্ধের স্তিমিত আলো। এটুকুও নিভে যাবার প্রস্তুতিতে মগ্ন। ভারী ভারী পেলমেটের পর্দা সেই শেষবেলার রোশনাইটুকু মুছে দিতে উদ্যত। এসি-র মৃত ঠান্ডায় নেই কোনো জীবনের স্পর্শ। একটা উষ্ণ সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। সেটুকু এনে দিল পাশবালিশ।

সম্রাট বিছানায় আড়কাত হয়ে টিভি দেখছে। যতখানি কম কাপড় পরা সম্ভব ঠিক ততটাই পরে উজ্জ্বল পর্দায় সত্তা সুন্দরী। প্রায় সবটুকু রহস্যই উন্মোচিত করতে পারলে যেন বাঁচে।

—'সম্রাট।'

কোনো উত্তর নেই। টিভি-র চ্যানেল পালটে গেল। ফ্যাশন টিভির জায়গায় এখন অ্যানিমেল প্ল্যানেট। সবুজ ঘাসের মধ্য দিয়ে বাঘ আর হরিণের রেস। শিকার আর শিকারীর দৌড়।

—'সম্রাট।'

ও উজ্জ্বল চোখে তাকাল। চোখটা যেন একটু বেশিই চকচক করছে।

—'Yes pro-f-f-f essor।'

এর মধ্যেই খেয়ে ফেলেছে! কখন খেল? আমি যখন বাথরুমে ছিলাম তার মধ্যেই...।

—'কিছু বলবে—না?'

এতক্ষণ পাইনি। এবার অ্যালকোহলের উগ্র গন্ধটা নাকে এসে ঝাপটা মারল।

—'না থাক, পরে বলব। তুমি সুস্থ নও।'

ও হাসছে—'আমি পাঁড় মাতাল। অল্পস্বল্পে আমার কিছু হয় না। দিব্যি টনটনে জ্ঞানে আছি। বলুন।'

আমি চোখ কুঁচকে ওকে ভালো করে দেখি। কথাগুলো তো সজ্ঞানেই বলছে বলে মনে হচ্ছে। জাতে মাতাল তালে ঠিক।

—'তুমি সত্যিই যাবে না?'

—'কোথায়?' ভাবটা এমন যেন কিছুই বোঝেনি। অথচ ঠোঁটের কোণে আবছা হাসি প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, বুঝেছে সবই। আমায় অস্বস্তিতে ফেলার ফন্দি।

কথা জিনিসটা বড়ো মারাত্মক! ব্রহ্মাস্ত্রের মতো। একবার বেরিয়ে গেলে তখন আর তাকে থামাবার জো নেই। লক্ষ্য বস্তুতে সে আঘাত করবেই। তারপর তার কী হল, সে বাঁচল না মরল, আহত হল কি না তা দেখার বা জানার প্রয়োজনও বোধ করে না।

—'আমি উইথড্র করছি। sorry।'

পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া দ্বিতীয় রাস্তা নেই।

—'Sorry? Why?' সে হাসল—'ঠিকই তো বলেছেন। যা বলেছেন—বেশ বলেছেন। I'm good for nothing...।'

—'আমি ও কথা বলতে চাইনি...।'

সম্রাট আমায় থামিয়ে দিল। তার কণ্ঠস্বরে জ্বালা—'Please...please...। দরকার পড়লে যাব। Okay? আপনার বক্তব্য শেষ হয়ে থাকলে leave me alone. আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

কম্বলের তলা থেকে পেটচ্যাপটা একটা বোতল বেরিয়ে এল।

আমি জানি যথারীতি অন্যান্য দিনের মতোই আজও ওর চ্যাপ্টার এবার ক্লোজ হবে। কোথাও এমন কিছু একটা আছে যা এই জ্বালার উৎস। এই বয়সে এমন মারাত্মক নেশা ধরল কেন ছেলেটা? কী এমন দুঃখ ওর যে একেবারে দেবদাস হয়ে ঘুরতে হবে! লক্ষ করে দেখেছি রাত হলেই এই মাত্রাটা বাড়ে। রাতের সাথে ওর কীসের এত শত্রুতা!

—'প্রোফেসর!'

—'হুঁ।' সম্রাটের দিকে তাকালাম। সে নিজের মনেই টিভি দেখছে আর মদ খাচ্ছে। তবে ডাকল কে?

—'প্রোফেসর, আমি এই দিকে।'

এ তো অভিজিতের গলা! কোথা থেকে ডাকছে? এদিক-ওদিক দেখেও বুঝতে পারি না।

—'আমি জানলায় স্যার।'

এইবার চোখে পড়ল। জানলার ফাঁকে খাড়া কানবিশিষ্ট একটা মুখ—'একবার ঘরে আসবেন স্যার? একটু কথা ছিল।'

উঠতে ইচ্ছে করছিল না। সারাদিন টইটই করে ঘুরে বেড়ানোর পর নরম বিছানায় আলস্য ছড়িয়ে দিয়েছে। আর কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলে নির্ঘাত ঘুমিয়েই পড়তাম। এমনিতেই আমি একটু আরামপ্রিয় মানুষ। তার উপর স্বভাবতই কুঁড়ে। সুতরাং এ মুহূর্তে বিছানা ছেড়ে ওঠাটা সত্যিই আমার পক্ষে কষ্টকর। তা সত্ত্বেও উঠতেই হল। কারণ দায়টা আমারই। বাধ্য হয়ে অভিজিতের পেছন পেছন অর্কদের ঘরে গেলাম। সেখানে তখন চলছে এক এলাহি কাণ্ড।

শিবাকুমারণ গোবেচারার মতো গোলকোন্ডা ফোর্টের বিশাল একটা মানচিত্র নিয়ে বসে আছে। অর্ক পারলে যেন মানচিত্রটার উপরই শুয়ে পড়ে। দাসবাবুও মন দিয়ে ওটা দেখছেন।

তিস্তা বোধহয় আমার সাথে আরো কাউকে আশা করেছিল। ওর হতাশা চোখ এড়াল না।

—'কাজটা ঠিক হচ্ছে না স্যার।' শিবাকুমারণ মিনমিন করে তার বক্তব্য শেষ করতে না করতেই অভিজিৎ পেল্লায় একটা ধমক দিয়ে বলল—'ঠিক হচ্ছে কি ভুল হচ্ছে সেটা তোমার কাছে জানতে চাওয়া হয়নি। যা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তাই বলো।'

—'Fine, Sir'–সে একটা পেন নিয়ে বোঝাতে লাগল—'প্রোফেসরকে বেশিরভাগ রাতেই পাওয়া যায় দাদমহলে। দাদমহল, অর্থাৎ যেখানে রাজা-রানিরা বিচার করতেন। দাদমহলটা বানজারা দরওয়াজা দিয়ে ঢুকলে পোর্টিকোর পরে আর রানিদের মহলের আগে পড়বে। কিন্তু আপনারা তো বানজারা দরওয়াজা দিয়ে ঢুকতে পারবেন না। ওটাতে পাহারা থাকে। তা ছাড়া

'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' শো-এর পর দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। আপনারা ঢুকবেন কী করে?'

—'ঢোকার নিশ্চয়ই উপায় আছে, প্রোফেসর ঢোকেন কী করে?'

—'একটাই উপায় আছে। কিন্তু একটু কষ্টসাধ্য। আপনাদের "ফতেহ দরওয়াজা" দিয়ে ঢুকতে হবে। "ফতেহ দরওয়াজা" দিয়েই ঔরঙ্গজেব ঢুকেছিলেন। এর পাশের পাঁচিলটা বেশ খানিকটা ভেঙে গেছে। ওখান দিয়েই ঢুকতে হবে। সেখান থেকে একটু ঘুরে এসে নাগিনাবাগ হয়ে বডিগার্ড লাইন পেরিয়ে সোজা দাদমহল।'

সে একটু থেমে বলল—'ব্যাপারটা শুনতে যতটা সহজ মনে হচ্ছে আদৌ ততটা সহজ নয়। আপনারা কবে যেতে চান?'

—'পরশু।'

—'পরশু ঘোর অমাবস্যা পড়বে স্যার। পরশু নয়, যেতে হলে কালই যান। অমাবস্যা এমনিতেই অশুভ। তার উপর যতক্ষণ আলো জ্বলবে ততক্ষণ কোনো প্রবলেম নেই। আলো নিভে গেলে নিজেকেই নিজে দেখতে পাবেন না, অন্য কিছু তো দূরের কথা।'

—'টর্চ নিয়ে যাব?'

—'টর্চ নিতে পারেন। কিন্তু নাইট ওয়াচম্যান দেখতে পেলে কপালে দুঃখ আছে। একদম লো পাওয়ারের টর্চ হলে কোনো প্রবলেম নেই। তা-ও সবসময় জ্বালাতে পারবেন না। রাজা-রানিদের মহলের সামনে প্রচুর চেয়ার থাকে। অন্ধকারে হোঁচট খেলে মাথাও ফাটতে পারে। তা ছাড়া শব্দও হতে পারে। এক ফোঁটা শব্দই এখানে জোরে শোনা যায়। আপনাদের খুব সাবধানে এগোতে হবে।'

—'ধুত্তোর!' অভিজিৎ বিরক্ত হয়ে বলল—'এই বুড়োটাও দেখছি বিশ্ব আঁতেল। কোথায় রাতের বেলা মনের আনন্দে কারো বাড়ির বারান্দায় শুয়ে ঘুমাবে, তা নয়, এরকম একটা গোলমেলে জায়গায় ঢুকে বসে থাকে। ডেঞ্জার, পাব্লিক।'

—'ডেঞ্জার লোক তো বটেই স্যার। ওকে ধরা মোটেই সহজ নয়। দেখতে ওরকম শুকনো হলে কী হবে, গায়ে অসুরের মতন জোর।' শিবাকুমারণ ম্লান হেসে বলে—'আপনারা কেন যে...।'

কথাটা সম্পূর্ণ না করে সে থেমে গেল।

'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড' শো-এর পর দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়। আপনারা ঢুকবেন কী করে?'

—'ঢোকার নিশ্চয়ই উপায় আছে, প্রোফেসর ঢোকেন কী করে?'

—'একটাই উপায় আছে। কিন্তু একটু কষ্টসাধ্য। আপনাদের "ফতেহ দরওয়াজা" দিয়ে ঢুকতে হবে। "ফতেহ দরওয়াজা" দিয়েই ঔরঙ্গজেব ঢুকেছিলেন। এর পাশের পাঁচিলটা বেশ খানিকটা ভেঙে গেছে। ওখান দিয়েই ঢুকতে হবে। সেখান থেকে একটু ঘুরে এসে নাগিনাবাগ হয়ে বডিগার্ড লাইন পেরিয়ে সোজা দাদমহল।'

সে একটু থেমে বলল—'ব্যাপারটা শুনতে যতটা সহজ মনে হচ্ছে আদৌ ততটা সহজ নয়। আপনারা কবে যেতে চান?'

—'পরশু।'

—'পরশু ঘোর অমাবস্যা পড়বে স্যার। পরশু নয়, যেতে হলে কালই যান। অমাবস্যা এমনিতেই অশুভ। তার উপর যতক্ষণ আলো জ্বলবে ততক্ষণ কোনো প্রবলেম নেই। আলো নিভে গেলে নিজেকেই নিজে দেখতে পাবেন না, অন্য কিছু তো দূরের কথা।'

—'টর্চ নিয়ে যাব?'

—'টর্চ নিতে পারেন। কিন্তু নাইট ওয়াচম্যান দেখতে পেলে কপালে দুঃখ আছে। একদম লো পাওয়ারের টর্চ হলে কোনো প্রবলেম নেই। তা-ও সবসময় জ্বালাতে পারবেন না। রাজা-রানিদের মহলের সামনে প্রচুর চেয়ার থাকে। অন্ধকারে হোঁচট খেলে মাথাও ফাটতে পারে। তা ছাড়া শব্দও হতে পারে। এক ফোঁটা শব্দই এখানে জোরে শোনা যায়। আপনাদের খুব সাবধানে এগোতে হবে।'

—'ধুত্তোর!' অভিজিৎ বিরক্ত হয়ে বলল—'এই বুড়োটাও দেখছি বিশ্ব আঁতেল। কোথায় রাতের বেলা মনের আনন্দে কারো বাড়ির বারান্দায় শুয়ে ঘুমাবে, তা নয়, এরকম একটা গোলমেলে জায়গায় ঢুকে বসে থাকে। ডেঞ্জার, পাব্লিক।'

—'ডেঞ্জার লোক তো বটেই স্যার। ওকে ধরা মোটেই সহজ নয়। দেখতে ওরকম শুকনো হলে কী হবে, গায়ে অসুরের মতন জোর।' শিবাকুমারণ ম্লান হেসে বলে—'আপনারা কেন যে...।'

কথাটা সম্পূর্ণ না করে সে থেমে গেল।

ওর উদ্বেগ এবার আমায় সত্যিই স্পর্শ করেছে। যা করছি তা কি ঠিক হচ্ছে? একটু বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে বাস্তবকে অস্বীকার করছি না তো? প্রোফেসর রুদ্র!—এমন নির্বিবাদী, শান্তসৌম্য মানুষ! তাকে ভয় পাবার কথা ছাত্রজীবনেও ভাবিনি। অথচ এখন...!

আরেকটা উদ্বিগ্ন সকাল।

কাল অনেক রাত অবধি জল্পনা কল্পনা করে শুতে শুতে প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছিল। ঘড়ির এবং আমাদের উভয় পক্ষেরই। অর্কদের ঘর থেকে যখন গুনশান করিডোর বেয়ে নিজের ঘরে ফিরছি তখন চোখ দুটো যেন দশমণি হয়ে আসছিল। চতুর্দিক নিঃস্তব্ধ। কোথাও কোনো শব্দ নেই। ঘুম ঘুম চোখে ছায়া ছায়া রাত্রির মোহিনীমূর্তি দেখার জন্য তেমন কোনো ইচ্ছের মোচড় অনুভব করিনি। বরং মনে হচ্ছিল ঘরে গিয়ে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলেই বাঁচি।

কিন্তু ঘরে ফিরেও কি শান্তি আছে! আরেকজন তখন প্রায় বিছানা থেকে পড়েই যাচ্ছে। তাকে ঠিক করে শোওয়াও রে! মেঝেতে বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে...তুলে রাখো রে...। টিভি-টা আপনমনেই নেচে যাচ্ছে। তাকে বন্ধ করো রে! তিনি কখনো বাথরুমে গিয়েছিলেন। কল বন্ধ করেননি। জল পড়ে বাথরুম ভেসে যাচ্ছে...।

ক-ত কাজ!

সব ঝামেলা মিটিয়ে যখন বিছানায় এসে শুয়েছি, চোখটা এসেছে বুজে, নিদ্রাদেবী ঝুমঝুমে আবেশে মাথার ভিতরে ঝিমঝিমে ঘণ্টি বাজাচ্ছেন এমনই সময়...।

—'ঠকাস।'

লাফ মেরে উঠে বসলাম। রাত্রির নিঃস্তব্ধ প্রেক্ষাপটে, অবচেতনের প্রথম স্তরে একটা সামান্য শব্দই প্রায় ভূমিকম্পের মতো কম্পন জাগিয়ে তুলেছে।

হিজ হাইনেসের বালিশের তলায় এতক্ষণ রিমোটটা গুটিসুটি মেরে বসেছিল। এবার ধাক্কা খেয়ে বেচারা সোজা নীচে পড়েছে। তারই এরকম ভয়াবহ আওয়াজ।

'ধুত্তোর!' বলে শুয়ে পড়লাম। আর সেই যে শুয়েছি একেবারে গতরাতটাকে ইতিহাস করে দিয়ে ঘুম ভাঙল আজ সকাল আটটায়।

সকালের একঝলক রোদ চোখের উপর এসে পড়েছে। বুকের ভেতরে বেশ একটা কাঁপুনি অনুভব করলাম। আমার সারা জীবনে এই প্রথম একটা বেপরোয়া কাজ করতে যাচ্ছি। টিপিক্যাল উচ্চমধ্যবিত্ত জীবন থেকে বেরিয়ে এসে একটা দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ফেলার অদ্ভুত নেশা আছে। সেই নেশার ফেনিল উচ্ছ্বাস ব্রেকফাস্টের ফিশফিঙ্গারের সাথে দিব্যি মিশে গেল। মনে হল, এমন সুস্বাদু ফিশফিঙ্গার জীবনে অনেকদিন খাইনি।

সম্রাট বিছানার উপর বসে একদৃষ্টে গোলকোন্ডার ম্যাপটা দেখছিল। আমাদের সুবিধের জন্যই শিবাকুমারণ কাল এটা রেখে গিয়েছে। যদিও এতে আমাদের কী সুবিধে হওয়া উচিত তা ভেবে পাইনি। আমরা এমনিও হাতড়াব, অমনিও হাতড়াব। গোলকোন্ডা ফোর্টের যা ঘোরপ্যাঁচ তাতে রাতের অন্ধকারে সঠিক রাস্তা খুঁজে পাওয়া একরকম কষ্টসাধ্য। এই ম্যাপটি তাতে খুব সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয় না।

'স্যার?'

হঠাৎ একঝলক সুগন্ধ নিয়ে তিস্তা আমাদের ঘরে এসে ঢুকল—আজ ওর পরনে শিফনের শাড়ি। উদ্ধত বুকের নীচে পাতলা কোমর। নাভি আবছা উন্মুক্ত। সুগোল উরুদুটোও যেন ইঙ্গিতে ফুটে আছে।

—'শিবাকুমারণ বলল তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিতে। মক্কা মসজিদ, চারমিনার আরো কীসব যেন দেখাবে। তাড়াতাড়ি করলে বিকেলের আগে ফিরতে পারব।'

কথাগুলো ও কাকে বলছে বুঝলাম না। এখানে 'স্যার' বলতে আমি একাই আছি। অথচ তার মনোযোগ অন্যদিকে। জবাবটা আমার দেওয়া উচিত কিনা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। সম্রাট রক্ষা করল।

সে মুখ না তুলেই বলে—'আসছি। আপনারা তৈরি হোন।'

তিস্তা অপেক্ষা করছে। বোধহয় আরো কিছু বলবে। সুন্দর সেজেছে আজ। মেরুন রঙের শাড়ি, ম্যাচিং ব্লাউজে ওর রংটা আরো বেশি চকচক করছে। চূড়া করে খোঁপা বেঁধেছে। কুহকময়ী চোখে নীল লাইনার।

—'ওর শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে।' সে কুণ্ঠিত হয়ে বলল—'কাল অনেকরাত অবধি জেগে ছিল। বিরিয়ানিটা বোধহয় হজম হয়নি। পেটে অস্বস্তি হচ্ছে।'

সম্রাট এবার বাধ্য হয়েই চোখ তুলে তাকিয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য এক

টুকরো চাঞ্চল্য ওর নির্লিপ্ত মুখে ছায়া ফেলে সরে গেল।

—'মুখার্জি সাহেব, আপনার মাথার কাছে টেবিলের উপর দেখুন ফার্স্ট এইড বক্স আছে। ওখান থেকে দুটো অ্যাসিলক ওয়ান ফিফ্‌টি নিয়ে দিয়ে দিন।' সে তিস্তার দিকে তাকায়—'সকাল থেকে বমিটমি কিছু করেছে কি?'

—'না।'

—'ক'বার গেছে?'

—'বার তিনেক।'

—'ঠিক আছে। অ্যাসিলক দুটো নিয়ে যান। আমরা আসছি।'

তিস্তা মাথা নেড়ে চলে গেল।

অর্ক ছেলেটা এমনিতে ভালোমানুষ। কিন্তু বয়সের তুলনায় পরিপক্ক নয়। এই বত্রিশ বছর বয়সেও 'ছেলেমানুষ' ভাবটা তার যায়নি। বাচ্চা ছেলের মতো সে এখনো গোঁ ধরে। বায়না করে। আবার বকুনি খেলে বাচ্চা ছেলের মতোই মুখ চুন করে বসে থাকে।

অসুস্থতার খবর পেয়ে দুজনে মিলে ছুটে গিয়ে দেখি সে বেচারার একেবারে নাজেহাল অবস্থা। একদিকে দাসবাবু কাল সে কী কী খেয়েছিল তার লিস্ট করতেই ব্যস্ত। অন্যদিকে অভিজিৎ পারলে তাকে দুহাত নেয়।

—'কাল বিকেলে টিফিনে কিছু খেয়েছিলে?'

সে আমতা আমতা করে বলল—'কাল সামোসা দিয়েছিল। তিস্তা খেল না। তাই...।'

—'তাই তুমি পুরোটাই সাবড়ে দিলে।' অভিজিৎ খেপে গিয়ে বলল—'ছি...ছি... তোর আর কবে আক্কেল হবে র‍্যা? প্রত্যেকবার এই একই ঘটনা। ডুয়ার্স, নৈনিতাল, সিমলা, দিল্লি, দার্জিলিং, হায়দরাবাদ—সব জায়গাতে গিয়ে তুই একবার না একবার মাটি করবিই।'

দাসবাবু অনেকক্ষণ কী যেন ভেবে অবশেষে মাথা নাড়লেন—'নাঃ ভালো বুঝছি না। হসপিটালাইজ করে দেওয়াই ভালো। স্যালাইন দিতে হতে পারে।'

হসপিটাল। অর্কর ফ্যাকাশে মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে ওখানেই হার্টফেল করবে। বোধহয় করতে যাচ্ছিলও, কিন্তু সম্রাটকে ঢুকতে দেখে তার ধড়ে প্রাণ এল।

—'কী প্রবলেম?' সে বলল—'তোরা এমন চেঁচাচ্ছিস যে মনে হচ্ছে

এখানে ডাকাত পড়েছে।'

সমস্যাটা বিস্তারিত বলা হল। বিশেষ করে অভিজিতের ক্ষোভের শেষ নেই। আজকের অভিযানটা নিয়ে তার এত পরিকল্পনা—তার সবটাই জলে যেতে বসেছে দেখে সে ভয়ানক ক্ষুব্ধ।

—'এই ব্যাপার?' সে সমস্ত উপাখ্যান শুনে স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর স্বরে বলে—'তা এতে চেঁচানোর কী আছে! চেঁচালে কি প্রবলেম সল্‌ভ্‌ড হবে! আজ সকালে এখনো পর্যন্ত কী খেয়েছিস?' অর্ক দুপাশে সজোরে মাথা নেড়ে জানায় যে এখনো পর্যন্ত পেটে কিছু পড়েনি।

—'তবে অ্যাসিলক দুটো খেয়ে নে। খাওয়ার দশ মিনিট বাদে ঠিক দুটো মেরী বিস্কুট আর জল। শুধু বিস্কুট আর জল। আর কিছু না। Got it?'

সে এবার তিস্তার দিকে তাকিয়েছে। —'বিস্কুট আছে? না আনতে হবে?'

—'না। আসার দিনই কয়েক প্যাকেট কিনেছিলাম। ওটা আছে।'

–'Good'। সে উঠে দাঁড়ায়—'আপাতত ওটাই চলুক। আশাকরি ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক না হলে ওবেলা ডাক্তার দেখাতে হবে।' তারপর গলা নামিয়ে বলল—'যতটা না অসুস্থ তার চেয়ে বেশি কাহিল! ওষুধের চেয়েও বেশি দরকার ভোকাল টনিক। এ ব্যাপারে আমরা আপনার শরণাপন্ন। দেখুন যাতে আমরা এবেলা একটু তাড়াতাড়িই বেরোতে পারি। আফ্‌টার অল...।' সে গভীর চোখে তিস্তার দিকে তাকিয়ে আছে—'আপনি ওর স্ত্রী।'

তিস্তা একটু বিব্রত হাসল।

আজ অবশ্য তেমন কিছু দেখার ছিল না। কাল যথেষ্ট ধকল গেছে। বিকেলে গোলকোন্ডা ফোর্টের লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের প্রোগ্রাম এবং আমাদের 'অপারেশন কৌশিক রুদ্র।' তাই সকালে আর টাইট সিডিউল রাখা হয়নি। মোটামুটি লোক্যাল সাইট সিইঙের উপর দিয়ে সকালটা কাটবে।

যাওয়ার সময় রাস্তাতেই পড়ল হাইটেক সিটি। লার্সেন অ্যান্ড টুবরোর তৈরি এই দশতলা ইমারত স্থাপিত হয়েছে ১৯৯৮ সালে। একে সাইবার টাওয়ারও বলে। এছাড়াও চোখে পড়ল ১৯১৩ সালে স্থাপিত হওয়া অ্যাসেম্বলি হল, সরোজিনী দেবী আই হসপিটাল ও এল.ভি. প্রসাদ আই হসপিটাল।

আজকের দর্শনীয় স্থানগুলি হল মূলত মক্কা মসজিদ, চারমিনার, ফলকনামা প্যালেস, চৌমহল্লা প্যালেস কমপ্লেক্স, পুরানি হাভেলি, পৈগাদের

সমাধি ইত্যাদি। এদের মধ্যে 'চারমিনার' নামটি সম্ভবত পরিচিততম। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে হায়দরাবাদে প্লেগের আক্রমণে প্রচুর মানুষ মারা যায়। তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ১৫৯০-৯২ খ্রিস্টাব্দে হায়দরাবাদের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ কুলি কুতুবশাহ 'চারমিনার' তৈরি করেন। এর প্রতিটি মিনারের উচ্চতা ৫৬.৭ মিটার। মিনারের গায়ে ঘোরানো সিঁড়িও আছে। যদিও উপরে ওঠার অনুমতি নেই। একতলায় দাঁড়িয়ে টেলিরোবটিক ক্যামেরার লেন্সে ধরা চারমিনারের মাথা থেকে শহরের দৃশ্য টাচ স্ক্রীন কন্ট্রোলের সাহায্যে বড়ো পর্দায় দেখতে হবে। এ একরকম দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো।

পরিচিতির দিক দিয়ে চারমিনার এগিয়ে থাকলেও আভিজাত্যের দিক থেকে কিন্তু মক্কা মসজিদ এগিয়ে। রাজপুত ঘরানার স্থাপত্যে এই মসজিদটি গঠনের কাজ শুরু করেন মহম্মদ কুলি কুতুবশাহ। আর ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে কাজ শেষ করেন মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব। কথিত আছে যে এই মসজিদের প্রধান গম্বুজের ইটগুলি আনা হয়েছিল মক্কা থেকে। রমজান মাসে প্রায় ১০,০০০ লোক একসাথে এখানে নামাজ পড়তে পারে।

ফলকনামা প্যালেস, চৌ মহল্লা প্যালেস কমপ্লেক্স, পুরানি হাভেলি সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই। একেক সময়ে একেকজন অভিজাত বা রাজপুরুষ এক-একটি প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন। সেগুলোই এখন দেখার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন ফলকনামা প্যালেস তৈরি করেন ভিকারুল উমরা বাহাদুর। ইনি তৎকালীন অভিজাতবর্গের অন্যতম। চৌ মহল্লা প্যালেস কমপ্লেক্স আসফজাহি বংশধরদের কীর্তি। আর পুরানি হাভেলি দ্বিতীয় নিজামের উপহার।

এছাড়াও রয়েছে বিড়লা মন্দির, লুম্বিনীপার্ক, ওসমান সাগর, এম.টি.আর গার্ডেন, বটানিক্যাল গার্ডেন, পাবলিক গার্ডেন ইত্যাদি।

তবে এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটাকে মন হয়েছে তা হল হুসেন সাগর লেক। এটা রীতিমতো বিখ্যাত পিকনিক স্পট। প্রায় ষাট বর্গ কিমি ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট জলাশয়টি ১৫৬২ বা মতান্তরে ১৫৭৮ সালে ইব্রাহিম কুলি কুতুবশাহ খনন করান। জলাশয়টির পরিকল্পনা তৈরি করেন মীর হুসেন শাহওয়ালি, যিনি হায়দ্রাবাদী ইতিহাসে 'মিয়াকল ম্যান' নামে বিখ্যাত। তার নামেই লেকের নাম হয়েছে হুসেন সাগর লেক।'

হুসেন সাগরের মাঝখানে 'রক অফ জিব্রাল্টারের' উপর মিশরীয় বুদ্ধ

মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি দৈর্ঘ্যে ১৭ মিটার লম্বা এবং ওজনেও বিশেষ কম যান না। মাত্র ৩২০ টন।

প্রায় ৪০ ফুট গভীর লেকের সবুজাভ জলে স্পিডবোটের আদরে ফেনিল চূড়া উথলে উথলে উঠছে। ঢলঢলে কাচের মতো দুলছে, লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে নেচে কলকল শব্দ তুলে ছুটে চলেছে। কখনো গড়ছে বুদ্বুদের কাচমহল। কখনো বা ভেঙে যাচ্ছে, আবর্ত সৃষ্টি করছে।

ভীষণ ইচ্ছে করছিল জলের বুকে একটু ঘুরে বেড়াই। বাদবাকিদের মুখের অবস্থা দেখে মনে হয় তাদেরও মনের কথা একই।

—'প্রোফেসর।' সম্রাট চোখ থেকে রোদচশমা নামিয়ে হাসল—'একটু জলবিহার হবে নাকি?'

কাল রাতের তিক্ততা ও মন থেকে মুছে ফেলেছে দেখে ভালো লাগল।

—'হলে তো ভালোই হত। কিন্তু সময় আছে কি?'

—'নিশ্চয়ই।'

লঞ্চের নাম ভাগীরথী। একটা অতিকায় রাজহাঁসের মতো জল কেটে দুলতে দুলতে এগিয়ে এল। মসৃণ তার গতি। ধীর চলন।

—'তোমরা যাই বলো।' লঞ্চে উঠতে উঠতে তিস্তা বলল—'স্পিডবোটের মজাই আলাদা। লঞ্চে তো আর জলের কাছাকাছি যাওয়া যায় না। স্পিডবোটে জলের সৌন্দর্য বেশি উপভোগ করা যায়। কী সুন্দর। হাত বাড়ালেই...।'

—'তাই বুঝি?' তার কথার মাঝখানেই অভিজিৎ বলে উঠে—'ওরে, কে আছিস। এই মহিলাকে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দে তো। উপভোগ করুক বসে।'

আকাশটা অনেকক্ষণ ধরেই মুখ ভার করেছিল। সকাল থেকেই আবহাওয়া দপ্তর সতর্কবাণী শুনিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে ঘনিয়ে এসেছে ঘন নিম্নচাপ। সুতরাং আজ বিকেলে বজ্র, বিদ্যুৎ ও ঝটিকাসহ একচোট বর্ষণের প্রবল সম্ভাবনা। ব্যাপারটাকে প্রথম বিশেষ গুরুত্ব দিইনি। আবহাওয়া দপ্তর যে কোনোকালে দুর্ঘটনাবশতও সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। কিন্তু আজ মনে হয় ধারণাটা বদলাবার সময় হয়ে এসেছে।

আমার সমস্ত অভিজ্ঞতাকে নস্যাৎ করে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি নামলই।

মানে নামতেই হল তাকে। প্রথমে ঝিরঝির এবং কিছুক্ষণ পরেই মুষলধারে নেমে আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের সলিলসমাধি ঘটিয়ে দিল।

টাটা সুমোর ভিতরে সমস্ত কাচ তুলে দিয়ে জুজুবুড়ো হয়ে বসে আছি। কাচের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির ঢল। আর্দ্র কাচে অন্ধকারটাকে কেমন যেন নীল বলে মনে হচ্ছিল। ঘন নীল একটা পর্দা যেন আকাশ বেয়ে নেমে এসে ঢেকে দিয়েছে সমস্ত দৃশ্যপট। বিদ্যুৎ ফণা তুলে ব্যর্থ ছোবল মেরে মেরে বেড়াচ্ছে। অনির্দিষ্ট শিকারের অপেক্ষায় তার বিষদাঁত ঝলসে ঝলসে উঠছে। তীব্র আক্রোশের হিস্ হিস্ শব্দে কালো কালো ছায়া আকাশের বুকে ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে ত্রিমিত্রিমি করে প্রলয়ডঙ্কা বাজাচ্ছে।

চাপা অন্ধকারের মধ্যে ফস করে জ্বলে উঠেছে লাইটারের শিখা। আলতো তামাক পোড়ার গন্ধ। আর একরাশ নৈঃশব্দ্য। মাঝে মাঝে কানের কাছে মশার গুঞ্জন। এই নিয়েই গাড়ির ভিতরে বসে আছি। সামনে অন্ধকার। সেই ধূসর কালোর মধ্যে কুচকুচে কালো হয়ে অতিদানবের মতো বিশাল ছায়া শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোলকোন্ডা ফোর্ট। তার কালো প্রান্তরেখা হালকা হতে হতে ধূসরে মিশেছে। ভাঙাচোরা প্রাচীন প্রাচীর চামড়াহীন পেশিসর্বস্ব! তবু তার মধ্যে রহস্যময়তা আছে। একদিন এই দুর্গেই আলোড়ন তুলেছিল ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই। সেদিন সেই রাজরাজড়ারা ছিলেন বলে সে ছিল। এখন দৃশ্যটা পালটে গেছে। আজ সে আছে বলেই সেই বাদশারাও আছেন। সেদিন পর্যন্ত যেখানে প্রতিধ্বনিত হত হাসির ফোয়ারা, সেখানে আজ ইতিহাস কেঁদে বেড়ায়। নিশুতি রাতে হয়তো বাতাস ফিসফিস করে শোনায় অতীতের গৌরবকাহিনি। কিংবা অভিমান ভরে চলে যাওয়া প্রিয় মানুষদের প্রতি জানায় করুণ অনুযোগ—'তুমি ভুলে গেছ...।'

—'স্যার...।'

শিবাকুমারন মেয়েদের হোটেলে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল। ফিরে এসেছে।

—'নেমে আসুন স্যার...রাস্তা পরিষ্কার।'

—'এই বৃষ্টির মধ্যে নামব কী করে? জ্বর হবে যে।'

সম্রাট দরজা খুলে নেমে পড়েছিল। দাসবাবুর কথা শুনে ঘুরে দাঁড়াল—'আপনাদের কী মনে হয়? আমরা এখানে ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে এসেছি?'

এ কথা শোনার পর আর বসে থাকা যায় না। দাসবাবু নেমে পড়লেন। কাঁধে ব্যাগ।

—'জিনিসটা রেডি রেখেছেন তো?'

—'এখনই!'

অভিজিৎ বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠল—'আপনি কি লোকটার চলে যাওয়ার পর ইঞ্জেকশনটা দেবেন? কখন দরকার পরে ঠিক নেই। অথচ এখনো রেডি করেননি! আপনি মাটি করবেন দেখছি।'

ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হয়ে ব্যাগ খুলে সেডেটিভটা চরম মুহূর্তের জন্য তৈরি রাখলেন। আমাদের প্রত্যেকের হাতেই একটা করে মিনিটর্চ। শিবাকুমারণ ইঙ্গিতে জ্বালাতে বারণ করল। বানজারা দরওয়াজার সামনেই নাইট গার্ড বিনিদ্র পদক্ষেপ হেঁটে বেড়াচ্ছে। আলো দেখে চলে আসতে পারে। ধরা পড়লে সোজা শ্রীঘর।

—'কাল গ্রেভ ডিগিং হওয়ার জন্য আজ সিকিউরিটির একটু কড়াকড়ি আছে স্যার। হাতের সিগ্রেটটাও ফেলে দিলে ভালো হয়।'

এখন একেবারে আছাড়ি পিছাড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আমরা চার-পা এগোতে এগোতেই আপাদমস্তক ভিজে চুপচুপে। উঁচু-নীচু রাস্তা। খানাখন্দে জল জমে টুবটুবে হয়ে আছে। কোথায় একটা ফোঁকর হাঁ করে বসে আছে তা বোঝার উপায় নেই।

অর্কর হাতের রেডিয়াম ঘড়ি রাত বারোটা সূচিত করছে। কলকাতায় এমন সময়ে সন্ধে। অথচ এখানে যেন শ্মশানের নীরবতা। রাস্তায় একটা লোক তো দূরের কথা, একটা কুকুরও নেই। শুনশান গড়ের মাঠ। আকাশ ভেঙে পড়ছে, আর তার মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি আমরা ছ'টা প্রাণী। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘুমন্ত শহরের বুকে ছ'জন অপরিচিত আগন্তুক।

ধারণাটা নিঃসন্দেহে রোম্যান্টিক। পরিবেশও তদনুকূল। ভিজে জামা গায়ে এঁটে বসেছে। তার মধ্যে ঠান্ডা হাওয়া মাঝে মাঝে ফিসফাস করে কিছু বলার চেষ্টা করছে। গুরুগুরু মেঘ গর্জন। বিদ্যুতের দর্শনরেখা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে একঝলক দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেছে। উলটোদিক দিয়ে আরেকটা সাদা রেখা চমকে উঠে গোটা আকাশটাকে কাটাকুটি করে দিল। সেই ঝলকে ওঠা আলোয় এক মুহূর্তের জন্য প্রাচীরের ছায়ামূর্তি একটু স্পষ্ট হল। পরক্ষণেই আবার সেই ছায়া কালো কালো। যেন অনেকগুলো অতিকায় দৈত্য হাতে হাতে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আমাদের কাণ্ড দেখছে।

—'এইটাই বোধহয় ফতেহ্ দরওয়াজা স্যার। এইবার একটা টর্চ একটু

জ্বালুন।'

সামনে একটা বিশাল উঁচু কিছু দেখেই আন্দাজ করেছিলাম এটা দরজা জাতীয়ই কিছু হবে। টর্চ জ্বালাতেই দেখা গেল কাঁটাযুক্ত পাল্লা। অর্থাৎ দরজাই বটে। কিন্তু ফতেহ্ দরজাই যে তা কী করে বুঝব? সব দরজাই তো এক।

শিবাকুমারণ একটা জোরালো শ্বাস টানে—'আশেপাশেই একটা কামান থাকার কথা। দেখুন তো সেটা কোথায়?'

এবার মনে পড়ল। ঔরঙ্গজেব যে কামানটা নিয়ে এসেছিলেন সেটার নাম 'ফতেহ্ রহবার'। দৈর্ঘ্যে প্রায় ষোলো ফুট লম্বা। তিনি এই দরজা দিয়ে ঢুকে দুর্গ জয় করেন বলে এই দরজার নাম ফতেহ্ দরওয়াজা'। জয় নির্ণায়ক কামানটা চলে যাওয়ার সময় 'ফতেহ্ দরওয়াজার সামনেই স্মৃতিস্বরূপ রেখে যান। কামানটা আজও সেখানেই আছে।

টর্চের মুখ ঘুরল। বৃষ্টির ঝাপসা প্রেক্ষাপট ভেদ করে সাদা আলো ছড়িয়ে পড়েছে। কারোরই দেখতে অসুবিধে হল না যে অদূরেই পড়ে আছে একটা প্রকাণ্ড লোহার নল। কালের নিয়মে জং ধরেছে। চটে গেছে। তা সত্ত্বেও কী প্রকাণ্ড তার দেহ!

—'ঠিকই ধরেছি। এটাই ফতেহ্ দরওয়াজা। এবার একটু এগিয়ে চলুন।'

প্রাচীরের গা বেয়ে আবার এগিয়ে চলা।

বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করছে। এদিকে সচরাচর কেউ আসে না। রাস্তা জুড়ে আগাছার জবরদখল দেখে অন্তত তাই মনে হয়। সাপখোপ নেই তো!

—'সাবধানে আসুন, কাঁটা গাছ আছে।'

অতি সন্তর্পণে পা ফেলে এগোলাম। অন্ধকারে ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছি না। জুতোর মধ্যে কাদা ঢুকে পিচ্ছল হয়ে গেছে। বৃষ্টির আঘাতে আলগা মাটি রূপান্তরিত হয়েছে প্যাচপ্যাচে কাদায়।

পচা চিমসে গন্ধটা এখান থেকেই নাকে আসছে। এটা বোধহয় ইতিহাসেরই গন্ধ। গোলকোন্ডা ফোর্টের যত কাছে যাচ্ছি ততই যেন গন্ধটা দুঃসহ হয়ে উঠছে। গা গুলিয়ে উঠল।

বিরাট লম্বা প্রাচীরটা এখনো আমাদের পিছন ছাড়েনি। তাকে ডানদিকে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম। অতিকায় সরীসৃপের মতো সে-ও আমাদের সাথে এঁকে-বেঁকে চলেছে। জমাট পাথরের নিরন্ধ্র দেওয়াল। দুর্ভেদ্য, দুর্লঙ্ঘ্য। এমন একখানা জম্পেশ পাঁচিল ছিল বলেই বোধহয় দুর্গ জয় করা খুব সহজ

হয়নি। বর্তমানে কুষ্ঠরোগীর মতো অনেক জায়গা থেকেই চামড়া খসে খসে পড়েছে। কোথাও কোথাও সূক্ষ্ম চুলের মতন ফটিলও দৃশ্যমান। তবু এ-পাঁচিল টপকানোর কথা ভাবাও যায় না।

ফতেহ্ দরওয়াজাকে পেছনে ফেলে কয়েক কদম এগোতে দেখা গেল এক জায়গায় প্রাচীর ধসে পড়ে বেশ গর্তের মতো সৃষ্টি হয়েছে। ওখান দিয়ে একটা আস্ত মানুষ দিব্যি গলে যেতে পারে।

শিবাকুমারণ গর্তটার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

—'কী হল? দাঁড়ালে কেন?'

—'দাঁড়ান স্যার।' টর্চের আলোয় তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠছে—'সবাই মিলে একসাথে ঢোকা যাবে না। এক এক করে ঢুকতে হবে। প্রথমে আমি যাব। কিন্তু যতক্ষণ না আমি বলছি ততক্ষণ কেউ ভিতরে ঢুকবেন না।

অভিজিৎ চাপা গলায় ফিসফিস করে বলে—'কেন? ভয় কীসের?'

—'বিষাক্ত সাপ থাকতে পারে। বিছে থাকতে পারে। তার উপর ভুলে যাবেন না এখানে একসময় লক্ষ লক্ষ লোক মরেছিল। তাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হয়নি, কারণ অন্ত্যেষ্টির জন্য কেউ বেঁচে ছিল না। অনেক দুর্ঘটনা এখানে ঘটেছে স্যার। জায়গাটাই অভিশপ্ত।'

—'যতসব গুল!' অভিজিৎ ক্ষীণ স্বরে বলল বটে, কিন্তু কথাটায় যতখানি জোর থাকা উচিত ততখানি পাওয়া গেল না। 'স্রেফ superstition।'

শিবাকুমারণ তার কথায় কান না দিয়ে গলার চেইনের লকেটটা বের করে কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে শক্তিমন্ত্র পড়ছে। গা ছমছম করে উঠল। তার হাবেভাবে কিছু একটা ছিল যা রক্তে শীতলতার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে। একবিংশ শতকের মানুষ হয়েও হৃৎস্পন্দনের গতি রোধ করতে পারছি না। সে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বুকের খাঁচা ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

শিবাকুমারণ এবার মন্ত্র পড়া শেষ করে গুঁড়ি মেরে ভিতর ঢুকে গেল। টর্চের আলো তাকে ঘিরে ধরল। পরক্ষণেই অদৃশ্য।

দমবন্ধ কয়েকটা মুহূর্ত, তারপরেই প্রচণ্ড একটা চিৎকার।

কেঁপে উঠলাম। কী হল!...কী হল...এরকম চ্যাঁচাল কে?

—'কিছু হয়নি।' কাঁধের উপর দিয়ে একটা উষ্ণ স্পর্শ! কানের কাছে সম্রাটের উষ্ণ ঠোঁট—'ওটা প্যাঁচার ডাক।'

প্যাঁচা!... প্যাঁচার ডাক এমন ভয়ঙ্কর! কলকাতায় তো কত রাতে প্যাঁচার

ডাক শুনেছি। কিন্তু সেকি এমন গগনবিদারী! প্যাঁচা যে এমন বুক-ফাটা চিৎকার করতে পারে তা আমার জানা ছিল না।

আমার অন্তঃকরণ তখনো কাঁপছিল। একটা শিক্ষিত, যুক্তিবাদী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এত ভয় পাচ্ছি কেন, কীসেরই বা ভয় পাচ্ছি তার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পেলাম না।

এতক্ষণ সবাই চুপচাপ ছিল। টর্চের আলো নিভে যাওয়ার পর চোখের সামনে কালো ছাড়া আর কিছুই নেই। শিবাকুমারণ যে বলেছিল 'আলো নিভে গেলে নিজেকেই নিজে দেখতে পাবেন না'—খুব ভুল বলেনি। ওই অন্ধকারে নিজেকেই কেমন দেহহীন, অস্তিত্বহীন প্রেতাত্মা বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি জীবিত দুনিয়ার কেউ নই। এই হাসিখুশি পৃথিবীর সজীব বস্তুর মধ্যে আমি নেই। কোনো শরীরী অস্তিত্ব আমার কাছে কি না সে বিষয়েও সন্দেহ হচ্ছিল। সমস্ত ছায়ার মধ্যেই যেন আরেকটা ছায়া মিশে গেছি। যেন আমি প্রোফেসর বিদ্যুৎ মুখার্জি নই।

—তবে আমি কে? নাঃ...কিছুতেই ভাবব না...কিছুতেই না।

—'চলে আসুন স্যার' শিবাকুমারণের গলার স্বর। তার সাথে হালকা রশ্মির রেখা ওপার থেকে এপারে চলে এসেছে—'সাবধানে আসবেন। ইট, পাথরে পা কেটে যেতে পারে।'

—'জয় কালী।' দাসবাবু গর্ত দিয়ে সেঁধিয়ে গেলেন। তার পিছন পিছন একে একে অভিজিৎ, অর্কও গেল।

—'এবার আপনি যান।'

সম্রাট কাঁধে আলতো চাপ দিয়ে বলল। ওর চুল, চোখ, ঠোঁট বেয়ে বৃষ্টির জল ঝরে ঝরে পড়ছে। সুগঠিত দেহরেখা সুস্পষ্ট।

উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলেও এই আন্তরিকতাটুকু ভালো লাগল। একটু হাসলাম। বৃষ্টির তেজ হঠাৎ করেই যেন খানিকটা নরম হয়ে পড়েছে। টর্চের সাদা আলোয় প্রত্যেকটা ফোঁটা আলাদা করে দেখা যাচ্ছিল। স্ফটিক কণার মতো স্বচ্ছ, শীতল ফোঁটা টিপটিপ করে নেমে পড়েছে পাথরের বুকে। নিঃশব্দ প্রকৃতির মাঝখানে এই বৃষ্টিপতনের শব্দই যেন শব্দব্রহ্ম। মৃত নিস্তব্ধতার মধ্যে একটুখানি জীবনের শব্দ।

বেশ খানিকটা ঘুরে এসে অবশেষে মুর্দা গেট দিয়ে দুর্গের মূল অংশে ঢুকতে হল। এই মুর্দা গেট দিয়ে সুন্নি জাতীয় মুসলিমদের মরদেহ দুর্গের বাইরে

বের করে নেওয়া হত। ওই গেটটার বর্তমানে এমন দুর্নাম যে এখানে কোনো পাহারাদার থাকতে চায় না।—

'দুর্নাম মানে?' দাসবাবুর গলা কেঁপে গেল।

শিবাকুমারম মুচকি হাসল।

মুর্দাগেটের লাগোয়া নাগিনাবাগ। এখানেই কুতুবশাহী সেনাপতি আব্দুল রজ্জাক বীরবিক্রমে লড়াই করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তার শেষ নিঃশ্বাসের সাক্ষী নাগিনাবাগ। মৃত্যুপথযাত্রী বীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু, অশ্রুজলের দাগ নিয়ে আজও নীরব হয়ে আছে সে।

আমার পাশ দিয়ে অর্ক, সম্রাটরা বড়ো বড়ো পা ফেলে এগিয়ে গেল। সবাই এক-একটা ছায়া। অস্তিত্বহীন, পরিচয়হীন এক-একটা ছায়া। তাদের নিজস্ব কোনো পরিচয় নেই, নাম নেই। কেউ অর্ক, বা অভিজিৎ বা সম্রাট নয়। আমার পরিচিত কেউ ওরা নয়। সবাই অপরিচিত ছায়া।

—'অর্ক আস্তে হাঁট, পড়ে যাবি।' নিস্তব্ধতার মধ্যে সম্রাটের ভারী কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—'আমি অর্ক নই রে, অভিজিৎ।'

—'অর্ক কোথায় গেল?'

—'এই যে আমি, সামনে,' সামনে থেকে আওয়াজ এল।

—'কোথায়?'

—'এই তো।'

—'ও'। সম্রাটের গলা স্তিমিত হয়ে এসেছে—'কাউকেই তো চিনতে পারছি না। যা অন্ধকার।'

বডিগার্ড লাইনে ঢুকতেই আবার সেই চিমসে গন্ধ! দেওয়ালগুলো ভেঙে খসে পড়েছে। গম্বুজগুলো বেশিরভাগই কবন্ধ। ভাঙাচোরা মুণ্ডহীন হয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। মাথার উপর দিয়ে চামচিকে ঝটপট করে উড়ে গেল। এই মহলের ছাদগুলো অপেক্ষাকৃত নীচু। খাঁজকাটা ছাতে ছোপ ছোপ অন্ধকার।

ভেজা গায়ে শীত করছিল। জেনানা মহলের দিকে এগোতে এগোতেই টের পেলাম বিটকেল গন্ধটা ক্রমশই বাড়ছে।

—'আর কতদূর! পা যে...।'

—'শ্ শ্ শ্ শ্।' শিবাকুমারণ ঠোঁটে আঙুল রেখে ফিসফিস করে

বলল—'ওই শুনুন...শুনতে পাচ্ছেন...।'

সবাই স্তব্ধ। প্রত্যেকেই উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করছি। দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে না? কেমন একটানা উঁ...উঁ...উঁ... করে অবিশ্রান্ত স্বরে কে যেন কেঁদে চলেছে। কে?

আমার বুকের ভিতর যেন কয়েক হাজার মেগাওয়াটের একটা মেশিন ধপ ধপ করে চলতে শুরু করল, পাঁজরগুলো যেন তার জোরে থরথর করে কাঁপছে।

শিবাকুমারণ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—টর্চগুলো নিভিয়ে দিন।'

আলো নিভে গেল। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করতে পারছি না। আশে-পাশে কতগুলো প্রাচীন স্তম্ভের সুউচ্চ আভাস। কোথা দিয়ে ঢুকেছিলাম, আর কোথা দিয়ে যে বেরোব তাই-ই বোঝা যাচ্ছে না।

—'Follow me'। শিবাকুমারণের অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি শব্দ লক্ষ্য করে উৎসের দিকে এগিয়ে চলল।

বডিগার্ড লাইনের পর সোজা জেনানা মহল। যতই এগোচ্ছি দুর্গন্ধের সাথে কান্নার আওয়াজটাও বাড়ছে। অতল অন্ধকারে ডুবে আছে প্রাচীন দুর্গ। এমনকি ছ'টা মানুষ যে একজন আরেকজনের সঙ্গে পা মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে নীরবে হেঁটে চলেছে তা-ও বোঝার উপায় নেই।

—'সামনেই দাদমহল। আমি যদি খুব ভুল না করি তা হলে এটা প্রোফেসর রুদ্রর্ই কণ্ঠস্বর। কিন্তু এখানে ভুলেও কোনোরকম আওয়াজ করবেন না স্যার। দুর্গের কান মারাত্মক। প্রোফেসর টের পেলে পালিয়ে যাবেন।'

—'এখান থেকে শুনবেন কী করে? দাদমহল তো অনেকটাই দূরে।'

শিবাকুমারণ হাসল—'এখানে সব দেওয়ালেরই কানও আছে স্যার। এই যে আমি জেনানা মহলের সামনে দাঁড়িয়ে এত কথা বলছি...যে-কোনো দেওয়ালে কান পেতে শুনুন...। স্পষ্ট শুনতে পাবেন। দাদমহলের জানালার নীচে একটা পোর্টিকো আছে। সামান্য নড়লেই চড়লেই Echo তৈরি হয়। নয়তো এত দূর থেকে কান্নার আওয়াজ শুনলাম কী করে?

তাই তো?

—'তাই বলছি। কোনোরকম শব্দ করবেন না। আমাদের কাজ হল প্রথমে প্রোফেসরকে লোকেট করা। তারপর যখনই আমি 'লাইট' বলব তখনই

সব কটা টর্চ ওঁর চোখ লক্ষ্য করে জ্বালিয়ে দেবেন।'

—'চোখে! কেন?'

এটা না জিজ্ঞেস করলেও চলত। মানুষ থেকে শুরু করে যে কোনো জীব-ই আচমকা চোখে একরাশ আলো এসে পড়লে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। যত বিপজ্জনক জীবই হোক না কেন চড়া আলোর সামনে অসহায় হয়ে থমকে যায়। তার হিংস্রতা, বন্যতা একমুহূর্তের জন্য লোপ পায়। তখন তাদের নিয়ে যা খুশি করা চলে।

টর্চটাকে শক্ত করে চেপে ধরলাম। বহুদিন আগে একবার জলঢাকা পাওয়ার প্রজেক্ট দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছি, কী প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে জলের তোড় এসে টারবাইনের উপর ভেঙে পড়েছে। যেন দুর্দাম গতিতে ছুটে চলা একদল অশ্বমেধের ঘোড়া রাস্তার সমস্ত বাধাবিপত্তিকে অবলীলায় দলিত, মথিত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ছুটে চলেছে।

ঠিক তেমনই আমার সারা শরীরের শিরার মধ্যে রক্তপ্রবাহ ছুটে চলেছে। প্রচণ্ড শক্তিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হৃৎপিণ্ডের উপর। কাঁপিয়ে দিচ্ছে, ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে...।

—'ওই যে...দেখতে পাচ্ছেন!'

অভিজিতের গলা উত্তেজনায় কাঁপছে। অদূরেই একটা ছায়া উপুড় হয়ে পড়ে। তার দেহরেখা এই ঘন কালোর মধ্যেও সুস্পষ্ট। মাঝেমধ্যেই শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওই স্পষ্ট কাতরধ্বনির উৎস সে-ই।

—'চুপ।'

আমার পাশ দিয়ে কে যেন নিঃশব্দে এক পা এক পা করে প্রোফেসরের পিছন দিকে এগিয়ে গেল। উচ্চতা দেখে বুঝলাম—সম্রাট।

বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। প্রোফেসর রুদ্রর ফাঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। বাইরে বৃষ্টিটাও থেমেছে। অনেকক্ষণ বৃষ্টি হওয়ার পর আকাশ এখন অনেকটাই পরিষ্কার। একটা-দুটো করে তারাও উঁকি মারছে।

হঠাৎ...!

—'লা-ই-ট।'

দপ করে জ্বলে উঠেছে ছ-ছ'টা টর্চ। কথা নেই, বার্তা নেই। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো প্রোফেসর রুদ্রর মুখের উপর...।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে মুখ আড়াল করে ফেলেছেন। ছ'টা টর্চের আলোর সামনে অসহায়, বিহ্বল, তিরিশ বছরের পরের কৌশিক রুদ্র। আমার প্রথম পূজা...প্রথম প্রেম।

আড়াল করে থাকার দরুন তার মুখ দেখা গেল না। কিন্তু তা বাদে পুরো শরীরটাই দৃশ্যমান। এককালের দীর্ঘদেহী সুপুরুষ আজ শিরা ওঠা বৃদ্ধ। মজবুত কাঠামোর ধ্বংসস্তূপটুকুই বাকি আছে। চুল ঘাড় ছাড়িয়ে পিঠের দিকে নেমে এসেছে। কতদিন চিরুনি পড়েনি তার কোনো হিসেব নেই।

কোথায় সেই পূর্ণ যৌবনের তরুণীদের হার্টগ্লব আর কোথায় এই উন্মাদ বৃদ্ধ!

আস্তে আস্তে হাতটা মুখ থেকে নেমে এসেছে। প্রোফেসর চোখ কুঁচকে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছেন। তীব্র চোখ দুটোয় আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে। সেই চোখ। সেই গভীরপ্রজ্ঞা, আর ধারালো ইন্টেলেক্টের মিশ্রণ। এ চোখ আর কারো হবে না, হওয়া সম্ভব নয়।

গলা কাঁপছে। তবু সাহসে ভর করে বললাম—'স্যার!...স্যার!...প্রোফেসর রুদ্র!'

স্যারকে দেখতে ঠিক ফাঁদে পড়া বাঘের মতো লাগছিল। অসহায় অথচ কী পরিমাণ জিঘাংসা সে চোখে ফুটে বেরোচ্ছিল তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। একটু ফাঁক পেলেই যে উনি লাফিয়ে পড়ে আমাদের টুটি টিপে ধরবেন তা তার শরীরী ভাষাই বলে দিচ্ছে।

আবার ডাকলাম, 'প্রোফেসর...।'

—'কে?'

সেই কণ্ঠস্বর। উদাত্ত, জলদগম্ভীর।

—'আমি...আমি আপনার ছাত্র।'

—'আমার ছাত্র!' শিথিল ঠোঁট একটু নড়ল—'আ-মা-র ছাত্র!'

তিনি এক পা এক পা করে এগোচ্ছেন। বিস্মৃতির ভিতর থেকে একটা কথাই যেন উঠে আসছে—'আমার ছাত্র! আমার ছাত্র!'

হাড় সর্বস্ব আঙুল আমার মুখ স্পর্শ করেছে। শিউরে উঠলাম। কী শীতল তাঁর স্পর্শ! আমার কপাল বেয়ে আস্তে আস্তে নামছে। নাক, ঠোঁট বেয়ে থুতনি অবধি এল। হাতে লম্বা লম্বা নখ। চোখটা যদি খুবলে নেন!

—'স্যার!'

—'তুই জামশেদের চর। আমায় মারতে এসেছিস। তাই না?'

প্রোফেসরের চোখ চকচক করছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে হিংস্র দাঁতের ঝলক।

—'তোর তলওয়ার কোথায়?'

—'স্যার!'

—'তলওয়ার বের কর। বুঝদিল, বেহায়া, বেশরম।' প্রোফেসর উন্মত্তের মতো আমার কলার ধরে ঝাঁকাচ্ছেন—'মার আমায়! মার। মার!...হিম্মৎ থাকলে মার কুত্তা!...নামর্দ!...?

ওঁর হাত বিদ্যুদ্‌বেগে আমার গলা চেপে ধরল। আঃ...কী শক্তি! কী করে বোঝাব যে আমি তাঁকে মারতে আসিনি? আমি তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী। বিশ্বাস করলে তো বলব! আমার মধ্যে কোন্ হত্যাকারীকে দেখছেন তিনি? কোন্ খুনিকে দেখছেন?

চোখে অন্ধকার দেখলাম। ভদ্রলোকের হাতে কী প্রচণ্ড জোর! সর্বশক্তি দিয়ে হাত দুটো ছাড়ানোর চেষ্টা করছি—উঃ...একটু অক্সিজেন,...অক্সিজেন...।—

—'স্যার!...স্যার! কী করছেন!...'

অভিজিৎ, অর্করা ছুটে এসে প্রোফেসরকে চেপে ধরে টেনে সরিয়ে নিয়েছে। বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে। আমি জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করছি। হৃৎপিণ্ডটা এমন জোরে ধকধক করছে যেন এক্ষুনি ফেটে যাবে।

'আমায় ছেড়ে দে...।' প্রোফেসর সমস্ত শক্তি দিয়ে অভিজিৎ, অর্ককে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেছেন—'তোরা কী ভেবেছিস?... এভাবে আমায় আটকে রাখবি?...দেখে নেব...সবকটাকে...ছাড়, ছেড়ে দে।' বলতে বলতেই ঠিক যেমন করে হঠাৎই ফুঁসে উঠেছিলেন, তেমন করেই হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলেন। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন অভিজিতের হাতের দিকে। টর্চের আলো ওর কব্জিতে পিছলে পড়েছে।

—'দাসবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন কী?' অভিজিৎ চেঁচিয়ে বলল—'এই সুযোগ...।'

—'এটা কী...এটা কী?'

অর্ক আর অভিজিতের বজ্র আঁটুনি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছেন প্রোফেসর—'তোর হাতে এটা কী?'

অভিজিতের কবজিতে একটা জন্মদাগ। আড়াআড়িভাবে একটা রক্তিম জড়ুল জ্বলজ্বল করছে। সে হতবাক!

—'মনে আছে? তলোয়ার শিখতে গিয়ে তোর কবজি কেটে গিয়েছিল। ওটা তোর সেই দাগ বেটা। তোকে আমি পেয়েছি! তোকে আমি পেয়েছি! তুই জামশেদ!...জামশেদ!'

প্রোফেসর অভিজিৎকে কিছু করার আগেই সম্রাট তড়িৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

আমাদের স্তম্ভিত চোখের সামনে দুই প্রচণ্ড শক্তি উন্মত্তের মতো সংঘর্ষে লিপ্ত হল। সম্রাট বলশালী, তার উপর বয়সে যুবক। কিন্তু প্রোফেসর উন্মাদ। তাঁর শক্তি উন্মত্তের শক্তি। সে কী আশ্চর্য মূর্তি তাঁর! চোখ দুটো বনবন করে ঘুরছে। মুখে ফেনা কাটছে। সম্রাটের সঙ্গে যুঝতে যুঝতেই অভিজিতের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালিগালাজ বর্ষণ করে যাচ্ছেন। তার কিছু বাংলায়, কিছু সম্ভবত উর্দুতে। সম্রাট তাকে কিছুতেই বাগে আনাতে পারছে না। কী অদ্ভুত কৌশলে বারবার তার কবল এড়িয়ে বেরিয়ে আসছেন।

আমরা বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে এখন কী করা উচিত। কেমন যেন হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে দুই মহাশক্তির প্রাণপণ যুদ্ধ দেখছি। কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারছে না। দুজনেই সমস্ত শক্তি দিয়ে একে অপরকে হারানোর চেষ্টা করছে। কখনো সম্রাট প্রোফেসরের ঘাড়ে চেপে বসছে তো কখনো প্রোফেসর সম্রাটকে ধরাশায়ী করছেন।

—'দাসবাবু!...কী করছেন!...' সম্রাট হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

দাসবাবুও তখন হাঁ করে এই যুদ্ধ দেখছিলেন। একজন প্রবীণ আর একজন নবীন যে এরকম মরণপণ যুদ্ধ করতে পারে তা সম্ভবত তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। বিশেষ করে একজন বৃদ্ধ যে একজন যুবককে এভাবে নাকানি চোবানি খাওয়াতে পারেন তা শুধু তার কেন, আমাদেরও বুদ্ধির বাইরে।

সম্রাট তার মুখ দেখেই সম্ভবত বুঝতে পেরেছে যে তাকে দিয়ে কিছু হবে না। সে সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে—প্রোফেসারকে মেঝেতে ঠেসে ধরল। কেউ আর কিছু বোঝার আগেই চোখের নিমেষে হাতের টর্চটা দিয়ে সপাটে ঘাড়ে এক বাড়ি।

—'আঃ।'

কৌশিক রুদ্র অস্ফুটে কাতরোক্তিটাই শুধু করতে পারলেন।

—'প্রোফেসর রুদ্র!...প্রোফেসর রুদ্র।'

—'কে প্রোফেসর রুদ্র?'

—'আপনি।'

—'আমি সুলতান কুলি কুতুবশাহ্।'

'না, আপনি প্রোফেসর কৌশিক রুদ্র। মনে করার চেষ্টা করুন স্যার। আপনি কলেজে পড়াতেন আর আমি...।'

—'তুই কে?'

—'আমি আপনার ছাত্র স্যার। আমি বিদ্যুৎ, মনে পড়ে? আমি আপনার প্রিয় ছাত্র ছিলাম। আপনি বলতেন, "আমার বিদ্যুৎ একদিন আকাশ আলো করবে।" স্যার...?'

—'তুই আমায় মারবি?'

—'কেন মারব স্যার? আমি আপনাকে নিতে এসেছি। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি। কলকাতাকে মনে পড়ে?'

—'কোথায় নিয়ে যাবি?'

—'আপনার বাড়িতে। দমদমে আপনার বাড়ি আছে। আমরা সে বাড়িতে কতবার গেছি। খাওয়া দাওয়া করেছি, হই হুল্লোড় করেছি। আপনার বইয়ের তাক ঘেঁটে ঘেঁটে তছনছ করেছি...।'

—'খুন করিসনি, খুন? কোতল করিসনি? তবে আমায় পেছন দিক দিয়ে মারল কে?

—'স্যার, কেউ আপনাকে মারেনি। এই দেখুন...আপনি জলজ্যান্ত বেঁচে আছেন। আপনার কিছু হয়নি। আমি আপনাকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি।'

—'তুই কে?'

—'আমি আপনার ছাত্র স্যার।'

—'তোর তলওয়ার কই?'

—'আমার তলওয়ার নেই।'

—'আমি কে?'

—'আপনি প্রোফেসর রুদ্র। কৌশিক রুদ্র।'

—'না। আমি সুলতান কুলি।'

—'না স্যার; আপনিই কৌশিক রুদ্র।'

প্রোফেসর রুদ্র অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন—'আমি কৌশিক রুদ্র?'

—'হ্যাঁ। আপনি কৌশিক রুদ্র।'—

—'তবে সুলতান কুলি কে?'

—'সুলতান কুলি নেই। তিনি বহুদিন আগে মারা গেছেন।'

—'তবে আমি কে? ...আমি কে? ....আমি কে?...'

অভিজিতের কথা

বুড়োটাকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

কাল রাত থেকে আজ সকাল—বারো ঘণ্টাও হয়নি, এর মধ্যেই মালটা আমায় জ্বালিয়ে খাচ্ছে। কোথাকার কে এক জামশেদ, কোন্‌কালে সে মরে ভূত হয়ে গেছে তার ঠিক নেই, সেই ব্যাটাকে এনে খালি ঘাড়ে চাপাচ্ছে। আর ফিসফিস করে বকছে—'জামশেদ...তুই জামশেদ!'

বয় একটু আগেই দু কাপ কফি রেখে গিয়েছে। যখন দিয়ে গিয়েছিল তখন কাপ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছিল। এখন সে ধোঁয়াও নেই, সে গরমিও নেই। গরম কফি জুড়িয়ে শরবত হয়ে গেল অথচ পাবলিকটার খাওয়ার কোনো চেষ্টাই দেখা যাচ্ছে না।

বাধ্য হয়ে মুখ থেকে দু-চারটে বাক্যি খসাতেই হল। কাল ভিজেছি। তার আফটার শকে আজ গলা চিড়বিড়ে। ঠিক যেন গলার ভিতরে আস্ত একটা সজারু ঢুকে পড়ে মজারু দেখছে। নাকটাও কেমন সুল সুল করছে। চোখের সামনেই গরম কফি উথলে উথলে পড়ে মল্লিকা শেরাওয়াতের মতো ডাকছে। অথচ মুখে দেওয়ার জো নেই। যখনই ভাবছি 'ধুত্তোর' বলে পেটে চালান করেই দিই, ততবারই ভিতরের সেন্টুটা কচ্ছপের মতো লাফ মেরে উঠছে। সামনে একটা বুড়ো হাঁড়িচাচা জুলজুল করে তাকিয়ে। কাল রাতে সে কিছু গিলেছে কিনা কে জানে! তাকে না দিয়ে খাই কী করে?

—'কফি'?

ব্যাটা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ খাবে না।

কাঁট জ্বলে গেল! কী তেঁতেঁটে বুড়ো রে বাবা! আমাকে কি 'রসিকনাগর' পেয়েছে যে তার পায়ে ধরে গোঁসাঘর থেকে বের করে মুখে কিছু তোলাব!

আবার তাকাচ্ছে দেখো। অসহ্য!

সম্রাটকেও ভগবান আক্কেল দিয়েছেন বটে। এই উৎপাত আর কারো ঘাড়ে চাপানো গেল না! খুঁজে পেতে শেষে এই শর্মা! অভিজিৎ একখানা ঘর একাই দখল করে নবাব হয়ে বসে আছে—ওটার গলাতেই ঝোলা। এবার দ্যাখ শালা, কেমন লাগে।

—'কফি?'

মুখটা আবার সুচিত্রা সেনের মতো পঁচাত্তর ডিগ্রি কোণে ঘুরে গেল।

ধু-স্ শালা! ভদ্রতার ভাইপো হয়েছে!

—'জামশেদ!'

সবে কফির কাপে একটা চুমুক মেরেছি অমনি আবার সেই ফাটা গ্রামাফোন। এ তো আচ্ছা জ্বালা হয়েছে! মাকড়াটা নিজের বাপের দেওয়া নামটাই ভুলিয়ে দেওয়ার কল করছে নাকি। শেষ পর্যন্ত একটা বিশ্বাসঘাতক খুনির নাম! ছ্যা...ছ্যা...ছ্যা...। অভিজিৎ, তোর থুথু ফেলে ডুবে মরা উচিত।

কোনোমতে মুখ বুজে কফিতে চুমুক দিচ্ছি। মাথা একেবারে দুর্বাসামুনি হয়ে উঠেছে। মুখ এখন মুখ নয়।—প্যান্ডোরার বাক্স! খুললেই তেড়ে খিস্তি বেরোবে।

—'তুই আমায় মারবি?'

কটমট করে তাকালাম। এতক্ষণ পর্যন্ত মারার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু যা শুরু করেছে তাতে আর কতক্ষণ গান্ধীজি হয়ে বসে থাকতে পারব সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

লোকটার সাথে থেকে থেকে এমনিতেই হাড় ভাজা ভাজা হওয়ার উপক্রম। তার উপর কাটা ঘাটে নুনের ছিটে দেওয়ার জন্য অর্ক তো আছেই। একটু বেলার দিকে সে ভাজা পাঁপড়ের মতো ব্যাজার মুখে এসে হাজির হল।

—'হ্যাঁ রে, খেয়েছেন?' ওরও দেখলাম চিন্তার চোটে রাতের ঘুম উড়েছে। এতই যখন চিন্তা তখন নিজেই পাহারা দে না! আমার ঘাড়ে চাপিয়েছিস কেন?

—'নাঃ।'

—'কিচ্ছু না?'

—'কিচ্ছু না।'

—'তুই খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিলি?'

আশ্চর্য তো। এতক্ষণ ধরে কি তবে বাঁশি বাজাচ্ছি! লোকটা না খেলে আমি কী করব? আমি তো তার হয়ে খাবার মুখে পুরে, চিবিয়ে, গিলে, হজম করে দিতে পারি না।

—'চেষ্টা করছি।' কোনোমতে শান্তভাবে বললাম—'কিছুতেই খাচ্ছে না।'

—'খাচ্ছে না!' ও কেমন করে যেন তাকাচ্ছে—'কেন?'

—'জানি না। তবে হাত পা বেঁধে রেখেছি বলে চটেছে বোধহয়। বুড়োর জেদ আছে ষোলো আনা।'

—'খুলে দিয়ে দেখবি?'

—'পাগল না ব্ল্যাকহোল?'

—'তবে কী হবে?'

—'কী আর হবে? এখন না খেলে পরে খাবে। মুখের সামনে খাবার তো রইলই। পেটে ছুঁচোর রেস লাগলে ঠিকই খাবে।'

—'বলছিস?'

—'বলছি।'

অর্ক এবার একটু নিশ্চিন্ত হল। চিরকালই টেনশন কুমার হয়ে বসে থাকা ওর এক বদ অভ্যেস। কোনো কিছু গড়বড় হলেই ঘাবড়ু ঘাবড়ু গলায়—'হ্যাঁ-রে। তা হলে কী হ-বে?' বলাই ওর নিয়ম। অথচ নিজেকে একরকম কুবলাই খাঁ ভাবতেও ভালোবাসে। যেটা বলবে সেটাই ঠিক। ওর চেয়ে ঠিক কথা যে বলবে সে যেন এখনো জন্মায়নি।

—'তিস্তা কী করছে রে? অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।' বুড়োর কথা নিয়ে কচকচি আর ভালো লাগছে না। প্রসঙ্গ পালটে ফেলেছি।

—'ওরা তো মার্কেটিং করতে গেল।'

—'ওরা মানে? কারা?'

—'মেয়েরা। এখানে "পত্থর গদ্দি" বলে একটা মার্কেট আছে। ওখানে মুক্তোর গয়না আর হায়দরাবাদি সিল্ক সস্তায় পাওয়া যায়। যেতে চাইল। আমি বারণ করলাম না।'

—'একা গেল?'

—'নাঃ, শিবাকুমারণ আর সম্রাটও গেছে।'

সম্রাট তো যাবেই! সীতাবনে 'অশোক' সেজে থাকা তো একমাত্র ওকেই

মানায়। অর্ক যে ওকে এনে কী ভুল করছে তা ওর মালুম নেই। আমার কথা তো কানে তোলার প্রয়োজনই বোধ করে না। অথচ কাল রাত আড়াইটেতে সম্রাট যে অন্ধকার করিডোরে দাঁড়িয়ে বন্দনাকে আকণ্ঠ চুমু খাচ্ছিল সে খবর কে রাখে!

আমি রাখি। কারণ আমাকে কাল বুড়োর 'জামশেদে'র ঠ্যালায় ঘর ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। করিডোরে একটু হাওয়া সেবন করতে গিয়ে দেখি এই কাণ্ড! অন্ধকার করিডোরে মদনাগুন জ্বলছে। ঘন নিঃশ্বাসের তালে তালে সম্রাট বন্দনাকে পাগলের মতো চুমু খাচ্ছে আর বলছে— 'বলো...বলো... সত্যিই আমায় ভালোবাসো...বলো আর একবার...।'

চুমু খাওয়ার চোটে চোখে একেবারে সর্ষেফুল। সেই সর্ষেফুলের মধ্যে যে একটা ধুতরো কাঁটা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তা যেন চোখেই পড়ল না।

সম্রাটের ভালোবাসা; শালা ভদ্দুকের জ্বর! ওর প্রেমে পড়ার চেয়ে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে পটল তোলা অনেক ভালো! কলেজ লাইফ থেকেই তো দেখে আসছি। মেয়েদের বিছানায় টেনে নিয়ে যেতে ও একেবারে মহাগুরু পাবলিক। আর ওখানেই 'The end'—ইতি সম্রাট! সুন্দরীদেরও একেবারে ব্রন্টোসোরাসের বুদ্ধি। এ ছেলেটার দিকেই একেবারে পতঙ্গের মতো ছুটে আসতে থাকে। ওদের আর দোষ কী? ভগবান ওদের পার্সেলটা হ্যাবক বানিয়ে ভেতরে জিনিস পুরতে ভুলেই মেরেছেন।

কিন্তু সে কথা ফাঁস করব কার কাছে? অর্ককে কিছু বলতে গেলেই সে মনে করিয়ে দেবে যে ওই লোকটাই আমার আজকের উন্নতির খুঁটি। এবং সবশেষে এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ—'উপকারীর উপকার কদাপি ভুলিয়া মারিও না।' মালটা তো মানুষ নয়। হাত পা ওয়ালা চলমান 'ঈশপের গল্প'। তার চেয়ে যে যা ইচ্ছে করুক। আমিই বা বলে মন্দ হতে যাই কেন? আমার কী?

—'জামশেদ!...তুই জামশেদ!...তুই জামশেদ!...

দাঁতে দাঁত পিষলাম। অসহ্য এই বুড়োটার ঢ্যামনামি। ব্যাটা নিজে একটা সানকি। অন্যদেরও সানকি বানানোর মতলব। যত চেষ্টা করছি মাথা ঠান্ডা রাখার ততই জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

সারা সকাল পেটে কিল মেরে বসে থাকার পর, অবশেষে দুপুরবেলায় বুড়ো ঘুঘু হাম করলেন।

কেতাখ করলেন। তিনি তো আর ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরের হেঁজিপেঁজি প্রোফেসর কৌশিক রুদ্র নন যে আমাদের মতন নোকর চাকরদের হাতে খাবেন। তার জন্য সোনার থালা চাই। সুগন্ধি বিরিয়ানি আর গোরুর ঠ্যাঙের ঝোল চাই। প্রথম গ্রাস মুখে পোরার সাথে সাথেই গ্রাম্ করে তোপ দাগা চাই। এতকিছু কাঠখড় পোড়ানোর পর তবেই না তিনি খাবেন। নয়তো রাজকীয় ফাটুস যে ফটাস হয়ে যায়! নৌটঙ্কি...শা-লা!

'খাওয়ার বহরটা দেখেছিস অভি!' চেয়ারের উপর কচ্ছপের মতো হাত-পা এলিয়ে বসেছিল তিস্তা। এতক্ষণ হাঁ করে বুড়োর খাওয়া দেখছিল। ভাবছিলাম মন্তব্যটা কখন করবে। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে বলেই ফেলল।

দেখিনি আবার! অমন রোগা ছ্যাংলা পড়া 'শুষ্কং কাষ্ঠং' শরীরে যে কুয়োর মতো একটা পেট থাকতে পারে তা কি আর কেন্দ্রীয় সরকার ভাবতে পেরেছিল? ভাবলে এতদিনে নিশ্চয়ই খাওয়ার উপরেও ট্যাক্স বসিয়ে দিত। প্রায় দুই প্লেট বিরিয়ানি, দেড় কেজি মাংস, চারটে সিদ্ধ ডিম, তন্দুর, কয়েকরকম কাবাব—মুহূর্তের মধ্যে সাবাড়। পেটের হিসির ব্লাডার চেপে যেভাবে রুদ্ধশ্বাসে দেখছিলাম তাতে বুড়োর খাওয়া দেখছি না পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দেখছি তা বোঝাই দায় হয়ে উঠেছিল।

—'পেট ছেড়ে না দেয়!' অর্ক, সম্রাট আর বিদ্যুৎ মুখার্জির কান বাঁচিয়ে যথাসম্ভব ফিসফিস করে বললাম—'ঠ্যালার নাম বাবাজিটা তখন টের পাবে।'

—'কে আবার টের পাবে। টের পেলে তো তুই পাবি!' তিস্তা হাসল।

তাই তো! একথাটা তো আগে মটকায় আসেনি। তাই ভাবি, এত আহ্লাদ করে বুড়োটার গলায় মুর্গমুসল্লম ঠাসছে কেন? দায় তো আর কারো নয়—এ শর্মারই। আদর করে খাওয়াবে ওরা, আর পেছনে পাতলা হলে ভিখিরির বাচ্চা অভিজিৎ প্লাস্টিক নিয়ে হাজির।

সারামুখে মাংসের ঝোলে হলুদ। বিরিয়ানি আর লালায় মাখামাখি দাড়ি। খাওয়া শেষ করে ঘুঘুটা উঠে দাঁড়াল। স্মৃতি হিসাবে পড়ে থাকল গুচ্ছ হাড় আর গোটাকতক টেকুর।

—'অভিজিৎ' সম্রাট এঁটো থালা, বাটি, গ্লাস গোছাতে গোছাতে বলল, 'ওঁকে একটু টয়লেটে নিয়ে যাবি প্লিজ?'

—'কেন?' অজান্তেই গলায় তেজালো সুর চলে এসেছে—'ছুচু করিয়ে

দিতে হবে?'

—'ইশ্‌শ্‌শ্‌...।' তিস্তা হেসে ফেলে—'কী যে বলিস।'

সম্রাট স্থির দৃষ্টিতে তাকাল—'ঠিক আছে...আমি দেখছি।' তারপর হাতের বাসনগুলো তিস্তার হাতে চালান করে দিয়ে বলল—'এগুলো দামি বাসন। আপাতত আপনার কাছে রাখুন। হাতছাড়া করবেন না যেন।'

—'কেন? এ ঘরে রাখলে কি আমি ঝেড়ে দেব?'

—'আমি সেকথা বলিনি অভিজিৎ।'

—'তবে তুই কী বলছিস? পরিষ্কার করে বল।'

—'পরিষ্কার করেই বলছি।' সম্রাট বাজখাঁই গলায় বলল—'আমি ওঁর মুখ ধুয়ে দিতে বলছিলাম এই পর্যন্তই। সকাল থেকে ছোটাছুটি যা করার তা তো আমরাই করেছি। তোকে কিছু করতে হয়নি। সেইজন্যই ভাবলাম এই ছোট্ট কাজটা করতে বললে হয়তো তুই কিছু মনে করবি না।'

—'তুই ভেবে নিলি! তুই নিজে নিজেই ভেবে নিলি যে আমি কিছু মনে করব না। সবচেয়ে নোংরা কাজটা আমার ঘাড়ে চাপাবি তা-ও আমি কিছু মনে করব না! পেয়েছিস কি আমায়?'

—'আঃ...অভিজিৎ!' অর্ক যথারীতি রেফারি হয়ে মাঠে নেমে পড়ছে। হাতে শান্তির জলের ঘটি। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ন্যা-কা!

—'তুই চুপ কর অর্ক।' আমার আগেই সম্রাট ওকে থামিয়ে দিয়েছে—'আই থিঙ্ক অভি নিড্‌স্ আ ফেয়ার ডিস্‌কাশান। ওকে বলতে দে। প্রোফেসর, আপনি যদি একটু...।'

প্রোফেসর মুখার্জি ইশারাটা বুঝে উঠে দাঁড়ালেন—'আমি প্রোফেসর রুদ্রকে দেখছি, তোমরা কথা বলো।'

তিনি কৌশিক রুদ্রকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলেন।

—'নাউ অভি।' সে বলল—'তোর প্রবলেমটা কী একটু খোলসা করে বলবি?'

—'ইয়েস অফকোর্স। আমার প্রবলেম তুই। তোর অ্যাটিচিউড আমার ভালো লাগছে না।'

—'মানে?'

—'মানেটা তুই নিজে জানিস সম্রাট। সবসময় আমায় ব্যাকফুটে ঠেলছিস। তুই রূপে কার্তিক, গুণে গন্ধর্ব, দুনিয়ার সবকিছু ভালো তোরই

আছে। আমরা যেন ফুটপাথ থেকে উঠে এসেছি। তোর সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্সের ঠ্যালা আমার আর সহ্য হচ্ছে না। আই অ্যাম সিক্ অফ্ ইট...সিক্ অফ্ ইট।'

—'ইজ দ্যাট সো? দেন আই অ্যাম সরি। কিন্তু ব্যাপারটা তো উলটোও হতে পারে?'

ভেবে পেলাম না কী বলব। ও যে আমায় দেওয়ালে ঠেসে ধরেছে তা ওর ঠান্ডা গলাই বলে দিচ্ছিল।

—'তুই নিজেই ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভুগছিস অভি। আমি তোর সমস্যা নই। তোর সমস্যা তুই নিজেই।'

—'সম্রাট...প্লিজ...।' অর্ককে আবার থামিয়ে দিল সম্রাট—'কিছুক্ষণের জন্য চুপ থাক অর্ক, নাউ কাম অন, অভি স্পিক আউট। তুই মনে মনে আমায় ঈর্ষা করিস কিনা?'

—'আদৌ না। প্রশ্নই ওঠে না।'

—'তবে? তবে তোর কী প্রবলেম?'

—'প্রবলেম!...প্রবলেম তোর নেগলিজেন্স। তুই আমায় মানুষ বলে গণ্যই করিস না। দয়ার পাত্র ভাবিস। কেন? আমি কি খোঁড়া না নুলো? তোর দয়ায় আমি বেঁচে আছি?'

—'আমি তোকে দয়া করিনি অভি। হেল্প করেছি মাত্র। তা-ও অনেকদিন আগে। সেই মান্ধাতা আমলের পচা হিস্ট্রি তুই এখনো ঘাড়ে করে বয়ে চলেছিস। আমরা কেউ তোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিইনি।'

—'চাপিয়ে দিসনি! প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি সেকেন্ডে, তুই আমায় মনে করিয়ে দিসনি তোর দয়ার কথা? আমায় সবসময় তোর সামনে জোড়হাত করে থাকতে হয়? কেন? কেন? কেন তোর ভয়ে আমি জুজু হয়ে থাকব!

—'সেটা তোর ব্যাপার অভি। তোকে কেউ জোড়হাত করে থাকতে বলেনি। আমি অন্তত বলিনি।'

বলতে বলতেই সম্রাট হেসে ফেলল—'এটা তোর দোষ নয় অভি। এটা তোর ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রবলেম। তুই অনেক উপরে উঠেছিস। কিন্তু টিপিক্যাল মিড্‌ল্‌ক্লাস সেন্টিমেন্টগুলো তোর পেছন ছাড়েনি।'

এতক্ষণ ওই আমায় একতরফা মেরে যাচ্ছিল। এইবার আমিও একটা মোক্ষম মার দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি—'ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা কী

বলছিস রে? ফ্যামিলি কাকে বলে বুঝিস কিছু? শা-লা বাপের ঠিক নেই—আবার ফ্যামি-লি! কী ভাবিস তুই? আমি কিছু জানি না।'

—'অভিজিৎ।' অর্ক গর্জন করে উঠেছে—'কী বলছিস তুই? শাট্-আপ... আই সে শাট্-আপ...।'

কথাটা যে না বললেই ভালো হত এই সুবুদ্ধিটা চিরকালই লেটলতিফ। একটু আগে মাথায় এলে কী ক্ষতিটা হত! কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এক মুহূর্তে সম্রাটের মুখের সমস্ত রক্ত নেমে গেল। সারা শরীর কাঁপছে। তার ভিতরে ভয়ানক কিছু একটা ঘটছে, অতিকষ্টে টিস্যু পেপারের মতো সাদা ঠোঁট নেড়ে বলল—'ইয়েস্...ইয়েস্...ইউ আর রাইট...ইউ আর রাইট...আই অ্যাম আ বাস্টার্ড...আ ব্লাডি বাস্টার্ড...।'

—'সম্রাট...সম্রাট...।' অর্ক দাঁতে দাঁত চেপে বলল—'এই কথাটা বলার কী দরকার ছিল যখন সব জানিস-ই। ইউ আর সাচ আ ইডিয়ট অভি।'

সম্রাট ততক্ষণে ভূতে-পাওয়া-মানুষের মতো পিছন ফিরে করিডোর ধরে হাঁটা লাগিয়েছে। তার পেছন পেছন ব্যাকুলভাবে দৌড়ল অর্ক—'সম্রাট... সম্রাট,...নো...সম্রাট...লিসন...।'

পুরো ব্যাপারটা কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে খিচুড়ি হয়ে গেল। কী করতে চাইলাম—আর কী হল? ওকে সবার সামনে অসম্মান করার ইচ্ছা আমার ছিল না। একথা ঠিক যে আমি ওকে সহ্য করতে পারি না। হয়তো ঈর্ষা করি, অপদস্থ হতে দেখলে খুশিও হই। আজও তাই চেয়েছিলাম। কিন্তু তা যে বুমেরাং হয়ে আমাকেই ছিটকে অনেক নীচে ফেলে দেবে তা ভাবিনি। আমি ওকে আহত করতে পেরেছি—কিন্তু পাঞ্চটা ছিল বিলো দ্য বেল্ট।

—'ব্যাপারটা কী রে? সত্যি নাকি?' তিস্তা আমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। ওঃ, অসহ্য এই মেয়েলি কৌতূহল। তার উপর তিস্তাকে উপর-ওয়ালা কৌতূহলটা একটু বেশিই দিয়েছে। সকলের হাঁড়ির কালির খবর না জানলে ওর পেটের ভাত হজম হয় না।

—'আমার ভাট বকতে ভালো লাগছে না তিস্তা।' আমি একটু ঝাঁঝিয়েই বললাম।—'আমায় একটু একা ছেড়ে দে প্লিজ।'

ও নিরুপায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল—'ওকে...ফাইন...।'

—'এটা কী হল?'

—'জানি না।'

—'তুই সম্রাটের হিস্ট্রি জানিস?'

—'পুরোপুরি জানি না, কিন্তু জানতাম গোলমেলে কিছু আছে।'

—'তা সত্ত্বেও তুই সবার সামনে সেকথা বললি?'

—'অন্ধকারে ঢিল ছুড়েছিলাম। লেগে গেছে।'

—'শুধু লাগেনি। জোরদার লেগেছে।'

—'বেশ হয়েছে। আমার পিছনে সবসময় কাঠি দেয় কেন? বেশ হয়েছে।'

—'কী কাঠি দিয়েছে ও? তোকে কেলিয়েছে? না বিস্তি দিয়েছে?'

—'জানি না।'

—'কী কাঠি দিয়েছে তা-ও জানিস না! তবে বলতে গেলি কেন?'

—'বেশ করেছি। আমি ওকে দুচক্ষে দেখতে পারি না।'

—'কেন পারিস না!'

—'ও কেমন যেন উদ্ধত। সবসময় নিজেকে সবার চেয়ে আলাদা প্রমাণ করতে চায়।'

—'যেমন?'

—'যেমন সবসময় চুপচাপ থাকে, বেশি কথা বলে না, ইন্ট্রোভার্ট।'

—'ইন্ট্রোভার্ট হলেই সে উদ্ধত হল?'

—'না, তা নয়। কিন্তু ফুটানি দেখায় কেন? অন্ধ্রপ্রদেশ আসা অবধি গোছা গোছা নোট ছড়াচ্ছে।'

—'এতে গায়ে ফোসকা পড়ার কী হল? তোরও টাকা আছে। তুইও ছড়া না। বারণ কে করেছে?'

—'ওর মতো কালো টাকা আমার নেই। শালা টাকার কুমির।'

—'সে তো অর্করও নেই, প্রোফেসর মুখার্জিরও নেই, তাদের তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তবে তোর এত চুলকুনি কীসের?'

—'আমি জানি না।'

—'আসলে তোর খেজুর কোথায় জানিস? শালা কয়লাকে যত জল দিয়ে ধো, কয়লা কালোই থাকে। না-খেতে-পাওয়া অশিক্ষিত আনকালচার্ড ফ্যামিলির ছেলেকে যতই উপরে তোল না কেন, ভিতরে ভিতরে সে অশিক্ষিত, অসভ্য থাকে। সম্রাট ঠিকই বলেছে, ক্রেডিট গোজ টু ইওর

ফ্যামিলি। অ্যান্ড শিক্ষাদীক্ষা। চায়ের দোকানির ছেলেরা এটিকেট শিখবে কী করে?'

—'চোপ, মুখ সামলে কথা বলবি, নয়তো দেব এক কানের গোড়ায়। শিক্ষেদীক্ষে, এটিকেট আবার কী রে? মেয়েদের বিছানায় তোলাটাই শিক্ষে-দীক্ষে তাই না?'

—'হুম!...বুঝেছি।'

—'কী?'

—'তুই সম্রাটকে হিংসে করিস। ওর মতো তোরও ডনজুয়ান হতে ইচ্ছে করে।'

—'শাট্-আপ...।'

—'কিন্তু তোর গাট্স নেই।'

—'চুপ।'

—'তাই তোর নিজেকে মনে হয় বোকাচোদা...তাই না? হিঁ...হিঁ...হিঁ...।'

লাফ মেরে উঠে দাঁড়ালাম। মেরেই ফেলব শুয়োরটাকে!

—'অভিজিৎ।'

মেরেই ফেলব। খুন করে ফেলব!

—'অভিজিৎ।'

আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে হুঁশ ফিরে পেলাম, প্রোফেসর রুদ্রকে নিয়ে বিদ্যুৎ মুখার্জি টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

—'তুমি একা একা বসে বিড় বিড় করছ। বাদবাকিরা কোথায়?'

একা! হ্যাঁ...আমি তো একাই আছি! তবে এতক্ষণ কে কথা বলছিল আমার সঙ্গে? সেকি...সেকি আমিই!

—'ওরা চলে গেছে।'

—'চলে গেছে! কোথায় গেল?'

—'জানি না।'

প্রোফেসর মুখার্জি অবাক হয়ে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হাহা করে হেসে উঠলেন প্রোফেসর রুদ্র—'সবাই চলে গেছে...সবাই তোকে ছেড়ে চলে গেছে...সবাই তোকে ছেড়ে চলে গেছে হাঃ...হাঃ...হাঃ...'

সব কথা শুনে তিস্তা যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

—'সত্যি বলছিস?'

—'না! গজল্লা করছি! খেয়েদেয়ে তো আর কাজ নেই।'

—'শেষ পর্যন্ত বন্দনা!'

—'তাই-ই তো জানি।'

তিস্তা কেমন যেন চুপসে গেল। ওর মুখের করুণ দশা দেখে আমার পেট ফেটে হাসি পাচ্ছিল। মালটা নিজেকে হে-ভি সুন্দরী ভাবে। মুখে যতই যা বলুক না কেন, সম্রাটকে বোধহয় সুড়সুড়ি দেওয়ার তালে ছিল। ফুলুক ফালুক ঝাড়িও কম মারছিল না। কিন্তু বেচারির সম্রাটকে চিনতে এখনো দেরি আছে। ও শুধু লম্পট-ই নয়, পাঁড় লম্পট। ষোলোশো ভোল্ট নিয়ে যে খেলা করে, ৪৪০ ভোল্টের ছ্যাঁকা তো তার কাছে নস্যি।

—'কী দেখল ও বন্দনার মধ্যে!'

এইরে!—এটা কি আফসোস নাকি? কেসটা কীরে ভাই! এ তো বিলাপ শুরু হল! আবার হোসপাইপ খুলবে না তো?

—'যা দেখেছে, দেখেছে। তুই তা নিয়ে এত দিমাগ চাটছিস কেন?'

—'চাটছি মানে! করিডোরে দাঁড়িয়ে ওপেনলি চুমু খাচ্ছে, অথচ সে বিষয়ে কিছু বলা যাবে না?'

হেসে ফেললাম—'তুই তোর সাবজেক্ট আগে ক্লিয়ার কর। কোন্‌টায় তোর আপত্তি? চুমু খাওয়ায়, না বন্দনাকে খাওয়ায়?'

—'মানে?'

—'মানে চুমুটা তোকে খেলে এই আপত্তিটা করতিস কিনা।'

—'অভি...।' তিস্তার কানদুটো বিলিতি বেগুন—'কী বলছিস?'

সতীসাধ্বী! চেপে যাওয়াই ভালো। বেশি চটালেই হোসপাইপ!

—'ইয়ার্কি মারছি।'

—'এমন ইয়ার্কি ভালো লাগে না—বিশ্রী রসিকতা।'

'ছাড় না। ছেঁড়া গেছে। তুই তোর বরকে কষে চুমু খা। আর কে কোথায় কী করছে দেখার দরকার কী?'

—'যখন দরকার নেই তখন বললি কেন?'

—'কী আপদ! আমার বলার কথা, তাই বললাম।'

তিস্তা গোঁজ হয়ে বসে রইল। নাকের পাটা প্রায় গ্যাস বেলুন। হুম্।

অভিমান হয়েছে! কিন্তু কার উপর?

আজ দুপুরবেলার মেনুটা জব্বর হয়েছিল। অথচ লাঞ্চের আগের বিশ্রী ঘটনাটায় সব মাটি হল। সম্রাট বাদে সকলেই অবশ্য ডাইনিং টেবিলে উপস্থিত ছিল। পরিস্থিতি একেবারে আগ্নেয়গিরি। নিজেকে তখন একটা আকাট গোরু-চোর ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি।

—'অর্ক কোথায় রে? ঘরে আছে?'

—'মাতালটার ঘরে।'

—'ডোজ কি বেশি পড়েছে আজ?'

—'অলরেডি আউট। ব্যাপক ছড়াচ্ছে। প্রোফেসর মুখার্জি আর ও দুজনেই প্রাণপণে চেষ্টা করছে। জানি না কতক্ষণ পারবে।'

কেন জানি না—একটা চাপা কষ্ট গলার কাছে এসে গোঁত্তা মারতে লেগেছে। সেন্টু খেয়ে গেলাম না-কি? ওর জন্য কোনোদিন সহানুভূতি তো দূরের কথা, সামান্যতম ভদ্রতা দেখানোর তাগিদও অনুভব করিনি। তবে আজ নিজেকে এমন অপরাধী মনে হচ্ছে কেন? যা করেছি বেশ করেছি। সুযোগ পেলে আরো করব। কিন্তু...।

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম বুড়োটা মহানন্দে ঘুমুচ্ছে। খোলা মুখ দিয়ে লাল গড়িয়ে বালিশ একেবারে গঙ্গাদোয়াব অঞ্চল। গা গুলিয়ে উঠল। উঠে দাঁড়ালাম—'চ, সম্রাটকে একবার দেখে আসি।'

—'তুই যা, আমি যাব না।' তিস্তার চোয়াল শক্ত।

—'ঠিক আছে, তুই প্রোফেসারকে পাহারা দে। ঘুম ভাঙলে ডাকিস।'

—'তেড়ে আসে যদি?' ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে—'পাগল ছাগল লোক।'

—'সেয়ানা পাগল। সুন্দরীকে মারবে না। বরং উলটে কোলে নিয়ে আদর করতে পারে। আধপাগলের আদর অনেক খেয়েছিস, এবার ফুল-পাগলের খাবি।'

—'হুঃ' তিস্তা একটা ছোট্ট শব্দ করে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেই বেশ আরাম পেলাম। বাইরের খটখটে চাঁদিফাটা রোদটা তখন ভ্যানিশ। তার বদলে একদল কালো মেঘ কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। ঠান্ডা ঠান্ডা জোলো হাওয়ায় গা শিরশির করছে। একঝলক হাওয়ায় অপরাধবোধ কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল। হুলুম হালুম

করে পা ফেলে এগিয়ে গেলাম। ঢ্যা-ম-না-মি। দেবদাস হয়ে সবার আদর কাড়া হচ্ছে। তোর দুঃখ হয়েছে তো চুপচাপ এককোণে বসে স্যাড-সং গাইলেই পারিস! ট্যাঁড়া পিটিয়ে পাবলিকলি কাঁদাকাটা করার কী মানে! এ-ও একরকম পাবলিসিটি!

মনে মনে অনেক গরম কথা আওড়াতে আওড়াতে সম্রাটদের ঘরের দরজায় টোকা লাগালাম।

—'কে?' অর্কর কণ্ঠস্বর। অর্থাৎ ঈশপ-সমগ্রটা ভেতরেই আছে।

—'আমি অভিজিৎ।'

—'দরজা খোলাই আছে। চলে আয়।'

সেকী! কোনো খিস্তিখাস্তা নয়! কোনো উপদেশবাণী নয়! এমনকি নিষেধাজ্ঞাও নয়! একদম ডাইরেক্ট নেমন্তন্ন!

অর্কর হল কী? শরীর টরীর ঠিক আছে তো!

প্রাথমিক ঝামেলাটা কেটেছে। নরম কার্পেটের উপর সন্তর্পণে পা ফেলে ঢুকে পড়লুম। সাবধানে পা না ফেলে উপায়ও নেই। ভাঙা বোতল আর গ্লাসের ধারালো টুকরোয় কার্পেট এখন ভীষ্মের শরশয্যা। মাকড়াটা এতগুলো বোতল আর গ্লাস ভাঙল কখন!

—'সাবধানে আয়। পা কেটে যেতে পারে।'

অর্ককে এমন শান্ত আমি কখনো দেখিনি। নির্ঘাত ওর ব্লাডপ্রেশার লো হয়ে গেছে। অথবা প্রোফেসর মুখার্জির সামনে কোনো সিনক্রিয়েট করতে চায় না।

—'কেমন আছে এখন?'

—'নিজেই দেখে নে।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সম্রাটের লম্বা পা দুটোই শুধু দেখা যাচ্ছিল। পায়ে পায়ে বিছানার কাছে যেতেই গোটা শরীরটাই চোখে পড়ল। চোখ বুঁজে পড়ে আছে ব্যাটা। গায়ের শার্টটা বমিতে ভাসিয়েছে। অ-দূরেই ওটা দলামোচা পাকিয়ে পড়ে আছে। বুকের ওপর হাতদুটো জড়ো করা। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক। অল্প অল্প নড়ছে।

কী বলছে ও? আদৌ কিছু বলছে কি? নাকি আমার মুণ্ডুপাত করছে?

'তুই এসেছিস যখন তখন পাশে একটু বোস। আমি আর প্রোফেসর একটু ঘুরে আসি।'

অর্থাৎ ফুঁকতে যাবে। যাও যাও বাপু। কে বারণ করেছে?

—'জল চাইলে পাশের জার থেকে গ্লাসে ঢেলে দিস। আর বমি করলে টয়লেটে বালতি আছে। আর...।'

ব্লাঁ...ব্লাঁ...ব্লাঁ...শুরু হল জ্ঞানের নিম্নচাপ। পেয়েছে কী আমায়? গোঁফওয়ালা লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প?

—'আর কিছু প্রয়োজন হলে আমাদের ডাকিস, আমরা করিডোরেই আছি।'

—'ডাকব।'

অর্ক ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে লাইটারটা বের করে নিয়ে চলে গেল। প্রোফেসর একটু ইতস্তত করছেন। বোধহয় আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

—'প্রোফেসর—কোথায়?' বাইরে থেকে অর্কর হাঁক ভেসে এল।

—'এই যে, আসছি।'

প্রোফেসর মুখার্জিও বেরিয়ে গেলেন।

এইবার সম্রাট সাহেব! কোটিপতির বিগড়ে যাওয়া ছেলে। উদ্ধত, দাম্ভিক। চিরদিন মাথা উঁচু করে থাকাই যার স্বভাব। ঝাঁকের কইয়ের ইলিশ! কেতরে পড়ে আছিস কেন রে শালা? ন্যাকামি হচ্ছে? খুব গায়ে লেগেছে না কথাটা! দ্যাখ এবার কেমন লাগে! আমারও এমনই লাগত। যখন তুই আমার সামনে দিয়ে গাড়ি করে যেতিস তখন আমার ঝাঁট জ্বলে যেত, যখন তুই গায়ে ফ্রেঞ্চ পারফিউম মেখে মেয়েদের সাথে ঢলাঢলি করতিস তখন নিজেকে হিজড়ে মনে হত। যতবার আমার দিকে নোটের বান্ডিল এগিয়ে দিয়েছিস, ততবার মনে হয়েছে কাগজের গোছাটা তোর মুখের উপর ছুড়ে মারি। পারিনি। পারিনি কারণ তোর দেওয়ার মধ্যে একটা অদ্ভুত মাখন মাখা থাকত। সন্দেহ হত যে দয়া করছিস, কিন্তু প্রমাণ করতে পারিনি। ভীষণ ইচ্ছে করত দামি আংটি, ঘড়িতে সাজানো হাতটা একটু ছুঁয়ে দেখি। পারিনি। ভয় হত যদি অডিকোলন, গোলাপজল-ধোওয়া-হাত আমার উনুনের কয়লা ভাঙা হাতে কালো হয়ে যায়!

আমি তোর বন্ধু হতে চেয়েছিলাম। তা-ও পারিনি। সবসময় একটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে নিজেকে মুড়ে রাখতিস। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল? শালা মাল টেনে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছিস। আজ আমার হাতও ডেটলসোপে

ধোওয়া। তোকে এখন আমি ছুঁয়ে দেখতেই পারি। তোকে চড় মারতে পারি। সপাটে টেনে কয়েকটা বিরাশি সিক্কার চড়...।

—'বা...বা...বা..বা...।'

সম্রাট একটু ছটফট করে উঠছে। চোখদুটো আধখোলা। ঠোঁটদুটো আবার খুলল—'বা-বা...বা-বা...বা-বা...।'

কী বলল? বা-বা?

—'কী বলছিস?' আমি ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছি।—'কিছু চাইছিস?'

—'বা-বা...বা-বা...বা-বা...।'

—'হ্যাঁ...কী হয়েছে!' বুঝলাম ভাট বকছে। আমি যা বলব কোনোটাই ওর মাথায় ঢুকবে না। সুতরাং চুপচাপ তালে তাল মিলিয়ে যাওয়াটাই সেফ।

সম্রাট নড়বড়ে দুটো হাতে ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে। চেষ্টা করতে করতেই আচমকা টাল খেয়ে হুড়ুম করে আমার বুকে এসে পড়ল।

—'কী হয়েছে?...কিছু বলবি?'

গায়ে কড়া মদের গন্ধ ভুরভুর করছে। ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা একটা তরতাজা জোয়ান লোক প্রায় আমার ঘাড়ের উপর। চাপের চোটে পরমায়ু ফুস হয়ে যাওয়ার উপক্রম। বিরক্ত হতে পারতাম। অন্তত বিরক্ত হওয়ার সম্পূর্ণ রাইট আমার ছিল। একটা মাতাল লম্পট কোত্থেকে এসে ঘাড়ে চড়েছে—ঢ্যা-ম-না- পাবলিক...

কিন্তু পারলাম না। বিরক্ত নয়, এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। এই কি সম্রাট! সেই অহঙ্কারী লোকটা। না কি অন্য কেউ! রাজার ছেলে! না ফুটপাতের ভিখিরি! পৃথিবীর সব সুখ যার হাতের পাঞ্জায়! না সম্পর্কের ঘুড়ি যার ভোঁকাট্টা হয়ে গেছে? কোন্‌টা ঠিক? কোন্‌টা সত্যি?

সম্রাট হাঁচোড় পাঁচোড় করে আমার বুক বেয়ে কাঁধে উঠে এল। কী করতে চাইছে ও?

—'বা-বা...বা-বা...।'

—'কী হয়েছে?...কষ্ট হচ্ছে?'

—'হ্ম্ম্ম্? ...হ্ম্ম্ম্? ...হু-উ-উ-উ...।'

—'কোথায় কষ্ট হচ্ছে?'

—'বা-বা...বা-বা...।' ছোট্ট ছেলের মতো ও আমার কাঁধে মুখ ঘষছে—

'ও-রা, ...ও-রা...।'

—'হ্যাঁ...ওরা কী করেছে?'

—'ও-রা আমায় মে-রে-ছে...মে-রে-ছে...তু-মি-কোথায়?...তু-মি...এ-ই এখা-নে...এই এ-খা-নে...ব্য-থা লে-গে-ছে বা-বা...।'

টের পেলাম আমার চোখ বেয়ে গরম কিছু একটা গড়িয়ে পড়ছে।

—'আ-মা-র কে-উ নে-ই, এখা-নে আ-মা-য় কেউ ভালো-বা-সে-না... তু-মি আ-মা-য় নিয়ে চ-লো...তো-মা-র কাছে...ওরা-খা-লি মা-রে।'

—'আর মারবে না। আমি বকে দেব।'

—'ব-কে দে-বে? উঁ? উঁ?'

—'হ্যাঁ...বকে দেব।'

—'আর মা-র-বে-না?'

—'না।'

—'ঠিক?'

—'ঠিক।'

সে যেন খুব নিশ্চিন্ত হয়ে কাঁধের উপর মাথা গড়িয়ে দিল। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস শিথিল হয়ে এল। চোখ বুজে আবার ঘোরে ডুবে গেল সম্রাট।

বিকেল থেকে প্রোফেসর রুদ্র আবার বেঁকে বসলেন। এমনিতেই বুড়োটা রামবিট্‌লে। আমাকে তো মনিষ্যি বলে জ্ঞানই করে না। প্রোফেসর মুখার্জি নেহাতই শিশু। অর্ক, তিস্তারা তো সিনেই আসে না। যা একটু ভয় পায় তা ওই সম্রাটকেই। ওই বাজখাঁই গলার ধমক না খেলে ব্যাটার শান্তি হয় না। অথচ আজ তা-ও দূর অস্ত। সন্ধের দিকে সম্রাট হুঁশে ফিরেছে ঠিকই, কিন্তু দুপুরের ওভারডোজের ঠ্যালায় বিছানা থেকে মাথা তুলতেই পারছে না।

—'আমি কি কয়েদি?' গমগমে গলায় বলল বুড়ো।

ওঃ...গলাখানা জব্বর দিয়েছিলেন বটে ভগবান। শুনলেই মনে হয় আকবরি আমলে আবুল ফজল কথা বলছে!

ওদিকে প্রফেসর মুখার্জি প্রশ্নের বহরে প্রায় ভ্যাবাচ্যাকা—'আপনি বন্দি হবেন কেন স্যার? আপনাকে আমরা নিয়ে যাব।'

—'নিয়ে যাবি? কোথায় নিয়ে যাবি আমায়? গোরস্থানে! আমায় কোতল করা হবে?'

সর্বোনাশ করেছে! কোতল আবার কী গো!

—'কোতল করা হবে কেন স্যার? আপনাকে আমরা আপনার শহরে নিয়ে যাব। কলকাতায় নিয়ে যাব।'

—'আমার শহর? কোথায় আমার শহর? এটাই আমার দেশ। আমাকে বন্দি করে নির্বাসন পাঠাবি?' লোকটা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল—

—'বেওকুফ...বদ্‌তমিজ...আমার হাত খুলে দে। তারপর তোকে আমি কুত্তা দিয়ে খাওয়াব। টুকরো টুকরো করে দুর্গের দরওয়াজার সামনে ঝুলিয়ে রাখব। খুলে দে হাত...সুলতান কুলির আমল আজও খতম হয়নি...আমি... আমি...।'

—'হ্যাঁ...তোমার হাত খুলে দিই আর তুমি আমায় কেলাও।'

কথাটা যথাসম্ভব আস্তেই বলেছিলাম। কিন্তু বুড়োর যে বাদুড়ের কান তা কে জানত?

শোনামাত্রই ফোঁস করে উঠল—'জামশেদ!...বদ্‌তমিজ...আমি জানি এসব তোর সাজিশ। আমায় এভাবে বেঁধে রেখেছিস কেন? মেরে ফ্যাল... মেরে ফ্যাল...আয়, দেখি তুই কেমন মর্দ...মার আমায়।'

আবে যাঃ...যাঃ। আমার খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই যে বুড়োর সাথে হা-ডু-ডু খেলতে যাব। ভাইপোর ভাইপো হয়েছে।

—'আয়...জামশেদ...আয়...আমায় মার...।

দুচ্ছাই! জ্বালিয়ে খাচ্ছে!

—'জামশেদ...বেটা...।' প্রোফেসর রুদ্রর গলা থরথর কাঁপছে। হাত-পা বাঁধা। তা সত্ত্বেও শরীরটাকে ঘষটাতে ঘষটাতে অদ্ভুতভাবে আমার দিকে আসছেন।

—'অভিজিৎ...সাবধান! সরে যাও।'

প্রফেসর মুখার্জি আমায় চেতিয়ে দিলেন ঠিকই, কিন্তু লোকটাকে দেখে বেশ মজাও লাগছে। বুড়ো হলেও মালটার ফিজিক এখনো দেখার মতো। একসময় নির্ঘাত ঘ্যামা হ্যান্ডসাম ছিল। শক্তিশালী ছিল নিশ্চয়ই। আজ কিছুই নেই। তবু জেদটা একবার দেখো! কেমন টিকটিকির মতো হামাগুড়ি দিয়ে আসছে!

—'আমায় মেরে ফ্যাল...আমায় মেরে ফ্যাল জামশেদ...আমার আর সহন হয় না...কোথায় তোর তলওয়ার...আমার সর লে বেটা...কোতল

কর...ওই দেখ মসনদ...মসনদ তোকে ডাকছে...আয় বাপ...আয়...।' বলতে বলতেই হা হা করে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়লেন প্রোফেসর রুদ্র—'আমার ঔলাদ...জামশেদ... তুই আমার ঔলাদ...আব্বাকে এমন বেরহমভাবে বেঁধে রেখেছিস? তোর কলিজায় কি একটুও প্যায়ার—মহব্বৎ নেই রে বেটা?'

এতক্ষণ ব্যাপারটা হালকাভাবে নিচ্ছিলাম। কিন্তু এবার ব্যাপারটা কেমন হ-য-ব-র-ল ঠেকল। লোকটা কার জন্য এমনভাবে কাঁদছে! যে লোকগুলো কয়েক শতাব্দী আগেই মরে হেজে গেছে তাদের জন্য এমন পিরিত! কোথায় আজ সুলতান কুলি! কোথায় জামশেদ! কোথায়ই বা তাদের মসনদ!

—'বচপন থেকে তোকে বুকের খুন দিয়ে বড়ো করেছি...তোর তবিয়ৎ খারাপ হলে, বুখার হলে আমার আর তোর আম্মির নিন্দ হত না, শামশাহের জেগে থেকেছি, এই বুকে চড়ে কত আদর খেয়েছিস, এই হাথই তোকে কত সেফ, আঙুর খাইয়েছে...সব ভুলে গেলি বাপ! আজ এই বুকে লাথ মারছিস, বুড়া হাথে কড়া পরাচ্ছিস, জিন্দা রেখে মেরে রেখেছিস...এবার মার, আমি হায়াৎ চাই না...চাই না।'

কী বলব বুঝতে পারছিলাম না, মন্ত্রমুগ্ধের মতো বুড়ো লোকটার পাগলামি দেখা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারি? কী করে বোঝাব যে আমি জামশেদ নই, উনিও সুলতান কুলি নন?

প্রফেসর মুখার্জির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনিও ল্যাম্পপোস্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার মতো তারও প্রায় সাড়ে বিসর্গ অবস্থা।

—'কে বলেছে আপনি সুলতান কুলি?' ভাবলাম উপায় যখন নেই তখন পালটা তেড়ে যাওয়াই ভালো—'আপনি সুলতান কুলি নন। আমিও জামশেদ নই। সুলতান কুলি আর জামশেদ অনেকদিন আগেই মারা গেছে। আপনি প্রোফেসর রুদ্র! প্রোফেসর কৌশিক রুদ্র! আন্ডারস্ট্যান্ড!'

প্রোফেসর রুদ্র চোখ তুলে তাকালেন। বিকৃত বলিরেখাগুলো এবার কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক লাগল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার আমায় দেখে নিয়ে বললেন— 'বাওড়া।'

বাওড়া! পাগল! বুড়োর সাহস তো কম নয়! সবাইকে কি নিজের জ্ঞাতি পেয়েছে নাকি?

—'লিসন্!' আমারও জেদ চেপে গেল—'এটা ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ নয়, ২০০৫ সাল। আপনি সুলতান কুলি নন। আপনি প্রোফেসর রুদ্র।'

—'আমি প্রোফেসর রুদ্র?' এবার যেন বুড়ো একটু নরম হয়েছে।

—'হ্যাঁ...আপনি প্রোফেসর রুদ্র।'

—'তবে সুলতান কুলি কে?'

—'ধ্যাত্তেরি, সুলতান কুলি কেউ না...সুলতান কুলি নেই।'

—'সুলতান কুলি নেই?' প্রোফেসরের চোখে অগাধ বিস্ময়।

—'না...নেই...।'

—'নেই?'

—'নেই।'

প্রোফেসরের চোখদুটি হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠল। কাউকে যেন খুঁজতে খুঁজতে বললেন, 'আমি?...আমি কে? তবে আমি কে?'

প্রোফেসর কৌশিক রুদ্রর কথা

ওয়াক্ত-এর চেয়ে বড়ো বেইমান বোধহয় আর হয় না। কোথায় আমার সেই বেশুমার জওয়ানি আর কোথায় এই টুটাফুটা বুড়া জিসম। ওয়াক্ত আর জওয়ানি হল তবায়েফ-এর মতোই বেওয়াফার জাত। আজ এর কাছে তো কাল ওর কাছে। আজ এর বিস্তরে তো কাল ওর...

কিন্তু আমি এসব ভাবছি কেন? আমি তো কয়েদি। কয়েদিদের এত কিছু ভাবার আজাদি থাকে না। তাদের জন্য থাকে মওত। নয়তো আজীবনের সাজা। হয় ইমান, নয় গর্দন। আর এসব কিছুর মধ্যেই থাকে আর এক জাহান্নাম। মওতের ডর। এক লহমায় সারা উমরের জহর ভরে দেয়। জিন্দগি কাজার চেয়ে বদতর সাজা হয়ে যায়। কিন্তু আমি এ কিছু ভাবছি কেন? আমার কয়ামৎ তো লিখাই জামশেদের তলওয়ারে। শুধু একটাই আরজু—একবার আমার তলওয়ারটা যদি হাতে থাকত! আফসোস...আমি কয়েদি। নয়তো ওর বেইমান হাত দুটোকে কেটে ভাগাড়ে পাঠাতাম। ওই হাত...ওই হাতে আমার গর্দন নেবে, ওই শিরে ও আমার খুনে মাখা তাজ পরবে। ...তলওয়ার...একটা তলওয়ার।

—'আব্বাজান, তবিয়ৎ কেইসে হ্যায় আপকি?'

কে? কৌন! জামশেদ!...জামশেদ! ও আবার এসেছে! ও ফির এসেছে!

—'জামশেদ!'

ও আমার সামনে এসে দাঁড়াল। এই তো! জামশেদ! জামশেদই তো! জামশেদ—না কারো ছায়া! জাফরির ফাঁকে, ঝাড়বাতির কাচে এমন কত টুকরা টুকরা পরছাই আমি দেখছি। তেমনই এক টুকরা সায়া! হাতে তলওয়ার।

—'জামশেদ।'

—'হ্যাঁ...আমি।'

—'কী চাস?'

—'মসনদ, সলতানিয়ৎ চাই।'

—'পাবি না।'

তলওয়ার ঝলসে উঠল। তলওয়ার খুনের বু পেয়েছে। তলওয়ার রিশতে নাতে বোঝে না, বোঝে না বাপ-বেটার প্যায়ার। সে বোঝে খুন, খুন আর খুন...।

—'আব্বাজান...তালতানিয়ৎ।'

—'না...।'

—'মসনদ।'

—'না।'

—'সলতানিয়ৎ'

—'না...না...না...।'

তলওয়ার ঘুরল। আমার দিকে নয়। জামশেদের উপর। টুকরা টুকরা হয়ে গেল। প্রত্যেকটা টুকরা আশপাশ ছিটকে পড়েছে। একী হল! ইয়ে কেয়া হুয়া! ইতিহাস এ কথা বলে না—অসম্ভব!...নামুমকিন। জামশেদের এন্তেকাল হতে পারে না। ও দুনিয়ায় এসেছে আমায় মারার জন্য। ওকে আমি বড়ো করেছি আমাকেই কোতল করার জন্য। ও আমার জওয়ানি, কুতুবশাহী বংশের তলওয়ার নিয়ে জন্মেছে আমারই কাতিল হওয়ার জন্য। ওকে জিন্দা থাকতেই হবে। অথবা আমার হাতেই মরতে হবে আমার জিন্দা থাকার জন্য। এভাবে ও মরতে পারে না। হয় ও আমায় মারবে...নয় ও আমার হাতেই মরবে।

—'জামশেদ...জামশেদ...কোথায় লুকিয়েছিস বুজদিল। হিম্মৎ থাকে তো সামনে আয়...সামনে আয়...।'

—'সামনেই তো আছি আব্বু।'

কে বলল?

—'আব্বা হুজুর...।'

আবার? আবার কে ডাকে?

—'ইধার আব্বাজান।'

দরোদিওয়ার সে অচানক ক্রোড়ে ক্রোড়ে আওয়াজ এল—'আব্বা

হুজুর...সলতানিয়ৎ—আব্বাজান...মসনদ...আব্বা...।'

—'না...।'

—'মসনদ...আব্বা...আব্বা...মসনদ...মসনদ...মসনদ...।

আমি পালাতে চাই। আমি পালাব। কিন্তু কোথায়? কঁহা? হর টুকরা থেকে একটা করে জামশেদ বেরিয়ে এসেছে। আমায় ঘিরে দাঁড়িয়েছে—সবার হাতে তলওয়ার—সবার মুখে একই বাৎ—'আব্বাজান...মসনদ...মসনদ... আব্বাজান...।'

আমি আর কক্ষনো নামাজ পড়ব না...আর কক্ষনও না...আমায় বাঁচাও... আমি জিন্দা থাকতে চাই...আমি বেঁচে আছি। এখনো জামশেদ বেঁচে আছে, আর ওর তলওয়ারও বেঁচে আছে। আর সব মিথ্যা—আর সব ঝুট। আমায় বাঁচাও, আমি বেঁচে আছি। ...ম্যায় জিন্দা হুঁ-উ-উ-উ...।

বহোৎ অন্ধেরা। বড় ধুন্দ, ধুন্দলা আসমানের ছাতি চিরে তুফান আসছে। এ এক পাগলা তুফান। বাওড়া ঘোড়ার মতো। পাহাড়ির মাথায় নীল মেঘ থেকে রুপোলি বিজলি গুতুরখানার মাথায় চমকে চমকে উঠছে। আমার মসজিদে বাতিদান জ্বালাচ্ছে...নেভাচ্ছে...জ্বালাচ্ছে...নেভাচ্ছে। সেই মসজিদ! সেই নামাজ! সেই আজান! সেই তলওয়ার!...না ওদিকে আর নয়...আর নয়।

আমার তলওয়ার...আমার তলওয়ার কোথায় গেল? জামশেদের তলওয়ার থেকে বাঁচার লৌতা তরকিব। আমার ওয়াফাদার সিপাহী—নমকহালাল তলওয়ার। কোথায় রেখেছি সেটা?

—'প্রোফেসর...প্রোফেসর রুদ্র...।'

—'আমার তলওয়ার...আমার তলওয়ার কোথায়?'

—'এখানে আপনার তলওয়ার নেই।'

কে এটা? কে এই ব্যুবক? এটা কী পরেছে? ফিরিঙ্গির পোশাক! ফিরিঙ্গি এসেছে? আমার মুল্‌ক্ কেড়ে নেবে? আমার তলওয়ার...আমার তলওয়ার... আমার তলওয়ার কোথায়? কাফেরের গর্দন ফাঁক করে দেব...তলওয়ার কই।

—'পাগলামি করবেন না প্রোফেসর রুদ্র। তলওয়ার এখানে নেই।'

—'তুই কে?'

—'আমি বিদ্যুৎ...আপনার ছাত্র।'

মুখটা বড়ো জানা-পহচানা। কোথায় দেখেছি। ও-কে? ওকে আমি আগেও দেখেছি। ও কি আমারই ঔলাদ? আমার নজায়জ ঔলাদ? মোতিবিবি

আর আমার ঔলাদ?

—'প্রোফেসর রুদ্র...!'

সেই সুরৎ! সেই নাক, সেই ঠোঁট। ও কেন এসেছে? বদলা চায়? ও কি বদলা চায়? কচি বয়সে দাফন করে দিয়েছিলাম, সেই গুসসায় আমাকেও জিন্দা দাফন করতে চায়? আমিই তো ওর গুনাহ্‌গার, আমিই তো..।

—'বেটা।' বহুৎ খোয়াহিশ হল ওকে একটু ছুঁয়ে দেখি। আমারই ঔলাদ! কাম্‌য়াবির জোশে ওকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম! এখন এহ্‌সাস হয় যে গলতি করেছিলাম। নজায়জই হোক—ঔলাদই তো! আমারই খুন!

—'কী করছেন প্রোফেসর?' ও কয়েক কদম পিছিয়ে গেল। ডর লাগছে!...ডর লাগছে বেটা!...কোই ডর নেহি। অ-জা, আ-জা... লখ্‌ৎ-এ-জিগর। ও আরো ডর খেয়ে পালিয়ে গেল।

মোতিবিবি! দরিয়ার বুকের গুলাবি মোতির মতোই হাসিন। হীরার মতোই চমকিলা ছিল তার নিগাহেঁ। গুলিস্তাঁয় ভোরের পহেলি শবনমের মতোই তার তাজগি ঔর সাদ্‌গি। আজও তার কথা ইয়াদ হলে খুন গরম হয়। কলিজায় দর্দ ওঠে। গুম হয়ে যাওয়া রঙিন রাতগুলো আবার আসে ভিড় করে। বুড্‌ঢার জীবনে নয়া জওয়ানি আসে। কেয়া রাতেঁ থি উওহ্‌! কেয়া আদা থি উস্‌কি। মাশাআল্লা! মাশাআল্লা! আজতক আমার মনে হয় মোতি কোনো ইনসান ছিল না—হুরী ছিল—হুসন-এর মল্লিকা ছিল।

পহেলিবার ওর সাথে কোথায় মোলাকাৎ হয়েছিল? নাগিনা বাগে?... না...না দালমহলে?...নেহি...বারাদরিতে?...মসজিদে?...মহাকালী মন্দিরে...ইয়া খুদা কোথায়? কোথায়?

হাঁ...ইয়াদ এসেছে। গোলকোন্ডায় নয়। তেলেঙ্গানায় মোলাকাৎ হয়েছিল। তখন আমি তেলেঙ্গানার সুবাদার।

উসদিন গুলকাটোরায় বেগমদের সাথে আমি পানিতে গোসল করেছিলাম। তখন এই বুড্‌ঢা তাগড়াই জওয়ান ছিল। একসাথে বহোৎসারে বেগমকে খুশ করার মতো তাকৎ ছিল এই বদনে। হাথির মতো তাগৎওয়ার, পাহাড়ি ঘোড়ার মতো উঁচা, শেরের মতো সিনা কন্ধা। মজবুত লম্বা গর্দন। চিতার মতো খুবসুরত মর্দানগি। কী ছিল না?

—'হুজুর-এ-আলম।'

ছাতি অবধি পানিতে ডোবা। চারিদিক আতর, গুলাবের পাপড়ির খুশবু।

দুনিয়ার সব হুসন যেন নেমে এসেছে আমার গুলকাটোরায়। যেন খুদার রহমের অনোখা নিখার এসে পড়েছে গুলকাটোরার জলে। বেমিসাল খুবসুরতির জশন।

আমি দুচোখ ভরে এই নিখার দেখছিলাম। দেখছিলাম আর খুশ হচ্ছিলাম।

রেশমের মতো নাজুক, ফুলের পঙ্খুড়ির মতো কোমল বড়ি বেগম সাঁতার কাটতে কাটতেই আচমকা আমার বুকের উপর এসে পড়ে খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

—'হুজুর-এ-আলম, কলিজায় দর্দ হল নাকি?'

—'দর্দ তো অনেকদিনই হয়েছে বেগম সাহিবা। আপনার পহ্‌লা দিদারেই তো আফগানি চাক্কুতে দিল ছল্লি হয়ে গিয়েছে।'

—'সে দর্দ এখনো আরাম হল না হুজুর-এ-আলম? নাগিনের মতো দুই হাতে আমার গলা পেঁচিয়ে ধরলেন নাজনীন।'

—'আপনার মেহেরবানি।'

—'আচ্ছা?' একজোড়া নরম হোঁঠ বুকের উপর এসে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে উপরের দিকে।

আর রাহা গেল না। শরাব আর শবাব দুটোই সমান নাশিলা। দুটোই তাকৎওয়ার পুরুষের জন্য। দুটোই ঠোঁট বেয়ে নামে। দুটোই জিসম জ্বালায়।

—'উঁহু।' হোঁঠের উপর হাত রেখে বললেন রূপসী—'এখন নয় হুজুর...।'

—'কেন? বেগম সাহেবা নারাজ হলেন নাকি?'

—'না...থাক...।'

—'কেন?...'কেন বেগম? এভাবে কেন আমায় তক্‌লিফ দিচ্ছ! কি হয়েছে? বান্দার কি কোনো গোস্তাখি হল? আমায় বলো।' গজব হ্যায়! আমি তাজ্জব!

গহ্‌রা অভিমানে বিবির আঁখ ভরে এল—'হুজুর আমায় আর আগের মতো ভালোবাসেন না!'

—'ভালোবাসি না! আপনাকে! কে বলল?'

—'কে আবার বলবে? নতুন জওয়ানদাসী পেয়ে পুরানা বাঁদীর কথা কি কেউ মনে রাখে? ছোটি বেগমের মহলেই তো দিনরাত্ থাকেন আপনি।'

ইনশাল্লাহ্! এইজন্য এত গোঁসা!

—'তা ছাড়া তারপরেও তো আরো কতগুলো বিবি আপনার পিছে পিছে এসে ঢুকল দেখলাম। আমার কথা ইয়াদ করবেন কেন হুজুর। ইয়াদ করার সময়ই বা কোথায়?'

গুস্‌সা বড়ো মিঠি চিজ। হাসিনাকে আরো হাসিন করে। তাকে ধরে নজ্‌দিগে টেনে এনেছি। বড়ো সুন্দর লাগছে বেগমসাহেবাকে। একেবারে তাজা ফলন্ত জমিনের মতো। এখন আশ মিটিয়ে আদর না করতে পারলে সব বৃথা— 'আসমানে তো অনেক তারা আছে। কিন্তু চাঁদ তো একটাই বেগম! আর সেই চাঁদ হচ্ছেন আপনি। আমার জিন্দগির গর্দিশে চন্দা। আপনাকে ভুলি এতবড়ো জুর্‌রৎ কী বান্দার?'

—'থাক...থাক...আর মিঠিমিঠি বাত-এ বাঁদীকে ভোলাবেন না হুজুর, বহুৎ হয়েছে। আমার ঔলাদ নেই তাই এত অবহেলা। এত সিতম তাই না? আম সব বুঝি।'

—'ঔলাদ! সন্তান! বুক ভেঙে জোর নিঃশ্বাস পড়ল। একটা নান্না জান। তার বড়ো মায়া। বড়ো টান! কত বরস কেটে গেল আজও আমি 'আব্বাজান' ডাক শুনলাম না। খুদা গাওয়াহ্ ওই ডাকের জন্য আমি তরস গেছি। আল্লা যে কবে রহম করবেন কে জানে!

—'বেগমসাহিবা। এ তোমার গলৎফ্যায়মি। ঔলাদ নেই সেটা আমার পিছ্‌লা জনমের গুনাহ-এর ফল। এতে তোমার কোনো গল্‌তি নেই।'

—'সচ বাত বলুন, হুজুর-এ-আলম। ঔলাদের জন্য আপনার দুঃখ নেই? কোনো তকলিফ নেই!'

—'সে তো তোমারও আছে বেগম। আমার দুঃখের চেয়েও জ্যায়দা চিন্তা হয়। এত বড়ো সুবা ও জায়গিরের দায়িত্ব কাকে দিয়ে যাব? কে সামলাবে আমার কাজার পর...?'

মুখের উপর হাত এসে পড়ল।

—'মওতের কথা বলবেন না হুজুর, ডর লাগে।' দু চোখ জলে ভরে এসেছে বেগমসাহেবার—'আপনাকে ছাড়া আমাদের কী হবে? এ কথা শুনলে আমাদের কেমন লাগে সেকথা ভেবেছেন কভি? আর কখনো ইয়ে বাৎ জুবানে আনবেন না।'

—'আনব না বেগমসাহেবা। কিন্তু আমাকে কি এভাবেই দাঁড় করিয়ে

রাখবেন? ক্লান্ত মুসাফিরের প্যায়াস কি বুঝবে না?'

—'বুঝবে হুজুর-এ-আলাম।' নরম ঠোঁট জোড়া অল্প উঁচু করে দাওয়াৎ জানালেন বেগম।

ঔরৎ—মর্দের সবচেয়ে বড়ো কমজোরি। বেগমের নরম শরীরে ডুবতে ডুবতেই মনে হল এই আমার জন্নৎ। এই আমার বেহেস্ত। তলওয়ার নয়—জঙ্গ নয়—তখ্‌ত-মসনদ-তাজ নয়। বেগমসাহেবার আগোশ মেঁ আমি কোথায় ভেসে যাচ্ছিলাম। কীসের একটা নশা খুঁদ করে ফেলেছিল আমাকে—কুতুবশাহী বংসের চিরাগ সুলতান কুলিকে।...

তখনো কি আমি জানতাম যে জেনানার প্যায়ার আর শিসার ইমারৎ একই!

—'কী হচ্ছেটা কী!...পাগলামিরও একটা সীমা আছে।'

এক হাট্টাকাট্টা আদমি মুঝে জবরদস্তি ধকেল দিয়া—'বসুন...ওইখানে গিয়ে বসুন...।'

কৌন হ্যায় ইয়েহ্! বাৎ করনে কা তমিজ তক নেহি! জামশেদ কা জহ্‌লাদ! কোতোয়াল। কোতোয়াল দিখনে মে ইৎনা খুব সুরৎ হোতা হ্যায় ক্যায়া? অথচ আদব সে পেশ হতেও জানে না। ম্যায় কোই অ্যয়রাগ্যায়রা আদমি তো হুঁ নেহি কে যো মন্‌মে আসবে তাই করবে। শাহী কয়েদীরাও কম্‌সে কম একটা ইজ্জৎ পায়! ও কী ভেবেছে আমায়? ভিখারি?

—'আর একটা কথা বললেই মারব'। লাল লাল আঁখ করে সে বলল—'সবক্ষণ বেটা...বেটা...আর বেটা! কেন? এ ছাড়া কি আর কোনো কথা নেই?'

না...নেই। তাতে এ আদমি এত গুস্‌সা করে কেন? ওর মনিবকে বলছি বলে এত গুস্‌সা!

—'ফির ক্যায়া বোলুঁ!'

—'অন্য কথা বলুন।'

—'ক্যায়া বোলুঁ?'

—'অন্য যে-কোনো কথা! এছাড়া কি আর কোনো কথা নেই?'

—'হ্যায় না, বহুৎ সারি কাহানিয়াঁ হ্যায়। বচপনে শুনেছিলাম। বলব?'

সে এবার কুছ নরমি সে বলল—'বলুন'।

—'তো ফির সুনো। এক জঙ্গল মে এক শের থা। উস্কা দো বেটা থা।

একদিন শের কো বহুৎ ভুখ লাগা। খানে কো কুছ থা নেহি। জঙ্গল মে কুছ মিলা ভি নেহি। তব বেশরম এক বেটা কো মার কর খা গয়া...। উয়ো বাচ্চা কি দর্দভরি চিখ কোই নেহি সুনি...।'

—'আঃ...আবার আপনি শুরু করেছেন!' সে খাপ্পা হয়ে বলল—'এ গল্প থামান এক্ষুনি।'

আমি ঝরোখার কাচে হাত রেখে বললাম—'কিউঁ? ক্যায়া খারাবি হ্যায় ইন্‌মে?'

—'আমার ভালো লাগছে না।'

—'ঠিক হ্যায় তো ফির দুস্‌রা সুনো।'

ও কুছ পল সোচ কর বলল—'বলুন।'

—'এক জঙ্গল মে এক শের থা। উসকো এক বেটা থা। আব্বা শের বুড্ঢা হো চুকা থা। একবার জঙ্গল মে বারিশকা মৌসম আয়া। খানে কো কুছ মিলা নহি। হিরণ ভি গুফা কি অন্দর ছুপ গয়া। বুড্ঢা শের মে শিকার করনে কা তাকৎ নেহি থা। হাড্ডি চাবানে কে লিয়ে দাঁত নেহি রাহা। নোছনে কে লিয়ে নাখুন্‌ভি নেহি রাহা। জওয়ান শের কো শিকার নেহি মিলা। ইসিলিয়ে বেওকুফ আপনি আব্বাজানকে মার কর খা গয়া।'

—'ওঃ...।' ও নারাজ হয়ে বলল—'আবার সেই এক কথা। এছাড়া কি আপনি আর কিছু জানেন না?'

—'জানতা হুঁ।'

—'কী জানেন?'

—'বহুৎ সারি পরছাঁই। দিওয়ার সে গিরগিট কি তরাহ রেংতো হুয়া আ রহা হ্যায়। হাথ মে তলওয়ার।'

—'আবার...। কিচ্ছু বলতে হবে না আপনাকে চুপ করে বসে থাকুন।'

—'কিউঁ? বুরা লাগা?'

ও মেরা ঔর দেখছে। দাঁত সে দাঁত পিষছে। গুস্‌সা হয়েছে।

—'না।'

—'তো ফির ওর এক সুনাউঁ।'

—'একদম না। চুপ।'

—'নেহি...সির্ফ এক...সির্ফ এক...।'

উয়ো মেরা করিব এল। পাস বসল—'এছাড়া আর কিছু আপনার জানা

নেই—না?'

—'ক্যায়া?'

—'মারপিট, রক্ত, তলোয়ার, খুন—এ ছাড়া?'

—'নেহি।'

—'আচ্ছা...আপনার আর কিছু মনে পড়ে না? আপনি যে কলেজে পড়াতেন, আপনার ছাত্রছাত্রীদের কথা মনে পড়ে না?'

—'কালেজ? উয়ো হ্যায় ক্যায়া ভলা?'

—'আপনি ছাত্রছাত্রীদের খুব ভালোবাসতেন শুনেছি। তাদের সাথে আড্ডা মারতেন। দরকারে এগিয়ে আসতেন।'

—'ফির?'

—'আপনি প্রোফেসর মুখার্জির পরীক্ষার টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন। বই কিনে দিয়েছিলেন। উনি তো 'প্রফেসর রুদ্র' বলতে অজ্ঞান। আপনাকে খুব ভালোবাসেন। আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই তো এসেছেন। যাবেন না?'

—'কাঁহা?'

—'কলকাতায়। যেখানে আপনার বাড়ি আছে। আপনার সব আছে।'

—'সব আছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমরা তলওয়ার আছে?'

—'না তলওয়ার নেই। আপনার তলওয়ার কোনোদিন ছিল না।'

—'ছিল না?'

—'না। আপনার বাড়িতে অনেক বই আছে। তলওয়ার নেই।'

—'তলওয়ার নেই।'

—'না।'

—'ফির? আমি জামশেদের মাথা কাটব কী করে?'

—'উঃ...।' ও খাড়া হয়ে দাঁড়াল—'অসহ্য! মাঝেমধ্যে মনে হয় জামশেদের বদলে আমি আপনাকে গলা টিপে মারি। ফের যদি এই কথা বলবেন তো সত্যি খুন করে ফেলব।'

—'এক সচ বাৎ বতানা?'

—'বলুন।'

—'কিৎনা দিন সে কোতোয়ালি কা কাম কর রাহা হ্যায়?'

—'চুপ।'

—'আপনি বাপ কো মার কর দেখ বহুৎ মজা আতা হ্যায় উসমে। বুড্ঢা বাপ চিখেগা...চিল্লায়ে গা...বহুৎ মজা আয়েগা...বহুৎ মজা...হাঃ...হাঃ...হাঃ... হাঃ...।'

—'শাট্ আপ ইউ...।' আমার দিকে ঘুঁসি পাকিয়ে এগিয়ে এল সে। খসমসাতি তার উঙ্গলিয়া আমার গর্দন চেপে ধরতে চাইছে।

—'আর একটা কথা বললে খুন করে ফেলব। আর একটা কথা বললেই...।'

গুলকাটোরায় গোসল করার সময়েই মালুম হচ্ছিল কেউ আমার দিকে তাকিয়ে আছে, একনজরে দেখছে। অথবা শুধুই নজর করছে। উড়নির আড়াল থেকে কালো একজোড়া সুর্মাপরা শানদার চোখের চাক্কু এসে বিঁধছে আমার গায়ে। সে চোখ ভুখা, সে নজরে রওশনি নেই, বিজলি আছে। সে সুর্মায় প্যায়ারের ল'ও নেই। আছে হওয়সের শোলা!

পানি থেকে উঠে আসার পরই সে চোখের মালকিন একেবারে আমনেসামনে এসে দাঁড়াল। বেগমসাহিবার খাস বাঁদী মোতিবিবি চাঁদির রেকাবে আতর নিয়ে এল—'বেগমসাহেবার নজরানা কবুল করুন হুজুর।'

সেদিন আমি যতটা তাজ্জব হয়েছিলাম পরে আর কখনো শায়দ হইনি। এ ঔরৎ বাঁদী! যার জিসমোঁমে এত নূর, এত খুবসুরতি, এত হুসন—সে কিনা বাঁদী!

—'কী আছে এতে।'

—'নাগচম্পার আতর হুজুর।'

—'চম্পার আতর।'

—নাগচম্পার আতর হুজুর। এর মেহ্‌ক্ নশিলি। এই বাঁদি বহুৎ চুঁড়কে নিয়ে এসেছে। হুজুর-এ-আলমের জরুর পসন্দ হবে।'

সচ! আতরের নীলা রঙ আর বাঁদিটি, দুজনেই বড়ো নশিলি। বড়িয়া চীজ।

—'বড়ি বেগমসাহেবাকে জানাবেন তার তোফা আমি কবুল করলাম। আমার কাছে এ তোফা বেশকিমতি।'

—'জি হুজুর।' কুর্নিশ করে বাঁদি চলে গেল। যাওয়ার আগে রেখে গেল

আরেক ঝলক জহরিলা নজর।

নাগচম্পার আতর! না আরো কিছু!

যার নেশা কাটানো যায় না, যার তিক্ষগি বুঝালেও বোঝে না এমন কিছু একটা। আতরের খুশবু আমার দিমাগ, দিল, জিসমকে বেহোঁশ করে রেখেছিল। খুশবু—যা উঠে আসছে বেগমের গরম শরীর থেকে। সেই শরীর যা আমি বহোৎ দেখেছি। কিন্তু আজ যেন তাতে কুছ ঔর ছিল। অন্য কিছু। একেবারে নয়া কিছু।

—'হুজুর, কী ভাবছেন অমন করে?'

সুলতান হয়ে কি আর বাঁদির বারে মে পুছতাছ্ করা যায়?

—'কুছ নেহি বেগমসাহেবা।'

—'তবে আপনাকে এমন খোয়া খোয়া লাগছে কেন? তবিয়ৎ তো ঠিক আছে আপনার?'

—'বিলকুল ঠিক আছে।'

—'ফির?'

বেগমের পরেশানি দেখে হেসে ফেললাম। কত উমর হল ওঁর? আঠাশটা বাহার পেরিয়েছেন। অথচ রৌণকে এখনো নওজোয়ানিকে তাক লাগাতে পারেন। বিস্তরে এখনো তার শেরনীর জোশ। যে-কোনো মর্দকে ঘায়ল করার পক্ষে তা কাফি।

তা সত্ত্বেও আমি তাকে ফেলে ওই বাঁদির কথা ভাবছি কেন? কী আছে ওই বাঁদির? চাকুর মতো ধারালো চমক ছিল তার চোখে। আর?...গুলাবের মতো রসিলা হোঁঠ?...আর?...কবুতরের মতো নরম গর্দন?...ঔর?...ঔর?... ঔর...

সে রাতে নিন্দ এল না। আমার বুকে বেগম চ্যায়ন সে ঘুমাচ্ছেন। আসমানে আধা-আধুরি চান্দ। এই মহলের দুসরি ইমারৎ থেকে ছোটো ছোটো সিতারেঁও সাফ দেখা যায়। রাতের পিলসুজের মতোই দবিদবি তাদের রওশনি। ঘ্যায়সে নাচমহলের বুঝুতি ঘুরি দিয়া। তাদের চোখে আঁসু। সেই আঁসু টপকে পড়বে নমকিন দরিয়ার বুকে। তৈয়ার করবে মোতি।

মোতি!...মোতিবিবি!...চাকুর মতো চোখ...গুলাবের মতো হোঁট... কবুতরের মতো গর্দন!

দিওয়ারের জাফরি দিয়ে চাঁদনি এসে পড়েছে পথরের উপর। খুদার

দুনিয়ায় খিজা ঔর দর্দ যেমন আছে তেমন রাহত আর চ্যয়নেরও কমতি নেই। কিন্তু এই সঙ্গদিল দর্দের আরাম হবে কী করে? আদমির জীবেনর বেহ্‌তরীন হিস্যা আদমির জওয়ানি। সেই জওয়ানিই আমায় অনেক রঙিন সওগাৎ দিয়েছে। দিয়েছে মদভরি রাত। হাসিন ইয়ার্দে। কিন্তু ফিরভি কিসের তনহাই? কিসের রঞ্জিশ? কীসের বেচ্যয়নি?'

—ঝন্‌...ঝন্‌...ঝন্‌...ঝন্‌...।'

পায়জোড়ের শব্দ। জাফরির ফাঁক দিয়ে কেউ ছুটে গেল!

কে? কৌন? কার এত হিম্মৎ? যে ইতনা রাত গয়ে সুলতানের বেগমের ঘরে উঁকি মারে! কে এই বেয়াদব!

—'কৌন হ্যায়?'

বিস্তরে উঠে বসলাম। এত বড়ো গোস্তাখি! আমার সিপাহিরা কোথায় গেল! বেয়াদপির সাজা দেওয়ার কাজি...আমার হাবশি খোজারা কোথায়?

—'কৌন?'

—আমার পুকার ওখানেই থেমে গেল। জাফ্রির ফাঁকে একটা সায়া। চাঁদনিতে সাফ দিখাই দিল...রসিলি হোঁঠ, নশিলি আঁখে...কবুতরের মতো গর্দন—মোতিবিবি।

—'ঠ্যায়রো।'

—'ঝন্‌...ঝন্‌...ঝন্‌...।'

পায়জোড় ঝমঝমিয়ে ছুটে চলল। উসকে সাথ ম্যায়ভি। কখন যে বেগমের মহল থেকে বেরিয়ে এসে সেই জালিম ঔরতের পিছে ধাওয়া করেছি তা নিজেরও মালুম নেই। ওই এক লহমায় আমি হোঁশ আওয়াজ খুইয়ে ছিলাম। আমার কুছ পাতা ছিল না। ভুলে গিয়েছিলাম—আমি সুলতান কুলি—তেলেঙ্গানার সুবাদার—কোই আম আদমি নেহি।

—'ঠ্যায়রো।'

পায়জোড় থামল না। কালো উড়নি চাবুকের মতো লৎপৎ করতে করতে উড়ছে। চাঁদের গুমান সব ভাসিয়ে ছাপিয়ে দিচ্ছে জেনানীর তন-বদন। তার সাথে সেই নশিলি মেহক...নাগচম্পার আতর!

তখন রাত দো-পহের। পিছলি পহেরের নশা টুটে গেছে। রাত অব নাগিনের মতো জহরিলা—খতরনাক। রংমহলের সামনে মোগরার ঝাড়ের বু-এ তাবৎ রংমহলকে জন্নৎ বলে মনে হচ্ছিল। আর আমার ভিতরের ভুখা

নিয়ৎ কলিজা ফাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। কোথায়? কোথায় সেই মেহজবি? কোথায় গেল সেই মাহরু?...কোথায়?

পায়জোড়ের আওয়াজ আর সুনাই দিল না। আমি বেওকুফের মতো দাঁড়িয়ে আছি রংমহলে। ধুন্দলা অন্ধেরায় সেই জনানা কোথায় হারিয়ে গেল। যেন গায়ব হয়ে গেল।

—'হুজুর!'

শেহনাইয়ের মতো সুরিলা আওয়াজ! কঁহা সে আ রহা হ্যায়?

—'কৌন হো তুম? কেয়া চাহিয়ে তুমহে?'

আমার আওয়াজ কাঁপছে—'কিউ লায়ে হো মুঝে ইয়াহা।'

য্যায়সে আমি খুদ আসিনি, ও-ই আমায় খিঁচকে নিয়ে এসেছে।

'হজরতেক বাঁদি মোতিবিবির সালাম। বাঁদির কুছ আর্জি ছিল।'

আর্জি! এত রাতে বাঁদির আর্জি! উয়োভি আমাকে! তেলেঙ্গানার সুলতানকে?

—'কী আর্জি?'

—'দিল-এ-আশিকির আর্জি হুজুর! যদি হুকম দেন তো পেশ করি।'

—'করো।'

মোতিবিবি বলল—'আপনার কাছে আমার ইলতেজা হুজুর! বাঁদির গোস্তাখি মাফ করবেন। জানি না এ বাৎ ওয়াকিফ হলে আপনি কী বলবেন...। পর বেশরম দিল...।'

আমি বেতাব হয়ে উঠছিলাম। মোতিবিবি...মোতির মতো খুবসুরৎ... হুরির মতো হাসিন...নাগিনের মতো জহরিলা,...নজুমের মতো রওশন...।

—'জলদি বাতাও...।'

—'বলছি হুজুর।' সে থামোশ হল। তারপর বলল—'এ বাঁদি আপনি দিওয়ানি হুজুর।'

কী? কেয়া? হিম্মল তো কম না! একটা দো কড়ির বাঁদি! যার জিসম আমি ইচ্ছে করলেই লুটে নিতে পারি, যাকে লুটে নেওয়ার পুরা হক আমার আছে, সে কি না আমারই সামনে দাঁড়িয়ে মোহব্বতের এজহার করছে! কেইসি বেশরম লড়কি হ্যায় ইয়েহ!

—'আমি জানি আপনি কী ভাবছেন? আমি বেশরম! কিন্তু এই বেশরমি সির্ফ আপনার জন্যই হুজুর-এ-আলম। আপকো পানেকে লিয়ে আজ আমি

বেশরম।'

মোতিবিবি অন্ধেরার আড়াল থেকে সামনে এসে দাঁড়াল। দু চোখে রোশনাই। হওয়াসের আতিশ। বেশরমির হদ পার করে সে উতার দিয়েছে তার পোশাক আমি দাঁড়িয়ে আছি লাচার, বেবস। এত খুবসুরতি কোনো ইনসানের জিসমে থাকতে পারে? তপ্তা সোনার মতো রঙ্গ, জওয়ানি আর বচপনের দৌলৎ ছড়িয়ে আছে তার সিনায়, নাভিতে হাসিন অন্ধেরা লেপটে আছে জাঙ্গোঁমে। কালা বাদলের মতো তার রেশমি ঘুঙ্গরালে জুলফেঁ উড়ছে হাওয়ায়। দোনো আঁখে জ্বলছে দাওয়াতের শোলা, যেন কোই অন্‌কহি দাস্‌তাঁ—'এসো... এসো...আমায় কবুল করো...ইয়ে দৌলত সব তোমারই জন্য...হার্মাদের মতো লুটে নাও...সব লুটে নাও...।'

চশমেবন্দু!...চশমেবন্দু!

যখন সামনে কেউ ভোগের পিয়ালা সাজিয়ে দিয়েছে তখন তড়গ্‌কর্ ক্যায়া ফায়দা? যখন দুনিয়ার দৌলত কদমোমেঁ ছড়ানো তব সন্ত বন্‌নে সে ক্যায়া ফায়দা?

—'কী চাও তুমি?'

—'আপনাকে চাই হুজুর। সির্ফ আপনাকে...তার বদলে মে আমি আপনাকে ঔলাদ দেব।'

পিয়ারিনে চৌকা দিয়া।

আমার অন্দরের গহরা দর্দকে কেমন করে এ লড়কি জানতে পারল? আমার দবে হুয়ে কশিশকে কী করে ও পড়ে ফেলল? ও কি ইনসান? না কোই জাদুগরনি!

—'আমি আপনার ইন্তেজার করছি হুজুর। বহুৎ দর্দ হ্যায় আপনি আঁখো মে। আমি আরাম দেব। আজ রাতে ইনকার করবেন না।'

আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মোতি, বেলিবাস, বেশরম। শামতের মতো ঘনিয়ে আসছে। দিলজলার সিনার আগ বুঝানোর পানি। তবে আর দের কিস বাৎ কি?

মদ্‌হোশিতে রাতটা কেটে গেল।

আমার জিসমের খুমার নিতে নিতে মোতি কাঁপছে। আমি পাগলের মতো ওকে প্যায়ার করছি। গর্ম সাঁসের তকরার হচ্ছে। লবের প্যায়মানার সবটুকু শরাব আজ শুষে নেব।...পিয়ারি...আঃ...পিয়ারি...দিলনশি...আমার

বেচ্যয়নি দূর করো...তোমার তন-বদনে আমায় আশিয়াঁ দাও...তোমাতে আমার সব খুশি, সব গম পনাহ পাক...পুরী কে পুরী...

কিন্তু একী! মোতিবিবির মুখটা এরকম পালটে গেল কখন? এ কে? কে আমায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে! এ তো মোতিবিবি নয়! না...না...কখনোই মোতিবিবি নয়!... এ মায়া... এ মায়া!... আমি?... আমি কোথায়?...

নাঃ...এ তেলেঙ্গানা নয়। নয় গোলকোন্ডাও! এ শান্তিনিকেতন! যেখানে আমাদের এক্সকারশন হচ্ছিল। যেখানে গভীর রাতে আমি ঘুমন্ত স্ত্রীকে ফেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছি। যেখানে আমার ছাত্রী মায়া আমায় জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে সারারাত ধরে বিষাক্ত চুমু খাচ্ছে! ...যেখানে...ওঃ!...তবে তো আমি সুলতন কুলি নয়! তবে তো আমি তেলেঙ্গানার সুবেদার নই!...তবে আমি কে?

—'কৌশিক...আমার কৌশিক...তোমায় আমি চাই...ভীষণভাবে চাই...কেন তুমি আমার দিকে তাকিয়ে দেখো না? আমি কি সুন্দরী নই? আমার মাথাটা আবেগে ওর নগ্ন বুকের কাছে চেপে ধরেছে মায়া। মুখে এলোপাথাড়ি চুমু খেতে খেতে বলছে—'সবাই আমায় চায়। তুমি কেন চাও না? তুমি কী নিষ্ঠুর! আমায় দেখো। আমি তোমার বউয়ের চেয়েও অনেক সুন্দরী। কৌশিক...প্লিজ কৌশিক...আজ তুমি রিফিউজ করলে আমি বাঁচব না।'

আমি দরদর করে ঘামছি। আমি চাইছি প্রবলভাবে ফিরে আসতে...কিন্তু আমার যে সব ভুল হয়ে যাচ্ছে! আমি কে? আমি কোথায় আছি? স্বর্গ, মত্য, পাতাল সব গোল্লায় যাক। আমি হারিয়ে যেতে চাই! পাগল হয়ে যেতে চাই! মাতাল হয়ে যেতে চাই!

—'না...মায়া...দিস ইজ নট রাইট...নো...।'

শেষ চেষ্টাও হারিয়ে গেল নিঃশ্বাসের তোড়ে। মায়া পা দিয়ে আমার কোমর সাপটে ধরেছে—'না, আজ কিছুতেই তোমায় আমি ছাড়ব না। আজ অন্তত একটা রাতের জন্য তুমি আমার হও...নিজেকে উজাড় করে দাও... তোমায় ফিল করতে দাও...আর কোনোদিন আমি কিছু চাইব না...প্লিজ কৌশিক...আজ আমায় ফিরিয়ো না।'

—'নাঃ...ফেরাব না...ফেরাব না তোমায়...এসো...এসো...।'

আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম ওর উপর। ও স্রোতস্বিনী নদীর মতো আমায় টেনে নিয়ে গেল কোনো এক আদিম গহ্বরে। প্রচণ্ড একটা বেগ আমায় খালি

করে দিচ্ছিল, নিঃস্ব করে দিচ্ছিল, রিক্ত করে দিচ্ছিল। আমি অসহনীয় ক্লান্তিতে ওর নগ্ন বুকে এলিয়ে পড়েছি। ওর হাত অসীম মমতায়, ভীষণ আদরে আমার ঘাড়ে, কাঁধে, মাথায়, পিঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি অবশ হয়ে যেতে যেতে বললাম...

—'মায়া...।'

—'কৌশিক।'

—'বলতে পারো আমি কে?'

—'প্রফেসর রুদ্র!'

—'উঁ?'

প্রোফেসর রুদ্র! প্রোফেসর কৌশিক রুদ্র! ...হ্যাঁ...আমি...আমিই তো!... আমিই তো কৌশিক রুদ্র!... সবাই শোনো... আমি কৌশিক রুদ্র—ইতিহাসের অধ্যাপক কৌশিক রুদ্র। তোমরা শুনছ?...শুনছ সবাই?...মোতিবিবি শোনো, গোলকোন্ডা শোনো, জামশেদ শোনো...আমি কৌ-শি-ক-রু-দ্র- ও-ও-ও... আমি কৌশিক রুদ্র...আমি...।

—'কিছু চাইছেন আপনি?'

আমি? চাইছি? হ্যাঁ—চাইছিই তো!

—'কী চাইছেন আপনি?'

কী চাইছি? কী চাইছি কে জানে? কী চাইছি সে কি আমিই জানি!

—'জল খাবেন?'

—'জল?'

—'হ্যাঁ...জল খাবেন?'

—'না...ওটা খাব।'

—'কী খাবেন?'

—'সাদা সাদা...ধোঁয়া ধোঁয়া...লম্বা লম্বা...।'

—'সিগ্রেট!'

লোকটা উত্তেজিত হয়ে আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে। উত্তেজনায় ওর গলা কাঁপছে—'সিগ্রেট! আপনি সিগ্রেট খাবেন?...আপনি সিগ্রেট খাবেন?

—'হ্যাঁ...খাব।'

—'প্রোফেসর...প্রোফেসর...' ও প্রায় লাফিয়ে পড়ে আমার সামনে এসে

দাঁড়াল—'আমায় দেখুন...আমায় দেখুন স্যার।'

চেনা চেনা ঠেকছে। কিন্তু কোথায় দেখেছি? আঃ...মাথাটা জ্বলে যাচ্ছে... শিরাটা দপ দপ করছে। ছেলেটাকে দেখেছি। নিশ্চয়ই দেখেছি। কোথায়? কোথায়?

—'স্যার, আমি বিদ্যুৎ মুখার্জি, আপনার ছাত্র।'

—'সিগ্রেট...।'

—'হ্যাঁ...এক্ষুনি।'

ও ছুটে বেরিয়ে গেল।

বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ কে? বিদ্যুৎ...বিদ্যুৎ...নাঃ...কিছুতেই মনে করতে পারছি না। স্মৃতির সরণির দরজা যেন বজ্রআঁটুনিতে আঁটা। বিদ্যুৎ...কে ছিল?...কে ছিল?... মায়ার বন্ধু?...নাঃ...না...না...না...তবে...তবে বিদ্যুৎ কে?

—'সম্রাট, সম্রাট এসো। প্রোফেসর সিগ্রেট চাইছেন।'

আগের ছেলেটি আবার এসে ঢুকল। সঙ্গে আরেক ছোকরা। প্রথম ছেলেটি রীতিমতো হাঁফাচ্ছে। সম্রাট না কী যেন ছেলেটার নাম। সে আমার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল।

—'আপনি সিগ্রেট চাইছিলেন?'

মাথা নাড়লাম। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

—'নিন।'

সিগ্রেট নিতে গিয়ে দেখলাম হাত তুলতে পারছি না। হাত বাঁধা! আমায় বেঁধে রেখেছে কেন ওরা? আমি কী করেছি?

—'হাত খুলে দাও, হাত খুলে দাও সম্রাট।'

হাত খুলে গেল। সম্রাট আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছে কেন? আমি কি পাগল নাকি! আশ্চর্য তো। একেই তো বিচ্ছিরিকমভাবে বেঁধে রেখেছে! হাত পায়ে দড়ি কেটে বসে জ্বালা করছে! তার উপর এভাবে তাকাচ্ছে কেন? আমার কী হয়েছিল?

—'সিগ্রেটটা আপনি উলটো ধরেছেন প্রোফেসর।' সম্রাট খুব শান্তভাবে বলল—ফিল্টারের দিকটা মুখে দিন।'

ফিল্টার! ফিল্টার কাকে বলে? কেমন করে মুখে দিতে হয়?...আঃ...কিছু মনে পড়ছে না...কেন মনে পড়ছে না...? সামনে যে বসে আছে সে কে? ও কি সম্রাট? ওকে এমন আবছা দেখছি কেন?...ছেলেটা ভীষণ সুন্দর! একেবারে

গ্রিক যোদ্ধার মতো সুন্দর। ইতিহাসের বইয়ে এমন দৃপ্ত চেহারা আমি দেখেছি...কিংবা বইয়ের বাইরেও দেখেছি। আমার সিপাহশালার এমন ছিল। এমনই খু-র-সু-র-ত, এমনই আ-লি-শা-ন, এমনই জো-শি-লা...।

আরিঃ! আমি কার জুবান বলছি? আমি কী বলছি? নেহি, নেহি...ফিরসে নেহি।

ওকী! সম্রাটের পিছনে ওই দুসরা লোকটা কে? ওকে তো সম্রাট য্যয়সাই দিখ্‌তা হ্যায়। হুবহু এক, ও কী পরেছে? ওর মাথায় কীসের তাজ? ও-কে? ওকি আমার সিপাহশালার? আঃ...আঃ...আঃ...কি ভাবছি আমি? কেন ভাবছি? আমি তো কৌশিক রুদ্র!...তবে কেন?'

—'কী হয়েছে?'

—'প্রোফেসর...প্রোফেসর...।'

সারা দুনিয়াটা যেন তোলপাড় করছে। আমি এমন লাট খাচ্ছি কেন? চোখের সামনে এ কেমন রওশনি? বাত্তি বুঝা দো! আমি সুলতান কুলি কুতুবশাহ হুকুম দিচ্ছি...।

না...না...আমি কৌশিক রুদ্র...মাথাটা ঘুরছে...টাল খাচ্ছে...ত্রিভুবন দুলছে...আঃ...আমার মাথা...আমার মাথা...জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ছে...সামনে দিওয়ার...দিওয়ার ভেঙে আমায় বেরোতেই হবে...পালাতেই হবে...নয়তো সে...ওই সে আসছে! তলওয়ার হাতে...ভেঙে ফেলো এই দিওয়ার।

—'স্যার...কী করছেন?'

—'আমায় বাঁচা...আমায় বাঁচা...ওই জামশেদ আসছে...আমায় মারবে...এই দিওয়ার ভেঙে আমায় বাঁচা...।'

—'প্রোফেসর।'

—'ভাঙ, ভেঙে ফেল দিওয়ার...।'

দিওয়ারের গায়ে জোর ধাক্কা মারলাম। দিওয়ার নড়ল না। পাথরের কেল্লার মতোই সে মজবুত। আবার ধাক্কা মারলাম...ফির একবার...ফির আরো জোরসে...ওই শোনা যায় কার দস্তক?

—'কী করছেন স্যার? মাথা ঠুকছেন কেন?

—'আমায় বাঁচা...আমায় বাঁচা তুই। এই ভাগমভাগে আমি থকে গেছি। আমায় তুই বাঁচা!...আমায় তুই...।

—'সম্রাট...ধরো ওকে...ওর মাথা যে কেটে যাবে।'

কেউ পিছে সে আমায় পাকড়ে ফেলল। ছোড়ো...ছোড়ো মুঝে...আমি এই কয়েদ থেকে আজাদি চাই...আমি বাঁচতে চাই...আমায় মুক্তি দাও...আজাদি দাও...।

রুবরু অন্ধেকার ছেয়ে গেল।

আমার জিন্দগির আফসানার তিন হিস্যা। পুরা জওয়নিটাই কেটেছে তেলেঙ্গানার সুবেদারি করে। তারপর বুঢ়াপায় গোলকোন্ডার সুলতানি তখ্‌ত। পর এসবকিছুর আগেও আমার নওজোয়ানির কিস্‌সা আছে। সে কিস্‌সা মামুলি। এক ভটকতা হুয়া নওজোয়ান বানজারার সিধাসাদা জিন্দ্‌গি। সেই জিন্দ্‌গিতেই একদিন জলওয়া এল যব আমি বহ্‌মনি সুলতানের দরবারে এলাম।

শন ও শওকতে গোলকোন্ডা তখন এমন আজুবা ছিল না। তব উসকা নাম থা মঙ্গলবরম। পাহাড়িকে উস পার ভেড়-বকরি চড়ত। তখনো এমন শানদার দুর্গ তৈয়ার হয়নি।

আমি এসেছিলাম একটা নওকরির খোঁজে। নিতান্তই এক ফকির হিসাবে যার আওয়ার্‌গি করা ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না। যার কিসমতে দের ঔর অন্ধের দুই-ই ছিল।

বাদশা সলামৎ মসনদ রওশন করে বসেছিলেন।

—'কৌন হো তুম?'

আমায় দেখে উনি হয়রান হলেন—

—'সোভানাল্লাহ! খুদা তোমায় জওয়ানি, সুরৎ, জোশ, তাকৎ, তেজ, দিমাগ সব দিয়েছেন। তুমি আদমি? ইয়া কোই মসিহাঁ।'

—'আমি ইনসান হুজুর! বান্দার নাম সুলতান কুলি খাঁ।'

—'সুলতান কুলি খাঁ! তুমি কী চাও বরখুর্দার!'

—'কাজ চাই হুজুর! আমি আপনার কাছে আমার কিসমৎ আজমানে কে লিয়ে এসেছি।'

—'তোমার কিসমৎ তোমার উপর মেহেরবান নওজোয়ান। তাই সে তোমায় আমার কাছে নিয়ে এসেছে।'

বাদশা আমায় দোহাজারি মনসব দিলেন। তার মেহেরবানিতে সেদিন এই আওয়ারার নসিব খুলে গিয়েছিল।

—'বাদশা সলামৎ রহে।' আমি কুর্নিশ করেছিলাম।

—'সুলতান কুলি, ইয়াদ রাখ না। তোমার এই তাকৎওয়ার বাহুঁ যেন আমার সলতানিয়ৎ কো হর মুশকিলোমেঁ রাহত দেয়। তোমার তলওয়ার যেন হর হালমে বহ্‌মনি মসনদের নমকহালালি করে।'

—জো হুকুম হুজুর।'

একথা সেদিন কেন বলেছিলেন বাদশা। আমার নিয়তে খোঁট আছে একথা কি সেদিনই তিনি মেহসুস করতে পেরেছিলেন? কিন্তু আমার নমকহালালির উপর তো তার কোই শক ছিল না। দোহাজারি মনসব থেকে তেলেঙ্গানার সুবাদারি পদে তিনিই তো আমাকে এনেছিলেন।

তারপর তাঁর এন্তেকাল হল। মসনদে বসল তাঁরই ঔলাদ।

—'সুলতান কুলি খাঁ।'

—'জি হুজুর।'

—'শুনেছি তোমার সুবায় এক বহুৎ হাসিন গানেওয়ালি এসেছে!'

—'জি হুজুর।'

—'তার নাম মন্দাকিনী?'

—'জি হুজুর।'

—'আমার কাছে খবর আছে সে বিজয়নগরের চর। বিজাপুরের সুলতানের পহ্‌গাম তারই সবুৎ।'

—'বিজয়নগর! পর হুজুর, বিজয়নগরে তো দুসমনি করার মাহল নেই। শুনেছি বহ্‌মনির সঙ্গে এলান-এ-জঙ্গ ও ওরা তবাহ হয়েছে।'

—'কমজোর হলেও দুশমন আখির দুশমনই থাকে সুলতান কুলি। আখরি সাঁস তক্ ভস্‌না চাহ্‌তা হ্যায়—আমি ওই নাচনেওয়ালিকে দেখতে চাই।'

—'হুজুর...পর...।'

—'কোই পর নহি। তুমি আমার আব্বাজানের ওয়াফাদার মুলাজিম ছিলে তাই তোমায় বলছি। নয়তো আপনি শানো পর আমার ভরোসা আছে।'

আপনা শানো পর ভরোসা তা আমারও ছিল। কিন্তু অন্দর হি অন্দর ম্যায় জ্বল রাহা থা। ইয়ে লড়কা নিজের আব্বাজানের বলবৎ-এ আমাদের উপর হুকুমৎ করছে। অথচ রাজ্য শাসন কীভাবে করতে হয় তা ওর মালুমই নেই। শরাব, শবাবে দিমাক অবধি ডুবে আছে। সলতানিয়ৎ চালাবে কখন?

আমার অন্দরের শোলা ভড়কানোর আর একটা কারণ ছিল। তা ওর আব্বাজানের মেহরবানি। হাঁ, আমি মুসাফির ছিলাম। ছিলাম পথের ফকির। বহমনি সুলতানের এহেসানে আজ মহলে আছি। পর উয়ো তো বিতি বাঁতে হ্যায়। যো বিৎ গয়া সো বিৎ গয়া। তাহলে আজ সেই এহেসানমন্দির বোঝা ঘাড়ে তুলে আমায় মুলাজিম হয়ে থাকতে হবে কেন? সারা জিন্দ্‌গি ওই লোকটার শুকরগুজার হয়ে থেকে আমি নিজেকে বরবাদ করব কেন? কিঁউ?...

হাঁ, ম্যায় উসসে জ্বলতা থা। কিঁউ কি ও হরওয়ক্ত ওর আব্বাজানের মেহেরবানির কথা আমায় মনে করিয়ে দিত। ও আমায় ইয়াদ করিয়ে দিত যে আজ এ সুবাদারি, এই মনসব, এই রাজমহল ওরই আব্বার দেওয়া। কুছ ভি মেরি নেহি। যেন আমি ওর টুকরো পে পল্‌তা হুয়া কুত্তা। ওয়াফাদারির মোহর লাফিয়ে বসে দুম নাড়াচ্ছি।

—'জি হুজুর। আপনার হুকুম সর আঁখো পর।'

—'শব্বাখের সুলতান কুলি।'

—'শব্বাখের হুজুর।'

ফিরে এলাম। কিন্তু সিনার আগ বুঝল না। বরং জোয়ালার মতো অন্দর হি অন্দর সে আমায় খাঁক করে দিচ্ছিল। অজীব সি বেতাবি ছেয়ে যাচ্ছিল। একদিকে নিজের কাবলিয়ৎ সাবিদ করার জন্য আমি বেকরার হয়ে উঠেছিলাম। অন্যদিকে ওর বাবার এহেসানও ভুলে উঠতে পারছি না। বগাওয়ৎ আর ইমানদারি, নমকহারামি ও নমকহালালি দুই পহলুতে বসে আমায় নিয়ে কশ্‌মকশ্‌ করছিল। আর কতদিন, আর কতদিন আমায় বহমনি সুলতানের ইবাদৎ করে যেতে হবে? আর কতদিন...?

শুরু হল সাজিশ। গোলকোন্ডায় বহমনি মসনদ অস্ত হওয়ার পথে। এই খোয়াবকে হকিকৎ করার জন্য সুলতান কুলির উমরদরাজ থেকে খসে গিয়েছিল আরো কুছ বরস। সেই নওজোয়ান তখন জওয়ানি পেরিয়ে বুঢ়াপায়। কিন্তু তাকৎ আর তেজ দিমাগ ছিল আগের মতোই।

তারপর এল সেই দিন। মাথার উপর জ্বলতা হুয়া আফতাবও সেদিন আমার হরকৎ দেখে শরমে সিন্দুরি হয়ে গিয়েছিল। হাওয়া রুক গয়া থা। জমিন ফেটে গিয়েছিল। সেই দর্দনাক ফসানা আজও ইতিহাস হয়ে গোলকোন্ডার কালি অন্ধকারে ডুবে আছে।

কী হয়েছিল উস্‌ দিন? কী করেছিল সুলতান কুলি খাঁ? কেন তার নাম

ইতিহাসের পাতায় শরমিন্দা হল?

সাল ১৫১৮, তখন শভ হয়ে এসেছে। এখানে শাম আসে দুলহনের মতো। য্যায়সে দুলহন চিল্‌মনের পেছন থেকে লাজুকভাবে তার আশিককে দেখছে। নীল সুর্মায় তার নজর রঙিন। গালে বাহারের গুলশন। গোলকুন্ডা দুর্গে তখন দেওয়ালগিরি রওশন হয়ে উঠেছে। ঝাড়ে ঝাড়ে চিরাগে চিরাগে শামা জ্বলে উঠছে। পরওয়ানারা একে একে ভিড় জমাচ্ছে। হওয়সের আগ্‌-এ কে পহলে পুড়বে তার জন্য বেসব্‌রিসে ইন্তেজার করছে।

মজলিশে তখন গায়ক ইয়ামন ধরেছে। তার তান বারবার গিয়ে আছড়ে পড়ছে দুর্গের দিওয়ারের দিওয়ারে। নাগিনাবাগ, বড়ি বাওলি সুরের জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। মৃদঙ্গ, পাখোয়াজের গুম্‌-গুম্‌ আওয়াজে গোলকোন্ডা ঝুম রাহা থা।

কিন্তু অচানক সব চুপ হয়ে গেল। উয়ো কীসের আওয়াজ? বালা হিসার গেট থেকে ভেসে আসছে পেহ্‌রাদের তালির আওয়াজ! সে আওয়াজের তাল ঠিক নেই! আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে সে নাওয়াকিফ্‌দের জানান দিল—তুফান আসছে!...হামলা!..হামলা।

তারা তখনো জানত না যে এই হামলার পিছে রয়েছে গোলকোন্ডার সুলতানেরই আজিজ দোস্ত ও ওয়াফাদার মুলাজিম সুলতান কুলি খাঁ। পিলপিল করে সিপাহিরা ছুটল আস্‌লাহ খানার দিকে। শৌকৎ-এ-জঙ্গ তুরন্ত হাথির পিঠে সওয়ার হয়ে নাগিনাবাগে এলেন। ততক্ষণে বালাহিসার গেটে পড়েছে জোরদার ধাক্কায়, বাহার হাথির চিত্তথাড়। দুশমন এসেছে...বতন লুটে নিতে এসেছে।

হাথির ধাক্কায় বালহিসার দরওয়াজা ভেঙে পড়ল।

—'হা-ম-লা- আ-আ আ-আ...।'

—'আল্লা—আ-আ-হো-ও-আক্‌ব-র্‌-র্‌-র্‌...।'

সিপাহিদের চিখে আশমান ফেটে পড়ল। শ-ও ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ টক্‌-টক-টক্‌-টক। সমুন্দরে জোয়ার এলে যেমন পানি লহ্‌রে লহ্‌রে ছুটে চলে ঠিক তেমনি শ-ও শ-ও সৈন্য এক দুস্‌রেকে উপর টুট্‌ পড়ল। তলওয়ার-তলওয়ারে তক্‌রার হয়ে শোর উঠেছে—ঝন্‌ন্‌ন...ঝন্‌ন্‌ন্‌...। বল্লম, বর্শা বিজলির মতো চমকে চমকে উঠছে। সারা গোলকোন্ডা সুর ভুলে মেতে উঠল মওতের চিখে।

আর আমি? গোলকোন্ডার কুতুবশাহী বংশের পহলা সুলতান? আমি কী করছিলাম তখন?

আমি তখন দেখছিলাম। কী দেখছিলাম? সারা মাহলজুড়ে মওতের তসবির!

...বুকে বর্ম-পরা বহ্‌মনি সিপাহি তলওয়ার চালাচ্ছে—কমজোর—হাথ কাঁপছে।

—অভি ঘোড়া থেকে পড়ে যাবে—তবু হওস্‌লার কমতি নেই।—তলওয়ার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে দুশমনেদের সাফায়া করছে—একটা বর্শা এসে তার সিনায় ঘুসে গেল—খেল খতম!

...বুড্‌ঢা শৌকৎ জঙ্গের হাত থেকে তলওয়ার পড়ে গেছে...সিপাহিরা তাকে ঘিরে ফেলেছে...ওই...ওই তলওয়ার তার গলা ছুঁ কর গেল—তাজা খুন চুমল তলওয়ারের ধার। মালিক-এর লাশ নিয়ে দৌড়ল হাথি—খেল খতম।

—মর্দানিরা উড়নি উড়িয়ে ছুটছে অন্দরমহলের দিকে। কোঁখ মে নান্না বাচ্চা।—পিছে পিছে কুতুবশাহী সিপাহি। তাদের ঘাড়ে খুন চেপেছে—তলওয়ারের এক কোপে বাচ্চাটার গর্দান ফাঁক হয়ে গেল—তার আম্মির চিখ আর সিপাহিদের চিৎকার।—মরহুম ঔরৎকে টানতে টানতে ঝাড়ির পিছে নিয়ে চলে গেল—খেল খতম।

...জখমি বহমনি সিপাহি ঘোড়ার জিন থেকে নীচে পড়েছে...নিহত্তা... বেবস...খুন মে লৎপৎ করছে...।

—'আব্বাজান...।'

তার ছোটি বেটি দুহাত বাড়িয়ে আব্বাজানের ঔর ছুটে আসছে...য্যায়সে ধরতি মা আপনি ঔলাদকে বাঁচাতে আসছে।

—'আব্বাজান....আব্বাজান....আব্বাজান...।'

—'নেহি...বেটি...:নেহি...ভাগ যা...ভাগ যা...।'

সিপাহি ছটফট করে উঠেছে। তার আঁখো মে খওফ—'ইয়াহা মৎ আনা...মৎ আনা...নেহি...।'

—'আব্বাজান'...আব্বাজান...আব্বা...।' বেটি আব্বাজানের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ঠিক তখনই এক হাতি এসে বাপ-বেটিকে কুচল কর চলে গেল।

খেল খতম! খতম! খতম!

—'সুলতান কুলি খাঁ!—বে-ই-মা-ন!'

আজ বন্দি বহ্‌মনি সুলতান আমার কদমোমেঁ পড়ে আছে। আমার কদ্‌মোমেঁ! সুলতান কুলি খাঁয়ের পায়ে! যে সুলতান কুলি তার নফর ছিল সেই সুলতান কুলির পায়ে!

—'কেমন লাগছে জনাব?'

—'বদতমিজ!'

আমি বহুৎ জোরসে হেসে উঠলাম। পর কাটা গেছে, তাও পরিন্দার ফড়ফড়ানি তো দেখো! এক্ষুনি পিঞ্জরায় ঢোকালে ইতনা গুরুর কোথায় থাকে দেখব।

—'নমকহারাম!'

—'জি হুজুর।'

—'বদজাত!'

—'জি!'

বহ্‌মনি সুলতান আর গালি দিল না। বড়াবড়া আঁখ করে সে আমায় দেখছে। পিঞ্জরায় কয়েদ শের য্যায়সে তরপতা হ্যায়—উয়ে ভি ওয়সি হি তড়প রাহা থা।

—'আঁখে দেখাচ্ছেন নাকি হুজুর?'

—'তোকে দেখছি।'

—'আমায় দেখছেন?'

—'হাঁ...তোকে। আবাহুজুর দুধকলা দিয়ে কী আস্তিন-কা-সাপ পুষে-ছিলেন তা যদি তার মালুম হত।'

ফির সে ওহি বাৎ। ওর আব্বাহুজুর আমায় পুষেছিলেন।

—'একটা রাহী মিস্কিন লাওয়ারিশকে তুলে এনে গদিতে বসিয়েছিলেন। তাঁর মালুম ছিল না যে লাওয়ারিশের খুন কভি শাহী নেহি বন্‌তি! নমকহারাম কভি নমকহালাল নেহি হোতি।'

—'জবান সাম্‌ভাল কে বাৎ কর বান্দা!' খুন খৌল উঠল। গুস্‌সায় ওর সাথে তকল্লুফ সে পেশ হতেও ভুলে গেলাম!

ফিরসে! ফিরসে ওহি বাৎ! ওর আব্বা আমার উপর এহ্‌সান করেছিলেন। তার নফর আমি।

—'নেহি করন্দা...ক্যায়া কর লেগা তু! ...করলে যো ভি করনা হ্যায়।'

—'জুবান কাটকে কুত্তো কো খিলা দুঙ্গা।'

—'যো চাহে করলে, কুত্তা...।'

—'খা-মো-শ।'

শাহীখুনের ইতনা গরমি! ইতনা গুমান! অভি ভি নিজেকে বাদশা ভাবছে এই বুড়বক!

—'হারামখোর—বুজদিল্-কায়র্। নামর্দের মতো রাতের অন্ধেরায় হামলা করে...।'

—'খা-মো-শ।'

ইংনা জিল্লৎ! নিজের তলওয়ারটা ওর বুকে বসিয়ে দিলাম। ওর এই জুবান আমাকে খামোশ করতেই হবে...বন্ধ করতেই হবে ওর মুখ...আমার মাথায় খুন সওয়ার হয়েছে। আমি কোপের পর কোপ মারতে মারতেই বলেছি—'খামোশ...খামোশ...খামোশ...।'

আমার দামন সেদিন খুনে লাল হয়ে গিয়েছিল। বুড়া বহ্‌মনি সুলতানের কবরে দরার পড়েছিল কি? তার রুহ কি কেঁপে উঠে দোয়া করেছিল—'ইয়া খুদা...পর্‌বর্দীগার, রহ্‌ম কর, রহ্‌ম কর।'

ওই...ওরা হাসছে...খলখল করে হাসির ফুহার ছড়িয়ে পড়ছে।...ওরা হাসছে...। দুনিয়ার এটাই দস্তুর। শাহেনশাহ্ যখন পথে নেমে আসে, যব ধুল, মিট্টি, কিচড় তার গায়ে লাগে, যব তন্‌হাইমে তড়্‌পে কিংবা বেতাজ, বেরাজ হয়ে আহ্ ভরে, তখন তার অশ্‌কোঁ পর জমানা হাসে। এটাই দুনিয়ার কানুন।

হাসো বেওকুফোঁ...হাসো। গোলকোণ্ডার নবাব সুলতান কুলি মসনদে থাকতে হাসার মওকা তোমরা পাওনি। এবার তাঁর জখ্‌মের উপর নম্‌ক ছিড়্‌কে একটু হেসে নাও। নয়তো তোমাদের জিস্‌মের দহেক্ মিটবে কি করে? হাসো, ...আরো হাসো...আরো হাসো উজবুক...।

আমি পালাতে চাই। আমি ওদের কাছ থেকে দূর ভাগতে চাই। কিন্তু আমার সামনে রাহ্ নেই। কোথায় যাব?

—'ইধার দেখো সুলতান কুলি?'

কে? কৌন হো তুম?

—'মুঝে দেখো।'

—'কোথায়?'

—'উধার নেহি—ইধার দেখো।'

—'রহমনি সুলতান!'

—'হ্যাঁ...ম্যায়...ম্যায়...।'

—'আপভি!...'

—'আমি এসেছি সুলতান কুলি। আমার রুহ্‌ও জন্নৎ পায়নি। আমি আজও দুনিয়ায় ঘুরছি। আমার আত্মাকে শান্তি দাও...আমন দাও।'

—'ক্যায়সে?'

—'তোমার ঔলাদের খুন দাও আমায়!'

—'নামুম্‌কিন!'

—'খুদার দুনিয়ায় কোনো কিছুই নামুম্‌কিন নয়! আমার ঔলাদকে আমার ওয়াফাদার মুলাজিম কোতল করবে এটাও তো নামুম্‌কিন-ই ছিল।'

—'মুঝে ছোড় দো...রহম করো...আমি বাওড়া হয়ে যাব...আমি আর পারছি না।'

ইয়ে কৌন্‌সা ভবঁরে আমি ফেঁসে গেছি। সবকুছ্‌ ধুন্দ্‌লা কেন? ক্যায়া ম্যায় পাগল হুঁ। ইয়া বন যাউঙ্গা...?

—'ভালো আছ তো কৌশিক?'

—'উঁ?'

—'কৌশিক, আমি মায়া।'

—'কৌন মায়া?'

—'আমি মায়া...তোমার মায়া।'

—'কৌন মায়া?'

—'আমি মায়া কৌশিক। যাকে তুমি কিছুতেই স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চাওনি। যাকে কখনো নিজের করে নাওনি তুমি! যার বাচ্চাটাকে তুমি অ্যাবর্ট করাতে বাধ্য করেছিলে।'

—'বক্‌ওয়াস...আমি তোমায় চিনি না।'

—'তুমি আমায় চেনো। আমি তোমার অবচেতনে রয়েছি। তাই-তো তোমায় দেখতে এলাম কৌশিক।'

—'ম্যায় সুলতান কুলি হুঁ।'

—'আমার বাচ্চাটা তুমি হতে দিলে না। আমি তোমায় চেয়েছিলাম। তোমার স্ত্রীর মর্যাদা চেয়েছিলাম। তুমি দাওনি। কিন্তু তোমার ঘর কি বেঁচেছিল? তুমি কি শান্তি পেয়েছিলে?'

—'চুপ রহো।'

—'কেমন আছ কৌশিক?'

—'চুপ রহো।'

—'তুমি আমায় চিনতে পারছ না। আচ্ছা, এই দেখো চেনো কিনা।'

এইবার ওকে পহ্চানা গেল। সেই নশিলি আঁখে...সেই রসিলি হোঁঠ, সেই কালিঘটার মতো উলঝি উলঝি গেসুঁ।

—'মোতিবিবি।'

—'হাঁ...হুজুর! এইবার পহ্চানা গেল বাঁদিকে? কোথায় ছোড়কে এসেছিলেন আপনি আমায়?'

—'জানি না...মালুম নেহি, তুমি...তুমভি কেন এসেছ?'

—'আমার ঔলাদকে কোথায় রেখেছেন?'

—'মেরে ফেলেছি...কোতল করে ফেলেছি...।'

—'কেন?'

—'আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।'

—'কেন?'

—'যে বরস তোমার বেটা জন্মাল সে বরসই আমার বড়ি বেগমের বেটা হল—জামশেদ। তুমি চেয়েছিলে তোমার ঔলাদকেই আমার ওয়ারিশ হিসাবে কবুল করি। তা মুম্কিন ছিল না। তোমরা আমার ওয়রিশান নিয়ে আমায় পরেশান করেছিলে। জিহাদ করছিলে। কেন করছিলে মোতি? তুমি তো সির্ফ আমায় চেয়েছিলে। আমায় প্যায়ার করেছিলে। তবে কেন শাহীতখ্ৎ নিয়ে তোমার ইতনা লালচ...।'

—'প্যায়ার?' মোতি হাসল—'প্যায়ার কাকে বলে হুজুর? আমি আপনাকে জিস্ম দিয়েছিলাম। আপনার শাহীতখ্তে আমার বেটা বসবে এটাই আমার খোয়াব ছিল। কিন্তু আপনি সে খোয়াব হকিকৎ হতে দেননি।'

—'বদ্তমিজ ঔরৎ! বেশরম জেনানা।'

—'সচ বাৎ বললেই বেশরম! আর আপনার বেগমরা? তারা কি কাজিয়া কম করেছে? তারাও তো আপনাকেই চেয়েছিল। তবে শাহীতখ্তের উপর তাদের এত লালচ কেন?'

—'ইয়া খুদা...।'

—'আপনি যে প্যায়ার মহব্বতের কথা ভাবছেন তা হাওয়ার মহল!

আপনার শাহী তখ্‌তটাই সচ।'

—'ফির? কেন এসেছ? অব তুমহে কেয়া চাহিয়ে?'

—'যে খঞ্জর আমার ঔলাদের কলিজায় বসিয়েছিলেন সেই খঞ্জর আপনার-ই বেটার বুকে দেখতে চাই...হুজুর...।

—'নেহি...নেহি...।'

—'নেহি তো তোমার ঔলাদ তোমায় মারবে! বাদশা সলামৎ! উয়ো ওয়াপস আগয়া!'

—'তুমি আপনা মতলবে অনেকের ঔলাদকে মেরেছ। এবার তোমার ঔলাদের বারি সুলতান কুলি।'

—'নিজে বাঁচুন হুজুর! ...এখন আপনার হাথ কাঁপছে কেন? ওই মসনদের জন্য অনেক কোতল আপনি করেছেন। আর সির্ফ একটা!

ওঃ...কোই খামোস করাও ইনকো!

—'জামশেদকে তোমায় কোতল করতেই হবে!'

—'তোমার ঔলাদের খুন চাই সুলতান কুলি।'

—'ঔলাদের বদলে খুদ জিন্দা থাকার জন্য আপনাকে আমরা মুবারক-বাদ জানাব হুজুর।'

আঃ...আঃ...আঃ...।

—'মারো ইয়া মরো...।'

—'ঔলাদের খুন দাও...।'

—'মুবারকবাদ হুজুর...।'

—'তলওয়ার ধরো সুলতান কুলি...।'

—'খঞ্জর! ...সেই খঞ্জর!...'

খামোশ! খামোশ! খামোশ!

আমি জমিনে পড়ে যাচ্ছিলাম। উসসে পহ্‌লে আমায় কেউ পাকড়েছে।

'স্যার!...'

—'আমায় বাঁচাও...আমায় জান বক্‌শ্‌ দাও...ওদের চুপ করাও...। ম্যায় পাগল হো রহা হুঁ...ওদের চুপ করাও। আমি জিন্দা থাকতে চাই...আমায় পনাহ্‌ দাও...।

কিন্তু কে আমায় পাকড়েছে! কোই লড়কি! কোই জনানী! ঔরৎ! আমি ওকে ধকেল দিলাম।

—'উঃ...মাগো!'

—'একী তিস্তা...রক্ত!'

—'ওঁকে চেপে ধরে শুইয়ে দাও সম্রাট।'

—'দাসবাবু...সেডেটিভ দিন...এক্ষুনি...ইমিডিয়েটলি...পাল্‌সরেট হু হু করে বাড়ছে

—'হ্যাঁ...একমিনিট।'

—'হোয়াট একমিনিট? কুইক...ফাস্টার...আর ধরে রাখা যাচ্ছে না।'

কেউ জোর সে আমায় তার হাওয়ালে রেখেছে। আমি পুরা তাকৎ দিয়ে তার সঙ্গে জঙ্গ লড়ছি। ও কি জামশেদ! নাঃ...ও তো জামশেদ নয়। ও আমার সিপাহশালার। ও কি বগাওয়ত করেছে? আমারই মতো?

বাহোঁমে কীসের একটা দর্দ হল। সফেদ ধুন্দ ছেড়ে যাচ্ছে... আবার... আবার...!

—'কিছু বলবেন স্যার? ...কিছু বলতে চাইছেন?'

আমি বহোৎকুছ বলতে চাইছি। আমি বলতে চাইছি—উয়ো লড়কি কৌন হ্যায়? অগর ও মাশুকা হ্যায়, ফিরভি ওকে নিজের সবকিছু দিয়ো না! ঔরৎকে ভরোসা নেই। বেওয়াফার জাত, ওরা প্যায়ার বোঝে না, ইশ্‌ক্ বোঝে না। ওরা প্যায়ার করে সির্ফ আপনি মতলবের জন্য...হুকুমতের জন্য...খুবসুরতির এলান করার জন্য...হুস্‌ন্ এর নিশাঁ-এ-ফতেহ ওড়ানোর জন্য। ওরা মর্দকে মিঠি বাতোঁমে কমজোর করে সির্ফ আপনি হক জমানোর জন্য—মর্দের দিল, দিমাগ, মসনদে নিজের হক জমানোর জন্য। ওরা বহুরূপী...ওরা জহরিলা...ওদের বিশ্বাস কোরো না...বিশ্বাস কোরো না...ভরোসা মৎ করনা।

আবার অভিজিতের কথা

কেলো আর কাকে বলে?

বেচারা অর্ক! কী কুক্ষণে যে প্রফেসর মুখার্জির তালে তাল মেলাতে গিয়েছিল। এখন লাও ঠ্যালা! কেৎ মারতে গিয়ে জব্বর একখানা কেস খেয়ে গেছে। তিস্তার মাথা ফেটেছে। তার সাথে সাথে মুখও ফুটেছে। একটু আগেই এই উপলক্ষ্যে একচোট কিক বক্সিং হয়ে গেল। দুজনের মধ্যে কেউই কেল্লা-ফতে করতে পারেনি। তাই উপস্থিত ইন্টারভ্যাল চলছে।

কাল রাতের কথা মনে পড়লে এখনো মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়। সে কী মূর্তি কৌশিক রুদ্রর! এক ঝটকায় তিস্তা আছড়ে পড়ল দেওয়ালে। মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত। ভাগ্যিস সম্রাট ছিল। ও-ই শেষ পর্যন্ত বুড়োকে কষে পাকড়াও করে ইঞ্জেকশান দিয়ে ঘুম পাড়াল। ততক্ষণে তিস্তার অবস্থা বেহাল। আর অর্কও বলিহারি! কোথায় নিজের বউকে সামলাবে—তা নয়, নিজেই প্রায় মুচ্ছো যায় আর কী! রক্ত দেখে এমন হোয়াইট ওয়াশ মুখে বসে পড়ল যেন এক্ষুনি হার্টফেল করবে। অগত্যা অগতির গতি সেই সম্রাট। তিস্তাকে সটান ঘাড়ে তুলে হাসপাতালের দিকে দে দৌড়।

কিন্তু ব্যাপারটা বোধহয় তিস্তার বিশেষ পছন্দ হয়নি। দুজনের মধ্যে এই নিয়ে বিস্তর ঝাল ঝাল কথাবার্তা হয়েছে।

আর এই দুই রাজার মধ্যে উলুখাগড়া হয়ে আমি, সম্রাট এবং প্রফেসর মুখার্জি বসে আছি। মাঝখানে হনোলুলু-হাতিবাগান সাইলেন্স। প্রফেসর মুখার্জির প্রায় সসেমিরা দশা। যুযুধান দুই পক্ষের নন-কো অপারেশন আন্দোলন কীভাবে ঠেকাবেন বুঝতে পারছেন না। আমি চিরকালই 'প্রকাশ্যে মন্তব্য করিব না' নীতিতে বিশ্বাসী। আর সম্রাট চুপচাপ্তী। এমনিতেই ওর মুখ

থেকে বাক্যি কম আর পকেট থেকে নোট বেশি খসে। কিন্তু গতকাল সকালের ঘটনার পর থেকেই সে যেন আরো বেশি চুপ মেরে গেছে। আমাকে একটু অ্যাভয়েডও করছে।

আমি অবশ্য আজ সকালেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলাম। কাল সকাল থেকেই বিবেকখুড়ো তুর্কি নাচ নাচছিলেন। বেহুঁশ অবস্থায় যন্ত্রণাকাতর সম্রাটকে দেখে বেচারার বহুৎ দরদ হয়েছিল। তাই সাতসকালেই এমন একখানা মোক্ষম টান মারলেন যে আমি কথা নেই বার্তা নেই বিছানা ছেড়েই সটান সম্রাটের ঘরে।

তখনো ও শেভ করছে। আমায় দেখে একটু যেন বিরক্ত বোধ হল।

—'আসব?'

—'অলরেডি এসেই গেছিস।'

—'আই অ্যাম সরি সম্রাট। কাল আমার কথাটা ওভাবে বলা উচিত হয়নি। আমি সত্যিই রিপেন্ট করছি...।'

—'স্টপ।' ও তোয়ালে মুখ মুছল। তারপর বলল—'গেট আউট।'

শা-লার তেজ দেখো! বেওয়ারিশ মাল! তবু গুমর কমে না!

—'বাট সম্রাট...।'

—'গেট আউট আই সে!'

কীসের এত তেজ! কীসের এত অহঙ্কার! কী ভাবে নিজেকে! আকবর বাদশা! না সাদ্দাম হুসেন! গুণের মধ্যে ভগবান মালদার করেছেন আর চেহারায় বিষাক্ত সৌন্দর্যের সবটাই উপুড় করে ঢেলে দিয়েছেন। ওই সুন্দর শরীর আর পকেটের ফ্রিকোয়েন্সিতেই যে কত মেয়ের সিগন্যাল জ্যাম করেছে তার ঠিক নেই। ওরকম সুন্দর নির্লিপ্ত মুখে ও বোধহয় খুনও করতে পারে।

—'কটা বাজে রে অভি?'

তিস্তা বিছানার উপরে টানটান হয়ে শুয়েছিল। কপালে তিনটে স্টিচ পড়েছে। প্রফেসর রুদ্রর চেহারাটা কাঁকলাসের মতো হলে কী হবে? মালটা খেপে গেলে একেবারে ম্যামথ। তখন সম্রাট ছাড়া তাকে আর কেউ সামলাতে পারে না।

—'ন'টা বেজেছে।'

—'জানলার পর্দাটা টেনে দে তো। রোদটা ভালো লাগছে না।'

—'কেন? রোদ্দুরটা তো বেশ হালকা!'

—'আমার ভালো লাগছে না।'

তিস্তা পাশ ফিরে শুল। বুকের কাপড়টা নড়াচড়ার ফলে আচমকা হঠাৎ সরে গেছে। পেটের অনেকটাই খোলা। তলপেটে সামান্য একটু চর্বি জমে ওকে আরো সেক্সি করে তুলেছে। নাভি গভীর। সব মিলিয়ে একেবারে কোনারকের পীস। অর্কটার কপাল মাইরি!

সম্রাট যেন একটু উশখুশ করছে। ওর চোখদুটোর অদ্ভুত একটা খিদে আছে। ভিখিরির খিদে নয়। বাঘের খিদে! ছিঁড়ে খাওয়ার খিদে! কেড়ে খাওয়ার খিদে। মেয়ে দেখলেই ওর চোখ যেন দাঁত নখ বের করে ফেলে।

তিস্তা কি বুঝতে পারছে না যে ওর আঁচলটা সরে গেছে! কীভাবে এমন শরীর ছেড়ে দিয়ে শুয়ে আছে? সত্যিই কি বুঝছে না? না অন্য কিছু...। কলেজে পড়াকালীন অনেক ছেলেকেই ও একসাথে নাচিয়েছে। এখানেও সম্রাটকে হাওয়া দিচ্ছে না তো?

—'সম্রাট...!' তিস্তা সম্রাটের উরুর উপর আলতো চাপ দিয়ে বলল—'একটু জলের গ্লাসটা এগিয়ে দেবে? সঙ্গে ওই ওষুধটাও। বড্ড ব্যথা হচ্ছে।'

সম্রাট শিউরে ওঠে। নির্ঘাত ওর ঘাড়া হয়ে গেছে। কেমন হিপ্‌নো-টাইজ্‌ড গিনিপিগের মতো বলল—'কোন্‌টা দেব?'

সত্যিই তো! তিস্তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে ও দেখবে কী করে যে কোন্‌টা দিতে বলা হচ্ছে। ওষুধটা বিদ্যুৎ মুখার্জি দিতে পারতেন না?

—'ওই যে গোলাপি রঙের।'

—'গোলাপি!'

—'গোলাপি রঙের ওষুধটা দাও।'

সম্রাট এবার যেন একটু ধাতস্থ হয়েছে। সে উঠে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে ওষুধের ফয়েলটা নিয়ে এসেছে।

—'একটা খুলে দেবে প্লিজ!

অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েল থেকে সামনের ট্যাবলেটটা চাপ দিতেই বেরিয়ে এল। ওষুধ নেওয়ার সময় হাতে হাতে ছোঁয়াছুঁয়ি হল। জলের গ্লাস দেওয়ার সময় শুধু ছোঁয়াছুঁয়িই নয়, চোখাচোখিও হল।

নিশ্চিত হলাম। তিস্তা সম্রাটকে হুকছে। রীতিমতো গুছিয়ে হুকছে। কিন্তু কেন? কেন এমন করছে? অর্কর মতো ভালোমানুষ স্বামী পেয়েও কেন আবার ওর চুলকুনি শুরু হয়েছে? ওকি জানে যে ঘুমন্ত সিংহের ঘুম ভাঙানো কতটা

বিপজ্জনক? এখন মজা পাচ্ছে। পরে সামলাতে পারবে তো?

ধুত্তোর! আমার কী? আমি হাত পা গুটিয়ে বসে স্রেফ তামাশা দেখব। কার খেতের আপেল গরুতে খাচ্ছে তা আমার দেখার দরকার কী? চুলোয় যাক।

সকালটা বেশ গুমোট করেছে। এ ক'দিন ধরে রোজই প্রায় বিকেলের দিকে ছিঁচকাঁদুনে পিসির মতো বৃষ্টি এসে উপস্থিত। আজও হয়তো একচোট আসবে। এইমুহূর্তে অবশ্য বৃষ্টি না থাকলেও একগুচ্ছ মোষের মতো কালো মেঘ শিং উঁচিয়ে সূর্যিমামাকে গুঁতো মারতে লেগেছে। হাওয়ার 'হ'-ও নেই। বেশ ভাপ ভাপ একটা গরম। এ গরমে চিড়ি পোড়া না হলেও কচুসেদ্ধ হওয়া যায়।

—'অভিজিৎ, যার মাথা ফেটেছে তাকে জিজ্ঞাসা কর ব্যথাটা এখন খানিকটা কমেছে কিনা।'

অর্ক এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে—হঠাৎ হুড়মুড় করে ড্রামাটিক টেম্পোয় ঘরে ঢুকে পড়েছে। এন্ট্রির সাথেই একটা উৎপটাং প্রশ্ন।

পেট ফেটে হাসি পেল। কেন যে এরা প্রেম করে!—কেন যে বিয়ে করে—আর কেনই বা ঝগড়া করে—এর পুরোটাই আমার কাছে একবাক্স বিস্ময়সূচক চিহ্ন। এ অঙ্ক তো আর খিটা, গামা, ল্যাম্ডার ফর্মুলায় চলে না। এ হচ্ছে গিয়ে কিমিতি বিদ্যা আর ডাক্তারি শাস্ত্রের হচ্‌পচিয়াম কচ্‌কচিনেট স্টেফাইলো কলহ কক্কাস। ভয়ানক ভাইরাস! —যার কোনো অ্যান্টিডোট নেই।

—'অভি, লোকটাকে বলে দে আমার মাথার খবর নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি ভালো আছি।'

আমার বলতে বয়েই গেছে। বেতার তরঙ্গে ভাবব্যাচ্যে ভালোই কথা চলছে। খামোকা কাবাব মে হাড্ডি হতে যাব কেন?

—'সকাল থেকে কিছু পেটে পড়েছে?'

—'তাতে তোমার কী?'

—'তিস্তা, এটা কী হচ্ছে? সব কথার এমন বাঁকা উত্তর ভালো লাগে না।'

—'তোমার ভালো লাগে না!' তিস্তা ফুঁসে উঠল—'সব কিছু তোমারই ভালো লাগার উপরই নির্ভর করে, না? তোমার যেটা ভালো লাগবে সেটাই আমায় করতে হবে তাই না?'

—'কী আশ্চর্য! আমি কি তাই বলেছি?'

—'তাই তো বলে আসছ। তুমি যেটা বলবে সেটাই ফাইনাল। আমাকে

একবারও বলার প্রয়োজন বোধ করো না।

—'কোন্ ব্যাপারে আমি তোমার কোন্ কথাটা শুনিনি?'

—'প্রফেসর রুদ্রকে এখানে আনার বিষয়ে তুমি আমার সাথে আলোচনা করেছিলে?

—'প্রফেসরের বিষয়ে আমি তোমায় বলিনি?'

—'বলেছিলে অর্ক। কিন্তু আলোচনা করোনি। আমার মতামত জানতে চাওনি।'

—'উঃ...আবার সেই এক কথা। তোমার মতামতের দরকার ছিল না...।'

—'এগজ্যাক্টলি। আমার মতামতের প্রয়োজন তোমার কাছে কোনো দিনই নেই অর্ক।'

তিস্তা শুয়ে পড়ে বলল--'আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না। প্লিজ...।'

—'What ভালো লাগছে না?' অর্ক চটে গিয়ে বলল—'কী বলতে চাও তুমি? আমি তোমার কথার দাম দিই না? তোমায় অবহেলা করি? তোমায়...।'

—'আমার কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

—'কিন্তু আমার লাগছে। বলো...প্রশ্নের জবাব দাও।'

তিস্তা আবার ঠান্ডা অথচ শক্ত গলায় বলল—'আমার ভালো লাগছে না অর্ক।' অর্ক এবার যেন খানিকটা ব্যাকফুটে চলে গেল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল—'বেশ, ঠিক আছে।'

এদিকে ঝগড়া তো ওদিকে মাখোমাখো প্রেম। এদিকে চড়ুইয়ের খ্যাঁচ-খ্যাঁচ তো এদিকে শালিখের ঠোঁটে ঠোঁট মেলানো। এটাই তো জীবন— that's life. অর্কদের রুমে উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছিল। বেগতিক দেখে প্রফেসর মুখার্জি আর সম্রাট আগেই পিটটান দিয়েছিলেন। আমিই প্রায় ক্যাসাবিয়াঙ্কা হয়ে আগুনে-জাহাজ পাহাড়া দিচ্ছিলাম। কিন্তু পেছনে যেই ছ্যাঁকা লেগেছে, অমনি সটান জলে লাফিয়ে না পড়ে উপায়ও ছিল না।

কোনোমতে নিজের প্রাণটা হাতে নিয়ে করিডোর দিয়ে পালাচ্ছি। গলাটা খুশখুশ করছে। অনেকক্ষণ সিগ্রেট না খেয়ে আছি। ঘরে ফিরে সুখটান না দিলে আর চলছে না। অর্ক-তিস্তার কামেলায় ফেঁসে গিয়ে সিগারেট আনার কথাও ভুলে গিয়েছিলাম। স্টকে আছে কিনা কে জানে। নয়তো সম্রাটের কাছে...।

নাঃ, চাইব না। ওর কাছে কিছুতেই সিগ্রেট চাইব না। আশেপাশে অনেক

দোকান আছে। সেখান থেকে কিনে নেব। তা না হলে অর্কর কাছে চাইব। না... অর্কর তো অন্য ব্র্যান্ড। ঠিক আছে। সিগ্রেট খাবই না। দরকার পড়লে শালা সিগ্রেট খাওয়াই ছেড়ে দেব। কিন্তু সম্রাটের কাছে নয়, কিছুতেই নয়।

নিজের মনেই বীররসাত্মক ভাষণ দিয়ে চলেছি। সামনেই পড়ল বন্দনা।

—'অভিজিৎদা, দাঁড়াও।'

দাঁড়িয়ে পড়লাম। মেয়েটাকে আমি এমনিতেই দু'চক্ষে দেখতে পারি না। তার উপর আবার সম্রাটের পোষা মেনি। এক্ষুনি এসে ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলবে—সম্রাটদাকে দেখেছ অভিদা?

—'তোমার সাথে আমার একটু জরুরি কথা ছিল।'

আইব্বাস! জরুরি কথা! তাও আমার সঙ্গে! ও বাপ্পে! সূর্যিটা কোন্ দিকে উঠেছে!

—'বল কী বলবি।'

বন্দনা আশেপাশে তাকাল। তারপর নীচু গলায় বলল—'এখানে নয়। ছাতে চলো।'

—'কেন রে? পার্সোনাল বুঝি?'

—'খুবই পার্সোনাল। চলো না প্লিজ।'

'প্লিজ' বললে আর যাই কোথায়। বাধ্য হয়েই বললাম—'চল।'

এ হোটেলটার ছাতটা খাসা। উপর থেকে মোটামুটি হায়দরাবাদের অনেকখানি দৃশ্যই দেখা যায়। আশেপাশে ফুলের কেয়ারিতে ছাতটা বেশ জম্পেশ বিশ্রামের জায়গাই হতে চলেছিল। কিন্তু কালাপাহাড়ের মতো তাগড়াই জলের ট্যাঙ্কটাই মাটি করেছে।

ফুরফুরে হাওয়ায় বন্দনার কয়েকগাছি চুল উড়ছিল।

—'বল এবার কী বলবি? বলে ফ্যাল।'

ও চোখ তুলে তাকাল। কান দুটো হঠাৎই লাল হয়ে গেছে—'না...মনে হয় তুমি বোধহয় সবটাই জানো। মানে...সম্রাটদাকে...।'

—'তুই চাস—তাই তো?'

—'আমি ভালোবাসি।'

—'ভালোবাসিস!'

হাসি আর চাপতে পারলাম না। ফোয়ারার মতো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল।

—'তুমি হাসছ?'

কোনোমতে নিজেকে থামানোর চেষ্টা করতে করতেই বললাম—'হ্যাঁ, তারপর?'

—'হাসছ কেন তুমি?'

—'না, ওই যে বললি সম্রাটকে ভালোবাসিস।'

—'তাতে হাসির কী হল?'

—'না। কিছু হয়নি। বল...হিঃ...হিঃ...হিঃ...ওরে বাবা...তারপর?'

—'আমি ওকে বিয়ে করতে চাই।'

কী সর্বনাশ! বিয়ে! সম্রাটকে বিয়ে! ভাবা যাচ্ছে না।

হাসি চেপে বললাম—'বিয়ে...তা বেশ তো। করে ফ্যাল না। প্রবলেম কোথায়?'

'প্রবলেম একটাই। সম্রাটদাকে আমি বুঝতে পারছি না। ও আমায় ভালোবাসে কিনা বুঝতে পারছি না।'

—'সেকী! তুই ওকে বলিসনি? প্রপোজ করিসনি?'

—'করেছি। কিন্তু হ্যাঁ...না কিছুই বলেনি। কেমন যেন বোকার মতো হাঁ করে তাকিয়েছিল। রাতে কথা নেই বার্তা নেই করিডোরে পাগলের মতো...।' সে আবার লাল হয়ে গেছে...

—'আমি জানি তুমি পুরোটাই জানো। তোমায় সেদিন আমি করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তাই লজ্জার মাথা খেয়ে তোমাকেই বলেছি।'

—'হ্যাঁ...কিন্তু ওই ঘটনা থেকেই তো প্রমাণ হয় যে ওই হাতেও তালি বাজছে।'

বন্দনার মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেছে। গলার কাছের হাড়টা নড়ে উঠল—'না—অভিদা। কিছুই প্রমাণ হয় না। সেদিন ওর মুখে আমি মদের গন্ধ পেয়েছি। ও নেশার ঘোরে ছিল। যা করেছে ড্রাঙ্ক অবস্থাতেই করেছে। কিন্তু তারপর থেকেই আমাকে কেমন যেন অ্যাভয়েড করছে। আমার সাথে একা কোথাও মিট করছে না।'

আরেঃ! এটা তো নতুন খবর! একা মেয়ে পেয়েও সম্রাট কাঁপাচ্ছে না! অরুচি ধরল নাকি! না হিমালয় যাওয়ার তাল করছে!

—'গতকাল যখন ও অসুস্থ ছিল তখন আমি ওর কাছে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম হয়তো কিছু বলবে। কিন্তু ও আমায় টোট্যালি অ্যাভয়েড করছে।'

যাঃ শালা!

আমি আরেকবার জোরে হেসে উঠতে যাচ্ছিলাম। বন্দনার চোখে চোখ পড়তেই হাসিটা হাওয়া হয়ে গেল। ওর চোখ ভেজা! বন্দনা কাঁদছে! সম্রাটের জন্য কাঁদছে! একটা মাতাল, লম্পটের জন্য কাঁদছে!

—'একী! বোকার মতো কাঁদছিস কেন?'

বন্দনার ঠোঁটদুটো ফুলে ফুলে উঠছে—'অভিদা, তুমি প্লিজ সম্রাটদার সাথে ও বিষয়ে কথা বলবে? আমি আর পারছি না। তুমি জানো না...আমি... আমি...।'

হেজে গেলাম। মেয়েটা বলে কী? এই তো কয়েকদিনের আলাপ। এর মধ্যেই সম্রাটকে এমন ভালোবাসল কী করে? এ যে কেঁদেই ভাসিয়ে দিচ্ছে দেখছি!

কিন্তু আমি কী করব? এ বিষয়ে সম্রাটকে যদি কেউ কিছু বলার হিম্মৎ রাখে—তবে সে অর্ক, আমি নই। তা ছাড়া এ তো উলুবনে মুক্তো ছড়ানো! সম্রাটের মতো গোদাবুদ্ধির লোক কি এই চোখের জলের দাম দেবে? মদ-মেয়ে-মাংসেই যার জীবনের ভূত-অ্যালিয়েন সে কি এই ছোট্ট মেয়েটার অনুভূতি বুঝবে?

—'আমি ওকে ছাড়া বাঁচব না অভিদা। প্লিজ তুমি ওর সাথে কথা বলো। প্লিজ। তোমার পায়ে পড়ি।'

—'করিস কী!' বন্দনা হাঁটু গেড়ে বসেই পড়েছিল। আমি ওর হাত ধরে টেনে তুলি—

—'বোকা মেয়ে! কাঁদিস না । কথা বলব।'

একটু আলো। আর তারপরেই গন্‌গট। যে টেগোর মহাশয় লিখেছিলেন, 'একী সুগন্ধ হিল্লোল বহিল আজি প্রভাতে' তিনিই আবার সাতসকালে চিরতা খেয়ে গান জুড়েছিলেন—'বা-জে করুণ সুরে-এ-এ-এ...।'

ঠিক এমনই দশা প্রফেসর মুখার্জির। সুলতান কুলি মহারাজের মুখের পানে চেয়েই তিনি কখনো খুশি, কখনো বা অখুশি থাকছেন। কখনো মনে হচ্ছে ওই বুঝি তার হুঁশ ফিরল। আবার কখনো যথারীতি 'ন যযৌ ন তস্থৌ' দশা। জানগম্যি কিছু নেই, একেবারে চোখ উলটে 'ব্ল্যাক'-এর রানি মুখুজ্যে।

তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হয় যে মুখুজ্যেমশায়ের জেদ আছে।

বন্দনার সাথে কথা বলে যখন নিজের ঘরে ফিরলাম তখন তিনি এক বাটি স্যুপ নিয়ে সুলতান রুদ্রর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছেন।

হাতে গরম স্যুপের বাটি। পাঞ্জাবিতে স্যুপ-নুডলস মাখামাখি। টম্যাটো কেচ-আপে হাত প্রায় প্রথম পানিপথ। প্রফেসর মুখার্জি লাজুক হেসে বললেন—'সরি অভিজিৎ। তোমায় না বলেই ঘরে ঢুকে পড়েছি।'

—'নো প্রবলেম।' আমি হেসেই বললাম—'ওঁকে ব্রেকফাস্ট করাতে এলেন বুঝি?' বিদ্যুৎ মুখার্জি ভারী সন্দেহ দৃষ্টিতে কৌশিক রুদ্র'র দিকে তাকালেন। প্রফেসর রুদ্র তখন কী ভাবনায় যেন ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দেশের জনগণ হঠাৎ বিদ্রোহ করেছে, না কৃষকেরা খাজনা দিচ্ছে না তা কে জানে! কিন্তু কোথাও একটা সমস্যা ঘটেছে তা নিশ্চিত! মুশকিল একটাই, লোকটার সমস্যাগুলোর কোনোটাই একবিংশ শতকের নয়—ষোড়শ শতকের। তাই তার সমস্যা সমাধানের জন্য টাইম মেশিন ধার করতেই হবে।

—'তিস্তার কপালটা অনেকখানিই কেটেছে। তার উপর আজ তো আবার ফিল্মসিটির প্রোগ্রাম।' প্রফেসর মুখার্জি চিন্তান্বিত হয়ে বললেন—'হঠাৎ হঠাৎ যে কেন খেপে ওঠে লোকটা! অথচ এখন দেখো। কী আশ্চর্য শান্ত হয়ে বসে আছে! কাল রাত্রে কী পরিমাণ খেপে উঠেছিল তা এখন দেখলে কেউ বলবে?'

প্রত্যুত্তরে দাঁত বার করে বেবুনের মতো হাসা ছাড়া উপায় নেই। এ ব্যাপারটা আমার খোপরিতে ঢোকে না। পাগল ছাগল নিয়ে তো কখনো ঘর করিনি। তাই এসব সাইকোলজি বোঝার চেয়ে হাতিকে জাঙিয়া পরানো অনেক সোজা।

—'কী অদ্ভুত মেলবন্ধন দেখো।' প্রফেসর মুখার্জির চোখ চকচক করে উঠল—'তুমি, আমি, অর্ক—আমরা সবাই জানি এই মানুষটার নাম কৌশিক রুদ্র, তিনি পেশায় ইতিহাসের প্রফেসর। তাঁর বাসস্থান কলকাতায়। এগুলি সব আমরা জানি। অথচ ভিতরে ভিতরে মানুষটা তা নয়। তিনি অন্য কিছু—অন্য কোনোখানে রয়েছেন। আমরা যা দেখছি তিনি তা দেখছেন না। তিনি ষোড়শ শতাব্দীকে দেখছেন। অথচ উনি আছেন টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে। অদ্ভুত নয়? কী বলবে তুমি একে?'

—'Is it so professor?'

—'It is অভিজিৎ।'

প্রসঙ্গটার দম আছে। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'তা হলে উনি আমাদের দেখছেন না?'

—'না।'

—'তবে উনি দেখছেনটা কী?'

—'উনি তোমায় দেখছেন ঠিকই—কিন্তু জামশেদ হিসাবে দেখছেন। অর্ককে হয়তো উজির ভাবছেন। সম্রাটকে হয়তো সেনাপতি অথবা ইব্রাহিম মনে হচ্ছে।'

যাচ্চলে! তার মানে বুড়ো এখনো ফ্ল্যাশব্যাকে বসে আছে? আর আমরা যে তার সামনে এত বকবক করে মরছি তার কোনোটাই ওর মাথায় ঢুকছে না! এ আবার কী ক্যাচাল রে বাপু! ভগবান কি এই টু-ইন-ওয়ান পিসটাকে পাঠানোর আগে ওর আইডেন্টিটি কার্ডটা ইস্যু করে দেননি?

—'আপনি তো আগেও ওঁকে দেখেছেন স্যার। বরাবরই কি এরকম?'

—'আমি ওঁকে দেখেছি মাত্র কয়েকবছর।' প্রফেসর মুখার্জি হাসলেন।

—'আমি যখন দেখেছি তার বেশ কিছু বছর আগে ওঁর ডিভোর্স হয়েছে। শুনেছি তার আগে কৌশিক রুদ্র একটি দর্শনীয় বস্তু ছিলেন। কিন্তু স্ত্রী চলে যাওয়ার পর থেকেই কেমন ছন্নছাড়া হয়ে গেলেন। আমি যখন দেখেছি তখন এই রোগটা একটু একটু করে আসছে।'

প্রফেসর একটু থামলেন। কৌশিক রুদ্র মুখের সামনে ধরা স্যুপের বাটিটা সরেজমিনে পরীক্ষা করছেন।

—'এটা কী? জহর?'

—'না স্যার, এটা স্যুপ। এটা খেতে হবে। আপনার খিদে পায়নি?'

কৌশিকবাবু লক্ষ্মীছেলের মতো শান্ত হয়ে চামচটাকে জিভ দিয়ে চেটে চেটে দেখছেন।

তার দিকে তাকিয়েই বিদ্যুৎ মুখার্জি আবার বললেন—'বয়েসটা তখন অল্প ছিল। বিশেষ কিছু বুঝতাম না। মানুষটাকে ভীষণ ভালো লাগত। আবার তার অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা দেখে হাসিও পেত। লোকটার পিছনে যে কত হেসেছি...'

—'আপনারা ভাবতেন এটা নিছকই পেঁচোমি, তাই না?'

—'পেঁচোমি ভাবিনি অভিজিৎ, আসলে বাস্তব দুনিয়ায় কোনো অসংগতি দেখলেই আমাদের হাসি পায়। মানুষটার করুণ অবস্থাটা তখন

এতটাই অবাস্তব লেগেছিল যে না হেসে পারিনি। আজ আফশোশ হয়। আমাদের এই হাসির সামনেই কৌশিক রুদ্র কুঁকড়ে যেতেন। যন্ত্রণা পেতেন। নিজেকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিয়ে একটা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতেন। অথচ তখন যদি একটি মানুষের সমবেদনার হাত তার দিকে এগিয়ে যেত তবে...এই যাঃ...

প্রফেসর রুদ্র মুখ দিয়ে ধাক্কা মেরে স্যুপের বাটিটা উলটে দিয়েছেন।

—'ব্যাস...হয়ে গেল।' দুহাত দিয়ে পাঞ্জাবি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

—'এটা কি তবে আপনার প্রায়শ্চিত্ত?'

একটুকরো সেদ্ধ মটরদানা প্রফেসরের পাঞ্জাবিতে লেগেছিল। সেটা ঝেড়ে ফেলে আমার দিকে তাকালেন। বাদামি চোখদুটো হঠাৎই জ্বলে উঠল— 'না, অভিজিৎ। প্রায়শ্চিত্ত নয়। বাস্তবকে স্বীকার করছি মাত্র।'

—'এ আবার কেমন বাস্তব। একটা লোক পাঁচশো বছরের ভূতকে মাথায় চাপিয়ে বসে আছে এটা বাস্তব?'

—'না, সেটা বাস্তব নয়। কিন্তু প্রফেসর রুদ্রর আইডেন্টিটি ক্রাইসিসটা বাস্তব। উনি জানেন না যে উনি আসলে কে।'

—'বুঝলাম না।'

—'বুঝবে না অভিজিৎ। কারণ তোমার জীবনে এখনো হয়তো ঝড় আসেনি।'

—'ঝড়!'

—'হ্যাঁ, একটা ঝড়। যা সব ওলোটপালোট করে দেয়। বুঝিয়ে দেয় যে আমরা বাইরে যা, ভিতরে আসলে ঠিক তা নই। বাইরের পরিচিত এই আমিটা ছাড়াও আর একটা আমি আছে। সে আমাদের দ্বিতীয় মুখ। দ্বিতীয় আমি।'

উনি কি হিব্রু বলছেন? পুরো ব্যাপারটাই অ্যান্টেনার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল যে।

—'আজ তুমি একথা বুঝবে না অভিজিৎ। এর জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।'

—'মানে? আপনি তা হলে বুঝবেন কী করে স্যার? তবে কি আপনার মধ্যেও এমন আরেকটা আপনি আছে? তা হলে কি আপনি যা, আপনি তা নন?'

প্রফেসর মুখার্জি বিষণ্ণ হাসলেন। ধরা গলায় বললেন—'বাদ দাও না।'

আইডেন্টিটি ক্রাইসিস!

সেটা কী পদার্থ? খায় না মাথায় মাখে?

প্রফেসর মুখার্জির কথা কেমন যেন হেঁয়ালি ভরা। যেন মডার্ন আর্ট। কিছু বোঝা গেলেও বেশিরভাগটাই বোঝা যায় না। এসব হচ্ছে গুরু উপরতলার ফান্ডা। আমাদের মতো ল্যাদ খাওয়া পাবলিকের বোঝার চেষ্টা করাই বৃথা।

কালকের দিনটা বেশ আলসেমি করেই কেটে গিয়েছিল। কোথাও যেতে হয়নি। সাতসকালে ঘুম থেকে উঠেই দাঁত মাজতে হয়নি। ব্রেকফাস্ট সেরে ফুলবাবুটি সেজে সুমোয় চেপে ছাতিফাটা রোদ্দুরে টোটো করে ঘুরতে হয়নি। কিন্তু আজ আর ছাড়ান ছোড়ন নেই। হায়দরাবাদে এসে রামোজি ফিল্ম সিটি দেখব না, তা কি হতে পারে? অন্তত তা হতে পারলেও অর্ক কি তা হতে দেবে? আদৌ নয়। নিজে না যাক অন্যকে যাইয়েই ছাড়বে। তাই দশটা বাজতে না বাজতেই হতচ্ছাড়া শিবাকুমারণ বত্রিশ পাটি কেলিয়ে তাড়া দিতে লেগেছে—'চলিয়ে...চলিয়ে।'

কোনোমতে দুটো নাকে মুখে গুঁজে হুড়ুম হাড়িম করে আবার অর্কদের ঘরে ঢুঁ মারলুম। সেখানে এখন 'ঠান্ডি অভিমান' চলছে। অর্ক আর তিস্তা দুজনেই এখন নবরত্ন তেল। ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল। রাগ তো নয়—শালা মাথা ধরার ট্যাবলেট। যতক্ষণ না আদরের স্যারিডন পড়ছে ততক্ষণ গাণ্ডুর মতো রগ টিপে বসে থাকো।

—'আমরা রামোজি ফিল্ম সিটি দেখতে যাচ্ছি। তোর যা অবস্থা তাতে তো তুই যেতে পারবি বলে মনে হয় না।'

তিস্তা কোনো জবাব দিল না।

—'অর্ক কি যাবে?' খুব কুণ্ঠিত স্বরে জানতে চাইলাম। যদিও প্রশ্নটা করা নেহাতই অপ্রয়োজনীয়। অর্কর মতো 'জরু কা গুলাম' বউয়ের মাথাসেবা ছেড়ে ধেই ধেই করে ফিল্মসিটি দেখতে যাবে একথা দুঃস্বপ্নেও ভাবা যায় না। তবু বললাম! কার্টেসি বলে তো একটা কথা আছে।

কিন্তু যা ঘটল তাতে প্রায় পিলে চমকে গেল। তিস্তা কিছু বলার আগেই তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল অর্ক। চোখ, নাক, মুখ লাল। চোয়াল শক্ত।

—'আমি রেডি অভি। নীচে গিয়ে দ্যাখ ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়েছে কিনা।'

কথাটা বলতে চাইনি। কিন্তু আলটপকা মুখ দিয়ে বেরিয়েই গেল—

—'উরিঃ শালা—তুই যাবি?'

—'হ্যাঁ, যাব। কেন?'

—'না, মানে। তিস্তার মাথা ফেটেছে তা-ও...।'

—'যা বলছি তাই কর। নীচে গিয়ে দ্যাখ ওরা রেডি হয়েছে কি না।'

জো হুকুম! হুকুম পালন করে বাইরে বেরিয়েই আসছিলাম। কানে এল তিস্তা বলছে—'নিজের জেদটাই রাখলে শেষ পর্যন্ত! চললে?'

—'হ্যাঁ, চললাম।'

—'থ্যাঙ্কস।'

কী হচ্ছে এসব? অর্ক-তিস্তার মধ্যে এমন কথাবার্তাও হতে পারে তা ভাবতেই পারি না। এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কী এমন হয়ে গেল যে অর্কর প্রতি তিস্তার মনোভাব পালটে গেল! এর পিছনে শুধুই কি মাথাফাটা? না অন্যকিছু?

সম্রাট! সম্রাট নয় তো?

শিবাকুমারণের তাড়া খেতে খেতে যখন টাটা সুমোয় চড়ে বসলাম তখনো মনে মনে ওই একটাই প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে আসছে। তিস্তা অর্ককে নেগলেক্ট করছে এটা ঠিক। তিস্তা সম্রাটকে হাওয়া দিচ্ছে এটাও ঠিক। তবে কি দুয়ে দুয়ে চার আর হাতে হ্যারিকেন?

গাড়িতে উঠে দেখি আজকের সফরে অনেকেই অনুপস্থিত। প্রফেসর রুদ্রর তদারকি করার জন্য প্রফেসর মুখার্জি আর সম্রাট হোটেলেই থাকবে। বন্দনার কাল রাতে ঘুম হয়নি। তাই সে আসেনি। অতবড়ো একটা টাটা সুমোয় সবেধন নীলমণি হয়ে বসে আছি আমরা পাঁচজন। আমি, অর্ক, মি. অ্যান্ড মিসেস দাস এবং শিবাকুমারণ।

গোটা রাস্তায় প্রায় মুখে কুলুপ এঁটে বসে কাটালাম। মি. অ্যান্ড মিসেস দাস মাঝেমধ্যেই নীচু স্বরে কথাবার্তা বললেন। বিষয়—প্রফেসর রুদ্র। দাসবাবুর তাকে দেখে মনে হয়েছে যে লোকটা ক্রনিক আমাশার রোগী। তাই নাকি অমন খিটখিটে স্বভাব। অবশ্য মিসেস দাসের তা মনে হয় না। প্রফেসর কৌশিক রুদ্রর চরিত্র সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান। পাগলেরা নাকি সুন্দরী মেয়ে দেখলেই জাপটে ধরে! তখন পাগলামি টাগলামি সব চুলোয় যায়।

—'এ বিষয়ে আপনার কোনো এক্সপিরিয়েন্স আছে'? একটু তামাশা দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না।

—'থাকবে না কেন?' মিসেস দাস এবার ফিরে গেলেন তার যৌবনের কথায়। অল্পবয়সে তাকে কী চমৎকারই না দেখতে ছিল! ওই ভাঁটার মতো চোখ কোনোদিন পটলচেরাও ছিল। ভা-বা যায় না। ওই টিকটিকির ল্যাজ তখন একঢাল পশম-কালো চুল ছিল! ওই পিপে, সেভেন আপের বোতল ছিল! রাস্তা দিয়ে গেলে ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকত...।

শালা, রূপবর্ণনা আর শেষ হয় না! বাধ্য হয়ে বললাম—'তারপর?'

মিসেস দাস আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই তার মুখের উপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে অর্ক বলল—'আপনার রূপ দেখে প্রফেসর রুদ্র আপনাকে জাপটে ধরবেন কি না জানা নেই, তবে ছিনতাইবাজের জাপটে ধরার হ্যাবক চান্স আছে। এত গয়না পরে না বেরোলেই পারতেন।'

কী বেরসিক দেখেছ! জাপটে ধরার গল্পটার ওখানেই ইতি। মিসেস দাস কিছু বলার আগেই রামোজি ফিল্মসিটির বিরাট ব্যানার পেরিয়ে আমাদের গাড়ি হুশ করে ভিতরে ঢুকে গেল।

এরপর যা যা দেখলাম তাতে শালা সিনেমার গুষ্টির পিণ্ডিপাঠ করতে ইচ্ছা করছিল। কী উল্লুই না বানায় এরা?—যা দেখি সব নকল। চা বাগান দেখলাম! শিবাকুমারণ জানাল যে ওই চা খেলে সারাজীবনে কেউ আর চায়ের নাম করবে না। কারণ ওগুলো নাকি চা-পাতাই নয়। এছাড়াও আছে ড্রিমল্যান্ড, অ্যাঞ্জেল ফাউন্টেন, সান ফাউন্টেন, জাগ ফাউন্টেন, মোঘল গার্ডেন, ভূতল গার্ডেন ইত্যাদি। বাগানগুলোয় ঝক্কাস সব ফুল ফুটে আছে। কিন্তু কেউ যদি এই ফুলগুলোর নাম জেনে নিয়ে নিজের বাগানে লাগানোর তালে থাকে তবে সে একটা আস্ত মুরগি। কারণ ওগুলো একটাও আসল ফুল নয়। সব প্লাস্টিকের। ওগুলো আবার হিরো হিরোইনের জামার কালারের সাথে পালটে দেওয়া হয়। এই বাগানেই 'বত্রিশপাটি কেলানে কার্তিক' গোবিন্দা 'কুর্তা ফাঁড়কে' গানটার শুটিং করেছিল। কুর্তা তো ফেঁড়েই ছিল তার সাথে মালটা বাগানেও ফেড়েফুড়ে একসা করেছিল।

উপর থেকে নীচে নামতেই সামনে অনেকগুলো মেয়ের মূর্তি। তিস্তার দেশোয়ালি বোন। জামাকাপড় কিছুতেই সামলাতে পারছে না। অ্যারিস্টটলের দশা আর কী। ভদ্রলোককে পুরো কাপড় পরা অবস্থায় দেখলে চিনতেই পারব না। কোনোদিন একটা খসে পরা কাঁথা ছাড়া আর কিছু পরে থাকতে আমি তো দূরের কথা আমার বাপ-ঠাকুরদাও দেখেছে কি না সন্দেহ। এই মেয়েগুলোর

অবস্থা ঠিক তাই।'

অনেকক্ষণ ধরেই অর্ককে একটু একা পেতে চাইছিলাম। এইবার পেয়ে গেলাম। একেই বিবাহিত লোক। তার উপর বোধহয় উপোসী। ন্যাংটো মেয়ে দেখতে দেখতেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ফলস্বরূপ দাসবাবুদের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ছে।

—'কী দেখছিস বে? তিস্তার মতো লাগছে নাকি?'

অর্ক লাল হয়ে গেল—'কী যে বলিস? সুন্দর মূর্তিগুলো। অনবদ্য আর্ট তাই না?'

—'অনবদ্য তো বটেই। মেয়েদের দুদুন মানেই অনবদ্য।'

—'যাঃ...এসব নয়। আর্ট ইজ আর্ট। গঠন শৈলীটাই অদ্ভুত।'

—'দূর ছাই। তোর ন্যাংটো মেয়ে দেখতে ভালো লাগছে সেটাই বল না বাপু। ওসব আর্ট মার্ট তো অজুহাত।'

অর্ক হেসে ফেলল—'তুই আর বদলালি না অভিজিৎ।'

—'কথা নেই বার্তা নেই খামোকা বদলাতে যাব কেন র‍্যা? ওসব বদল টদল আমার পোষায় না।'

—'সবাইকেই কখনো না কখনো বদলাতেই হয় অভি। অভ্যাসটা করে রাখ। বিয়ের পর কাজে লাগবে।'

সেরেছে! আবার জ্ঞানের কথা শুরু হল। আমি তদন্ত করে দেখেছি যে বাঙালি পুরুষের নব্বই শতাংশ বউয়ের সাথে ঝগড়া হলে সক্রেটিস হয়ে যায়। এক্ষুনি হয়তো প্যানপ্যান করে গানও জুড়ে দেবে—'আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান।'

—'সবাইয়ের কথা বাদ দে। তুই কতটা বদলেছিস বল দিকিনি।'

অর্ক মুচকি হাসল। হাসিটা কেমন যেন দেবদাস মার্কা—'সবই মায়া' গোছের ভাব।

—'জিজ্ঞাসা করলি যখন তখন সত্যি কথাটাই বলি। কখনো কখনো আমার কি মনে হয় জানিস? এই আমি ঠিক আমি নই।'

সব্বোনাশ করেছে! প্রফেসর মুখার্জির ডায়লগ হঠাৎ অর্ক বলতে লেগেছে কেন? আমি আমি নই, সে সে নয়, হরিপদ হরিপদ নয়! এ আবার কী ফান্ডা রে ভাই! 'ইউরেকা'র সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই এক বীর পালোয়ান ভীম সিং-এর মূর্তি পড়ল। কাঁধে একটা মুগুর। ভীমও হতে পারে

ঘটোৎকচও হতে পারে। নিদেনপক্ষে W.W.E.-এর রেসলার। সেদিকে তাকিয়েই অর্ক বলল—'বিয়ের আগে কী করিনি। রাত বিয়েতে দেশি মাল খেয়ে লাট হয়ে হস্টেলে ফিরেছি। শুয়োরের মাংস থেকে উট—কিছুই বাদ দিইনি। রাত বারোটার শোয়ে তোদের সাথে 'ব্লু ফিল্ম' দেখে কোনোমতে লুঙ্গি সামলে সুমলে ঘরে ঢুকেছি। মেয়েদের ঝাড়ি মেরেছি।' বলতে বলতেই ওর চোখদুটো কেমন নিবে এল—'আমি বলছি না যে এগুলো খুব ভালো। কিন্তু সেটাও তো আমার জীবন ছিল।'

—'এ জীবনটাই বা খারাপ কীসের? সুন্দরী স্ত্রী, বাড়ি, গাড়ি, ভালো চাকরি, প্রচুর স্যালারি—সবই তো পেয়েছিস তুই, তাই না?'

—'হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। সুন্দরী স্ত্রীর বাধ্য স্বামী, অফিসে ডাকসাইটে বস, লোকের কাছে পয়সাওয়ালা সম্ভ্রান্ত মানুষ—ব্যাস।'

ও কি বলতে চাইছে বুঝতে পারছিলাম না।

—'তার মানে তুই সুখী নোস?'

—'না, তা বলতে পারি না।' অর্ক রুমাল দিয়ে মুখ মুছল—'আজও আমার ইচ্ছে করে রাতভর মদ খেয়ে ভুল বকতে, আজও ব্লু ফিল্ম আমায় টানে। আজও সুন্দরী মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালোবাসি। তাদের সাহচর্য ভালোবাসি, তাদের সাথে প্রেম করার দুঃসাহসিকতাও দেখাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পেয়েছি কি? তিস্তার জন্য, ওকে পাওয়ার জন্য, খুশি করার জন্য অনেক কিছু আমায় ছাড়তে হয়েছে। আমাকে তিস্তারই মতো করে নিজেকে বদলাতে হয়েছে। আমি ওর পছন্দের স্বামী হতে পেরেছি। কিন্তু তাতে লাভটা কী হয়েছে!'

অর্কর কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত আফশোশ—'তিস্তার অর্ককে পেয়েছি। তিস্তার গড়ে তোলা অর্ক, কিন্তু আমার অর্ক কোথায় গেল্ বলতে পারিস?'

এ কথার কী উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। আচমকা প্রফেসর মুখার্জির কথাই মনে পড়ে গেল। কী যেন বলেছিল লোকটা?

অর্ক কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল। একটু অন্যমনস্ক হয়ে বুক পকেট হাতড়াল। তারপরই হা হা করে হেসে উঠে দমাস করে পিঠে একটা বিরাশি সিক্কা নামিয়ে দিয়ে বলল—'তাই বলি, তোরাই ভালো আছিস রে ছুঁচো। দে আগুনটা পাস কর দেখি।'

ধু-স্ শালা!

আবার তিস্তার কথা

দিনের বেলায় যদি ঘরে অন্ধকার নেমে আসে তবে নিজেকে কেমন যেন অশরীরী ছায়া বলে মনে হয়। ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে যেটুকু রশ্মি সোজাসুজি এসে পড়ে তার মধ্যে কত ছায়া ছায়া ধোঁয়া ধোঁয়া ধুলিকণা মিশে থাকে। ছোটো ছোটো চৌকো চৌকো আবার কখনো বা গোল গোল হয়ে দেওয়ালে আছড়ে পড়ে। তৈরি করে ফোকাস। কখনো মনে হয় নীলাভ, আবার কখনো বা সোনালি। কুতুবশাহী টুম্বসে ঘোরার সময় দেখেছি জাফ্রির ফাঁক দিয়েই এমন সোনালি ধোঁয়া এসে পড়েছে সমাধির শান্ত শীতল বুকে। এক জগতের মানুষকে আরেক জগতের আলো এসে জানিয়ে দিচ্ছে—'তুমি নেই।' কবরের তলা দিয়ে উঠে আসছে ঠান্ডা বাষ্পীয় ভাপ—ড্যাম্পের সাথে সাথে সজল কান্না। আকুল হাহাকার।

ঠিক তেমনভাবেই আজ একরাশ উজ্জ্বল আলোর বিন্দু আমার অন্ধকার ঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মেরে জানিয়ে গেল—'তুমি ভালো নেই তিস্তা।' কালো কালো চাপচাপ অন্ধকারে ছায়া হয়ে মিশে আছি। একফোঁটা আলো তরোয়াল হয়ে এসে পড়েছে আমার নাভিতে। উরু ছুঁয়েছে আরো এক বিন্দু। আর বাকিটা অন্ধকার। শাড়িটা আধখোলা অবস্থায় পড়ে আছে একটু দূরেই। শায়াটাকে গুটিয়ে হাঁটুর উপর তুলে এনেছি। অনেকদিন পর এই ঠান্ডা আমেজটা সর্বশরীর দিয়ে শুষে নিতে চাইছি। শুষে নিতে ভালোও লাগছিল। সবল পুরুষের মতো শীতলতা আমায় জোর করে অধিকার করে নিতে চাইছিল। আমিও তা চাইছিলাম।

পুরুষ! সারাজীবনে একটা পুরুষই তো আমি চেয়েছিলাম। যাকে রীতিমতো যুদ্ধ করে বশ করা যায়। যাকে হাতের মুঠোয় আনা কঠিন। যে

কিছুতেই ধরা দিতে চায় না, সেই পুরুষসিংহকে পোষ মানাতে পারাই নারীজীবনের সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা। অন্যান্য মেয়ের মতোই আমিও তো সিংহই পুষতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু অর্ক সিংহ নয়—বড়োজোর গৃহপালিত ভেড়া। বিয়ের পর পরই সে কথা আবিষ্কার করতে পারিনি। যতদিন যাচ্ছে ততই যেন চোখের সামনে ওর চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ও নিজেও সেটা জানে। ও জানে যে ওর মধ্যে পৌরুষের অভাব আছে। আমি যা চাই, যা ভালোবাসি—ও তা নয়। তাই আমার কণ্ঠস্বর ও চেপে রাখতে চায়। দাবিয়ে রাখতে চায়। আমি সব বুঝি। বুঝি যে এটা ওরই দুর্বলতা—ওরই নিরাপত্তাহীনতা। এ জন্য ওকে আমি অনুকম্পা করেছি, করুণা করেছি, ভেবেছি—যাক, মানুষটা একটু দুর্বল। হতেই তো পারে। সবাই তো সমান নয়।

কিন্তু কাল যা ঘটল তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। আমার মাথা ফেটে গিয়ে তখন দরদর করে রক্ত ঝরছে। নাক, মুখ, চোখ ভেসে যাচ্ছে। সেই ঝাপসা লাল নজরেও দেখলাম অর্ক কেমন অসহায়ের মতো তাকিয়ে। ফ্যাকাশে মুখে ধপ করে বসে পড়ল। যেন মাথাটা আমার নয়, ওরই ফেটেছে। দয়া নয়, অনুকম্পা-করুণা নয়, ভীষণ একটা ক্ষোভ যন্ত্রণা ছাপিয়ে মাথায় ধাক্কা মারল। মনে হল—'ধরণী দ্বিধা হও।' ইচ্ছে করছিল ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কলার ধরে ঝাঁকিয়ে বলি—'একটু পুরুষ হও...একটু পুরুষ হওয়ার চেষ্টা করো।'

কিন্তু এ সবই তো আমি জানতাম। সব বুঝেও তো মেনে নিয়েছিলাম। মানিয়ে নিয়েছিলাম। সুখী সুখী সংসারে ফুলো ফুলো গালের পুতুল হয়ে মন্দই বা কী ছিলাম। তবু তো সুখ ছিল। তবু তো আনন্দ ছিল। একচিলতে অভাব শুধু বিছানায় মরে আসা উষ্ণতায় ছাড়া আর কোথাও ছিল না। দাম্পত্য জীবন কি শুধু বিছানায় প্রাণ পায়? তাই ওই একটু না পাওয়ার দুঃখকে মস্ত বড়ো জীবনের এককোণে ঠেলে দিয়েছিলাম। আর পাঁচটা মেয়ের মতোই ভেবে-ছিলাম যৌনতা শুধুই সন্তান উৎপাদনের জন্য। অর্ক তো সেদিকে অক্ষম নয়। ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিকে আমল দেওয়ার কী দরকার? আমার স্বামী তো ইম্‌পোটেন্ট নয়! কত মেয়ের তো এর চেয়েও কতবড়ো দুঃখ আছে...।

ভুল ভেবেছিলাম। যদি ভুলই না হবে তবে আজ কেন মনে হয় সবটাই মিথ্যে? এতদিন মিছিমিছি শূন্যতাকে পুজো করে এসেছি! শরীরের জ্বালা কেন আমার গলা থেকে উপচে পড়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে? কেন ভিতরে ভিতরে

একটা খিদে আমায় বিদ্রোহের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? একটা অতৃপ্তি প্রলয় নাচ নাচতে নাচতে বলছে—'আমি চাই...আমিও তৃপ্তি চাই...মনের মতো পুরুষ চাই...তার শরীর চাই...পরিপূর্ণ পুরুষ শরীর চাই...আমায় শরীর দাও।'

—'তিস্তাদি।'

দরজায় মৃদু টোকা এসে পড়েছে। তার সাথে একটা নরম কণ্ঠস্বর—'তিস্তাদি, আমি বন্দনা।'

—'আয়।'

শাড়িটা কোনোমতে গায়ে জড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। মেয়েটাকে দেখলেও বিরক্তি লাগে। বয়স প্রায় কুড়ি পেরিয়ে একুশ হতে চলল। এখনো খুকি খুকি ভাব যায়নি। অথচ সম্রাট যে কী দেখল মেয়েটার মধ্যে! সম্রাটের নখের যোগ্যও ওই মেয়ে নয়! এদিকে আমাকে দেখলেই তো এমন ভাব করে যেন স্বভাবে একেবারে বালব্রহ্মচারী! অথচ তলে তলে ওই ন্যালাখ্যাপা মেয়েটার ফাটা চামড়া ওঠা ঠোঁটে চুমু খেতেও তার অরুচি হয় না। ছিঃ।

—'আয় ভেতরে আয়।'

—'বসবো না গো। তোমার মাথাব্যথা কেমন আছে বলো।'

—'ব্যথা এখন তেমন নেই রে। ওই অল্প অল্প টিপটিপ করছে এই পর্যন্তই।'

—'ওষুধ খেয়েছ?'

—'খেয়েছি।'

—'ব্রেকফাস্ট?'

—'নাঃ।'

—'না কেন? পিত্তি পড়বে যে।'

—'ইচ্ছে করছে না।'

—'সে কী? ইচ্ছে না করলে চলবে? শরীর খারাপ হবে যে।'

শরীর খারাপ হলে আমার হবে। তাতে এ মেয়েটার কী? কেন আমায় এভাবে বিরক্ত করছে? ওর সারা শরীরে সম্রাটের গন্ধ! ওর ঠোঁটে সম্রাটের ঠোঁটের স্পর্শ! অসহ্য...অসহ্য...!

—'আমি কি নীচে গিয়ে তোমার জন্য একটা ব্রেকফাস্টের অর্ডার দেব?'

রাগও হচ্ছিল। পাশাপাশি হাসিও পেল। মেয়েটার এইটুকু বুদ্ধিও নেই

যে এই বেলা বারোটায় গিয়ে ব্রেকফাস্ট চাইলে লোকে পাগল ভাববে। সম্রাটের মতো লোকের পাল্লায় পড়লে এ কী করবে? কেঁদেকেটে একসা করবে। আর কী করবে তা ভগবানই জানে।

—'এখন তোকে যেতে হবে না। একটু বাদে আমি নিজেই গিয়ে একসাথে লাঞ্চটাও করে নেব।'

—'আচ্ছা।'

বন্দনা ঘাড় নাড়ল—'তা হলে তোমায় আর ডিস্টার্ব করব না। তুমি রেস্ট নাও। আর কিছু দরকার পড়লে ডেকো।'

—'ডাকব।'

—'ঠিক তো?'

—'হ্যাঁরে বাবা ঠিক।'

—'আচ্ছা। আর হ্যাঁ, মাথার ব্যথাটা যদি বেশি বাড়ে তবে অবশ্যই ডেকো। আমার ইন্টারকম নাম্বার তিনশো আট।'

—উঃ...তাড়াতে পারলে বাঁচি।

—'আচ্ছা, আচ্ছা।'

—ও-কে। বা-ই।'

কতদূর গিয়েছিল ওরা?

অভিজিৎ চুমু খেতে দেখেছে। বন্দনাকে জাপটে ধরে চুমুর পর চুমু খাচ্ছে সম্রাট। ঘাড়ে, গলায় পাগলের মতো ঠোঁট ঘষছে, আর বিড়বিড় করে বলছে...

কিন্তু তারপর? অভিজিতের দৃষ্টির বাইরে কতদূর গিয়েছিল ওরা? কেমন লেগেছিল বন্দনার? সম্রাটের ঠোঁট আমি দেখেছি। কালো, পুরু, নিটোল। নীচের ঠোঁটের পাশে একটা ছেলেমানুষি ভাব লেগেই থাকে। একটু ভেজা ভেজা। সবসময় আমন্ত্রণী ভঙ্গিতে একটু শিথিল, একটু স্ফুরিত। মদের বোতলটার গলা যখন দুই ঠোঁটে আঁকড়ে ধরে তখন সেই গ্রিপ যে কত জোরালো তা বোঝা যায়। বন্দনার ঠোঁট কি সেই শক্ত বেষ্টনীর মধ্যে গলে যেতে চেয়েছিল? অমন পুরু ঠোঁট চুষতে কেমন লাগে সেটা কি ও আদৌ বুঝেছে?

আচ্ছা...সম্রাট ওর বুকে মুখ রেখেছে? চুমু খেয়েছে? ওর ওই সবল পুরুষালি হাত দুটো ওর বুকে চেপে ধরেছে? বন্দনাকে নিজের রোমশ বুকে টেনে নিয়েছে? কেমন করে?...যেমন করে বাঘ হরিণের গলা কামড়ে ধরে

তেমনভাবে ওকে কামড়ে ধরেছে? তারপর? আর কতদূর গিয়েছিল ওরা? ...কতদূর?...

সম্রাটের গায়ে অ্যালকোহল—সিগ্রেটের গন্ধ...ওর ঠোঁটে, ওর গায়ে শরীরের যত্রতত্র অদ্ভুত মাদকতায় যে গন্ধটা ছড়িয়ে আছে সেই গন্ধ...জিভের স্বাদ...পুরু ঠোঁট...চওড়া কাঁধ...বুক কবজি...পুরুষ...পুরুষ...শুধু পুরুষ...

আমি ভিজে যাচ্ছি। কান, মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। হৃৎপিণ্ডটা যেন গলায় উঠে এসেছে। বন্দনা নয়, যেন আমিই কোনো অশরীরী পুরুষের সাথে মিলিত হচ্ছি।

আঃ...আমার পুরুষ...পরিপূর্ণ পুরুষ! যদি তুমি আমার হতে! কেন তুমি ওই কচি খুকির হয়ে গেলে? কেন তুমি ওকে আদর করলে? কেন? কেন?

—'তুমি স্নান করেছ না কি?'

দুপুরবেলায় ডাইনিং হলে বসে যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন প্রফেসর মুখার্জি।

—'তোমার না মাথা ফেটেছে?'

লোকটার চাউনিটা বড্ড অস্বস্তিকর। ভারী চশমার পিছনে চোখদুটো যেন এক্সরে রশ্মি। ওই চোখের সামনে দাঁড়াতে কষ্ট হয়। বিরক্তি লাগে।

অথচ কয়েকদিন আগেও প্রফেসর এই প্রফেসরই ছিলেন। তিনি পালটাননি। তার চোখও পালটায়নি।

—'মাথায় জল ঢালিনি স্যার। আলগা আলগা গায়ে ঢেলেছি মাত্র।'

—'ও।' উনি চোখ থেকে চশমা খুলে মুছছেন—'তবু কাজটা ঠিক করোনি। একটু এদিক থেকে ওদিক হয়ে গেলেই সর্বনাশ।'

আমি হাসলাম। এদিক থেকে ওদিক তো হয়েছেই। সর্বনাশও হয়েছে। কিন্তু জানাব কাকে?

—'কিঁনো খানা লাগে গা সাব?'

উর্দিপরা বয় সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে খালি ট্রে।'

—'চার।'

—'পর উয়ো চৌথা সাব?'

—'আ রহে হ্যায়।'

—'ঠিক হ্যায়। খানে মে ক্যায়া লেঙ্গে আজ?'

প্রফেসর মুখার্জি মেনুকার্ডের উপর ঝুঁকে পড়লেন। চোখ কুঁচকে ছোটো ছোটো অক্ষরে লেখা নামগুলো পড়ছেন।

—'প্লেন রাইসটা পাওয়াই মুস্কিল দেখছি।' নিজের মনেই বিড়বিড় করছেন—'ভেজিটেবল বিরিয়ানিটাই সেফ মনে হচ্ছে। সঙ্গে একটা পনির পাসিন্দা।'

—'জি সাব।'

—'বন্দনা।'

—'আমিও সেম।'

—'তিস্তা?'

—'মি—টু।'

—'ও কে।'

প্রফেসর বয়ের দিকে ফিরে তাকে মেনু বোঝাচ্ছেন। বয়টা বুঝেটুঝে ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

—'সম্রাটদার এত দেরি হচ্ছে স্যার?'

শুরু হল ন্যাকামি!

—'স্নানে গেছে। স্নান করেই আসবে।'

—আমি একবার দেখে আসব?'

—'তুমি?' প্রফেসর তীব্র দৃষ্টিপাত করলেন। তার দুচোখে যেন ক্ষোভ, বিরক্তি, রাগ সব এক হয়ে ফেটে বেরোল। যেন বলতে চাইলেন—'তুমি কে হে?'

—'হ্যাঁ...দেখে আসব?'

রাগটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। প্রফেসর একটু অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েই বোধহয় হাসার চেষ্টা করলেন—'নিশ্চয়ই দেখে আসবে। তবে আমার মনে হয় না তার কোনো প্রয়োজন আছে।'

—'আচ্ছা।'

—'প্রফেসর রুদ্র এখন কেমন আছেন স্যার?'

প্রসঙ্গটা পাল্টাতেই তিনি যেন একটু স্বস্তি পেলেন—'আছেন। ভালো তো আর থাকা সম্ভব নয়। কোনোরকম আছেন।

—এখনো কি লাফালাফি করছেন? না...।' অজান্তেই হাতটা মাথায় চলে গেল। তিনটে স্টিচ পড়েছে। অল্প অল্প ব্যথা এখনো টের পাচ্ছি।

—'লাফালাফি!' তিনি হেসে ফেললেন—'ধাক্কাটা খুব জোর লেগেছে না?'

সে আর বলতে! ওই কঙ্কালসার শরীরে যে অত শক্তি থাকতে পারে তা জানলে লোকটার ধারেকাছে ঘেঁষত কে?

—'ব্লিডও তো খুব করেছে। আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। আর তোমার বরটিও তো প্রায় উলটেই পড়েছিল।

—'সে তো আছেই উলটে পড়ার জন্য। ভীতুর ডিম।'

—'ওরকম বলে না।' প্রফেসর সকৌতুকে বললেন—'সবাই তো সমান হয় না। ভয় সবারই থাকে। কারো বেশি, কারো কম। যার কম থাকে সে বীরপুরুষ। যার বেশি থাকে সে...।'

—'কাপুরুষ।'

—'কাপুরুষ জিনিসটা আলাদা তিস্তা। তোমার বরটি একটু নরমসরম ভীতু লোক। অর্ককে আমি যতদূর চিনেছি, সে একটি নিপাট ভালোমানুষ।'

—'অত ভালোমানুষ দেখতে পারি না বাপু।' বন্দনার সোজা সাপটা মন্তব্য—'পুরুষ হবে বটগাছ। রুক্ষ, শক্তপোক্ত, বিরাট। ঘাড়ে চড়েও আরাম। ছায়ায় বসেও আরাম। অনেকটা সম্রাটদার মতো।'

'সম্রাটের ঘাড়ে চড়ে কতটা আরাম তা অবশ্য আমরা জানি না।' প্রফেসর মুচকি হাসলেন—'সে বিষয়ে তিস্তা বলতে পারবে। আমাদের মধ্যে একমাত্র ও-ই চড়তে পেরেছে।'

কথাটার মধ্যে একটু খোঁচা ছিল কি? না নিতান্তই সরল রসিকতা? যতক্ষণ না পরিষ্কার বোঝা যায়, ততক্ষণ বেনিফিট অব ডাউট দেওয়াই ভালো।

—'যা বলেছেন স্যার। শুনুন না...শুনুন ...।' বন্দনা এবার উৎসাহে লাফিয়ে পড়েছে—'তখন তো তিস্তাদির মাথা ফেটেছে। গলগল করে রক্ত, অর্কদা ওখানেই রক্ত দেখে বসে পড়েছে। সম্রাটদা একেবারে কথা নেই বার্তা নেই কোথা থেকে এসে তিস্তাদিকে একেবারে গামছার মতো ইজিলি ঘাড়ে তুলেই দৌড়। ঠিক যেন সংযুক্তাকে নিয়ে পৃথ্বীরাজ পালাচ্ছে।'

প্রফেসর হো হো করে হেসে উঠলে—'অথবা ভাগ্যমতীকে নিয়ে মহম্মদ কুলি।'

—'কে? তার কেসটা আবার কী?'

—'কার কথা বলছ? মহম্মদ কুলি?'

—'হ্যাঁ।'

—'এই যে প্রফেসর রুদ্র 'সুলতান কুলি, সুলতান কুলি' করছেন না? মহম্মদ কুলি তাঁরই নাতি, ছোটো ছেলে ইব্রাহিমের ছেলে। বেচারা যখন সবে বড়োসড়ো হয়েছে তখন সভায় গায়িকা কাম নর্তকী ভাগ্যমতীকে দেখে ঘাড় মুচড়ে পড়ল।

—'এ তো সেলিম-আনারকলি কেস।'

—'শেষটা তা নয়। ইব্রাহিম কুলি কুতুবশাহ্‌ও অবশ্য আপত্তি করেছিলেন। বলেছিলেন আইদার তুমি ভাগ্যমতীকে ছাড়ো অর এই রাজপ্রাসাদ, এই গদি পাওয়ার আশা ত্যাগ করো। একথা বলার সাথে সাথেই মহম্মদ কুলি সেই রাতে ঘোড়ায় চড়ে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে সোজা ভাগ্যমতীর কাছে উপস্থিত। সুন্দরীকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়েই দে চম্পট। শেষপর্যন্ত ইব্রাহিম কুলিকেই সব মেনে নিয়ে 'বাবা বাছা' করে ছেলে আর ছেলের বউকে ঘরে তুলতে হয়।'

—'ভাগ্যিস ঘোড়াটা সেদিন ছিল না। নয়তো ইব্রাহিম কুলি নয়, অর্কদাকেই 'বাবা বাছা' করে নিজের বউকে ঘরে ফেরাতে হত...হিঃ... হিঃ...হিঃ...।'

প্রফেসর মুখার্জি হাসতে হাসতেই বললেন—'বাবা বাছা না করে যুদ্ধং দেহি করেও তো ফেরাতে পারত। হেলেন অফ ট্রয়ের কেস মনে নেই?'

রসিকতাটুকু ভালোই লাগছিল। বললাম—'যুদ্ধং দেহি করার জন্য বুকের পাটা দরকার। যে রক্ত দেখে ভিমরি খায় তার কম্মো নয়। তোমার অর্কদা আদৌ যুদ্ধ করত না, উলটে ভাবত আপদ গেছে।'

—'যাঃ...কী যে বলো।' বন্দনা বলল—'অর্কদা তোমায় ব্যাপক ভালো-বাসে। এভাবে ওকে আন্ডার এস্টিমেট কোরো না। আর যদি বলো তো সম্রাটদাকে বলে ওকে বউকে ঘাড়ে তোলার পদ্ধতিটাও শিখিয়ে দিই। এরপর থেকে ও তোমায় ঘায়েল করেই বসে থাকবে। সীতাভক্ত হনুমানের মতো... হিঃ...হিঃ...।'

—'কাকে ঘাড়ে তোলার প্ল্যানিং হচ্ছে?'

একরাশ সুগন্ধ। 'ক্রট'-এর কাঁঝালো নেশা। বাদামি মসৃণ শরীর। ভীষণ পুরুষালি। সম্রাট! সদ্যস্নাত! ভিজে চুল, ভিজে ঠোঁট, ভিজে গাল, ভিজে চোখের পাতা।

ফাঁকা টেবিলের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে বলল—'একী! কোনো খাবারদাবার দেখছি না যে! আমাকে ফেলেই সব খেয়ে নিলেন নাকি আপনারা?'

—'হাঁ, ভাই।' প্রফেসর বললেন—'তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতেই খুব খিদে পেয়েছিল। খেয়ে নিলাম। এতক্ষণ গল্প করে সব হজম হয়ে গেছে, তাই আরো একবার খাব ভাবছি।'

সম্রাট হেসে উঠে প্রফেসরের কাঁধে হাত রাখল—'এবার আমিও সেখান থেকে ভাগ বসাব।'

—'বসিও, তার আগে নিজে তো বসো।'

—'হ্যাঁ।'

প্রফেসরের পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল সম্রাট। বসতে না বসতেই ওর পা দুটো এসে পড়েছে আমার পায়ের উপর। সারা শরীরের উষ্ণতা হঠাৎ এক ঝটকায় অনেকখানি বেড়ে গেল। একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ! সোনালি রুপোলি তার শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে জোরদার একটা কাঁকুনি দিয়ে গেল।

—'সরি তিস্তা।' সম্রাট ভদ্রভাবেই ক্ষমাপ্রার্থনা করে পা দুটো সরিয়ে নিয়েছে।

—'ইটস ওকে।'

—'সুলতান কুলি এখন কি ঘুমোচ্ছেন প্রফ?'

—'হ্যাঁ...নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন।'

—'একি সেডেটিভের ঘুম?'

—'তাই তো মনে হয়।'

—'তা ভালো, যত ঘুমোবেন ততই সেফ। নয়তো কাছে যেতেই ভয় করে।' প্রফেসর মুখার্জি আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—'পয়েন্ট শ্যুড বি নোটেড তিস্তা। সম্রাটেরও ভয় করে।'

সম্রাট অবাক হয়ে একবার আমার দিকে আরেকবার প্রফেসরের দিকে তাকাচ্ছে।

—'ব্যাপারটা হল এই...' প্রফেশর হেসে তাকে এতক্ষণের কথোপকথনের সারাংশটা বুঝিয়ে বললেন—'তাই আমি তিস্তাকে বলছি যে ভয়টা সবারই থাকে, কারো কম, কারো বেশি। কিন্তু থাকে সবারই।'

—'তোমার কীসে কীসে ভয় সম্রাটদা?'

সম্রাট মুচকি হেসে তিনটে আঙুল তুলে দেখাল।

—'তিনটে জিনিসে। কী কী?'

বন্দনা কথার মাঝখানেই বাধা পেল। সাদা পোশাকে লাল মোরগঝুঁটি বয় ভর্তি ট্রে নিয়ে এদিকেই আসছে। ট্রে'র উপরে পেতলের লালচে হাঁড়ি থেকে বিরিয়ানির সাদা হলদে ভাত উঁকি মারছে। ক্যাপসিকাম আর মটরশুঁটির সবুজ, লঙ্কার লালে ছয়লাপ। মাঝে মাঝে সোনালি ক্রাথ-এ ঝকঝকে পনিরের টুকরো।

—'কু-ল।' সম্রাট নড়েচড়ে বসল—'ডেলিশিয়া...।'

—'আউচ।'

বন্দনা কাতরোক্তি করে বলে—'সম্রাটদা, আমার পা তোমার পায়ের নীচে।

—'ওঃ হো...সরি...সরি...।' সম্রাট বিব্রত। লম্বা পা দুটো যে কোথায় রাখবে ভেবে পাচ্ছে না। কেমন অসহায় লাগছিল ওকে। বন্দনার কাছ থেকে পা দুটো গুটিয়ে এনে উলটোদিকে মেলে দিতেই আবার এসে পড়ল আমার পায়ের উপর।

—'এটা আবার কার...?' কথাটা বলতে বলতেই পায়ের পাতার উপর আলতো চাপ খেয়ে থেমে গেল সে। বিস্ময় ভরা চোখ তুলে আমায় দেখছে।

টেবিলের তলায় ওর পায়ের উপর আমার পা। অনেক হয়েছে। ছেলেটা আমায় যথেষ্ট জ্বালিয়েছে। এবার আমার পালা। আমি ওকে জ্বালাব। আমি ওকে সিডিউস করব। ওর পা দুটোকে কিছুতেই ছাড়ব না! কিছুতেই না।

—'বললে না তো? সে তিনটে জিনিস কী?'

—'উঁ? কোন্ তিনটে জিনিস?'

—'ওই যে বললে তিনটে জিনিসকে ভয় পাও।'

—'ও।' সম্রাট নিজেকে ফিরে পেল—'তিনটের মধ্যে প্রথম জিনিসটা হচ্ছে মদ।'

—'মদ!' বন্দনার ভুরু বঙ্কিমভঙ্গি ধরেছে—'ভয় পাও বলেই বুঝি দিনরাত গিলে বসে থাকো।'

ও মুচকি হাসে। অর্থাৎ এর উত্তরটা এড়িয়ে গেল।

—'নেক্সট?'

—'দ্বিতীয় জিনিসটা হচ্ছে...।' আমার দিকে ও অদ্ভুতভাবে তাকাল—'সুন্দরী মেয়ে।'

প্রফেসর মুখ নীচু করে ঠোঁট টিপে হাসছেন। হাস্যকরই বটে!

সম্রাটের পায়ের পাতা বেশ লম্বাটে গড়নের। আঙুলগুলোও লম্বা লম্বা। মসৃণ কাচের মতো পায়ের পাতা দিয়ে ঘষে দিলাম! নির্লজ্জ! ছিঃ! পাজি মেয়ে! বুঝি ছেলেটার কষ্ট হয়। জানি ওর বলশালী হাত দুটোর পেশি শার্টের ভিতরে ফুলে ফুলে উঠছে। চওড়া বুক দ্রুত তালে ওঠানামা করছে। ঠোঁটদুটো মাঝে মধ্যে শ্বাস নেওয়ার জন্য খুলে যাচ্ছে। যাক। সব খুলে যাক! ওর সব দ্বিধাদ্বন্দ্বের বাঁধন খুলে দিতেই তো চাই। কক্ষচ্যুত উল্কার মতো সম্রাট আমার দিকে কামনার ছটা ছড়িয়ে ছুটে আসুক। আমায় জ্বালিয়ে দিক, পুড়িয়ে দিক—এইটুকুই তো চাওয়া। আমার সেই চাওয়ায় ছাই দিয়ে রূপে, গুণে আমার থেকে অনেক পিছিয়ে একটা মেয়ে বক্ষলগ্না হয়ে আদর খাবে তা সহ্য হবে না। নাঃ...হবে না।

—'আর থার্ডটা?'

সম্রাটের পায়ের পাতা কাঁপছে। আমার আঙুলগুলো ওর পায়ের পাতায় চুমু খেয়ে বেড়াচ্ছে। ও উশখুশ করছে। ডানহাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠছে। চোয়াল শক্ত। টেবিলের উপর বাঁ হাতের এলোপাথাড়ি আঁচড়।

—'কী হল? বলো না...থার্ডটা কী?'

আমার পা ওকে আদর করছে। পায়ের ডিম ছুঁয়ে উঠছে। উপরে...আরো উপরে। সম্রাট স্তম্ভিতের মতো আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। ওর দুই চোখে লালচে 'রাগ' জমছে। চোয়াল শক্ত। কিছু করতে না পারার নিষ্ফল আক্রোশ। অসহায়তায়, রাগে ওকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল, অলৌকিক লাগছিল। পুরুষের মতো লাগছিল। পুরুষ...'শুধু পুরুষ...'।

—'কী হল? ও সম্রাটদা...।'

—'স্টপ ইট...স্টপ ইট আই সে...।'

আচমকা পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল সম্রাট। হাতের কাছে জলেভরা গ্লাসটা ছিল। এক ধাক্কায় সপাটে মাটিতে। মুহূর্তের মধ্যে সারা মেঝে জলে ভেসে গেল। গ্লাসটা ভেঙে খানখান।

বন্দনার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। প্রফেসর নির্বাক! কথা বলার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছেন।

—'ওঃ।' সবলে নিজের চুলের মুঠি টেনে ধরল সম্রাট—'সরি...আই অ্যাম...আই অ্যাম সরি...।'

তারপরই উন্মত্তের মতো ছুটে চলে গেল।

পুরুষ! নতজানু হও।

নারীর সৌন্দর্যের সামনে নতজানু হও। তার কামনার কাছে নতজানু হও। যে অবদমিত বাসনায় হাওয়া দিয়েছ তার আগুনে পুড়ে ছারখার হও। এই তোমার ভবিতব্য। এই-ই তোমার ললাটলিপি। ক্ষুধিত প্রবৃত্তিকে লজ্জার কারাগারে বন্দি করে শোকেসে পুতুল সেজে থাকার দিন শেষ। তুমিই নারীকে ঘোমটা পরিয়েছ। তাকে সংযমের বোরখা পরিয়ে অতৃপ্তি ঢেকে রাখতে মুখ ঢেকে দিয়েছ ওড়নায়। আবার নিজের প্রয়োজনেই কেড়ে নিয়েছ সমস্ত অবগুণ্ঠন। আজ সে তার লেলিহান কামনা বাসনা নিয়ে সমস্ত বন্ধন ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। আজ তুমি কোথাও পালাতে পারবে না। আসতে তোমাকে হবেই...তুমি আসবেই।

আমি জানি সম্রাট আসবেই। তখন ও যেভাবে পালিয়ে গেল তাতেই স্পষ্ট—ও আসবে। ওর পালানোর মধ্যেই ছিল পরাজয়। স্নায়ুযুদ্ধে হেরে যাওয়ার ইঙ্গিত। সেই পরাজয়ই ওকে টেনে আনবে আমার কাছে। আমি জানি ও আসবেই।

তখন দুপুর পেরিয়ে নেমেছে বিকেল। সূর্যের এক-একটা রশ্মিকে কে যেন ইরেজার দিয়ে মুছে দিচ্ছে। ডানাভাঙা চিলের মতো আলোর পাখা একদিকে ভেঙে পড়ে অন্ধকার হয়ে এসেছে। অন্য পাখায় সে যথাযোগ্য ওড়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু বেশিক্ষণ পারবে বলে মনে হয় না। একসময় তার যুদ্ধ শেষ হবেই। প্রতিরোধশক্তি জবাব দেবেই।

বাথরুমের কল দিয়ে জল পড়ছে টুপটাপ। একটু আগে গায়ে আরো এক আঁজলা জল ছিটিয়ে এসেছি। তা সত্ত্বেও ছাইচাপা আগুন নিভছে না। কান মাথা গরম হয়েই আছে। সে উষ্ণতা যেন রাবণের চিতা। কয়েক গ্যালন জল ঢাললেও প্রশমিত হয় না। বরং তার লেলিহান জিভ আরো দুর্দমনীয় হয়ে লকলক করে ওঠে।

আমি বসেছিলাম বিছানার উপরে। নরম গদিতে আধখানা ডুবে তাকিয়েছিলাম আয়নার দিক। সেখানেই আমার প্রতিবিম্ব। ফর্সা রংটা রোদে পুড়ে সাময়িক তামাটে হয়ে গেছে। চুলগুলো বিস্রস্ত, আঙুরের থোকার মতো

কপালে গালে লেগে আছে। চোখে কীসের যেন খিদে। অনুপম দেহসৌন্দর্য, যৌবন যেন অন্তর্বাস থেকে উপচে পড়তে চাইছে। নারী নয়, নারী নয়, বর্ষার খ্যাপা নদীর মতো উত্তাল। আমি নারী নই, আমি রূপা নই, গোপা নই, জয়া-বিজয়া নই, নন্দিনী-বন্দনা নই। আমি তিস্তা। আমার গন্তব্যস্থল খাল-বিল নয়, সমুদ্র। আমার সমুদ্র চাই। সমুদ্র আমার সাথে মিলিত হতে ছুটে আসছে! ওই...ওই তার পায়ের শব্দ...করিডোর বেয়ে সে আসছে...আসছে...।

মুহূর্তের মধ্যে স্নায়ুপেশিগুলো শক্ত হয়ে উঠল। কুলকুল শব্দে নদী ঝাঁপিয়ে পড়ছে শক্ত পাথরের বুকে। টুকরো-টুকরো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে পাথরের শক্ত পেশি...।

—'তিস্তা...।'

প্রফেসরের মুখার্জির কণ্ঠস্বর—'ঘরে আছ?'

উত্তেজনার উপর কে যেন এক বালতি হতাশা ঢেলে দিল। টানটান আশার পরই হতাশার ঝিমঝিমে অনুভূতি।

—'আসছি স্যার।'

—'দরজা খোলার দরকার নেই। জানলার দিকে এসো।'

জানলায় উঁকি মারতেই প্রফেসর মুখার্জিকে দেখা গেল।

—'বলুন।'

—'অর্ক'রা কখন ফিরবে জানো? তোমায় কিছু বলে গেছে?'

—'নাঃ, ও তেমন কিছু বলে যায়নি। তবে শিবাকুমারণ বলছিল রাত হবে।' আমি বিরক্তি চেপে রেখেই বললাম—'কেন স্যার? কিছু দরকার আছে?'

—'দরকার তো ছিল। প্রফেসর রুদ্রর খাওয়ার বাসনগুলো বোধহয় অর্কর কাছে ছিল। ওগুলো একটু খুঁজে দিতে পারো?'

—'ওগুলো আমার কাছেই আছে স্যার। দাঁড়ান...দিচ্ছি...।'

ওয়ার্ডরোবের ভেতরেই বাদশাহী বাসনগুলো জড়ো করা ছিল। এক-একটা পাথরের মতো ভারী। কী দিয়ে তৈরি কে জানে।

—'প্রফেসর রুদ্র ঘুম থেকে উঠেছেন?'

—'নাঃ, এখনো ঢুলছেন। ঘোরে আছেন। সম্রাট বলল এই সুযোগেই খাইয়ে দেওয়া ভালো। জেগে উঠলে তো বাসনপত্র ছোড়াছুড়ি করবেন।'

কী? সে এখন প্রফেসর রুদ্রর সেবায় লেগেছে? আমার কথা তার মনেই

নেই?

—'চলি, সাবধানে থেকো। প্রয়োজন হলে ডেকো। কাছেই আছি।'

জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। নিজেকে এত অপমানিত আগে কখনো মনে হয়নি। ছি...ছি! কেন নিজেকে এত সস্তা করলাম? কেন নিজেকে এত সহজলভ্য করলাম যাতে একটা নারীলোলুপ লম্পটও আমায় প্রত্যাখ্যান করতে পারে? লোকটা কী ধাতুতে তৈরি? ওর বুকে কি কাঁপন ধরে না? তবে অন্য মেয়েরা ওকে আদায় করে কোন্ পদ্ধতিতে? কী সেই পদ্ধতি? কী সেই আকর্ষণী শক্তি যা আমার জানা নেই?

আস্তে আস্তে সন্ধে পেরিয়ে রাত এল। দিনের আলো নিভিয়ে দিয়ে রাতের কালো এল। পরিষ্কার আকাশে তারা এল। তার মাঝে মাঝে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘও এল।

সম্রাট এল না।...এল না...এল না...নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুর!...একলা ঘরের শূন্যতার সাথে নীরব উষ্ণ বৃষ্টিপাতে বালিশের ভিজে যাওয়া। আর জমাট, হতাশ একাকিত্ব।

—'দুম্ দুম্ দুম্'।

দরজায় আবার ধাক্কা।

আঃ, কে আবার জ্বালাতে এল?

—'কে?'

কোনো উত্তর নেই। বরং আরো জোরে ধাক্কা।

—'কে?'

একটু নীরবতা। তারপরই বহু ঈপ্সিত সেই মেঘমন্দ্র স্বর—'দরজা খোল ডাইনি! আমি এসেছি।'

—'কী চাও তুমি?'

হ্যাঁচটা টানে আমায় নিজের বুকে আছড়ে ফেলল সম্রাট। লোহার মতো বুকে নরম বুক পিষছে। চুলের মুঠি ধরে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিয়ে বলল—'কী চাও তুমি আমার কাছে? হুঁ? কী চাও?'

ঘাড়ের কাছটায় টনটন করছে। চুলে টান পড়ে চোখে জল চলে এল। তবু সে যন্ত্রণায় যে কী সুখ তা এই প্রথম জানলাম।

—'সাহস আছে তোমার?' মোটা ঠোঁট দুটো আলগোছে কামড়ে ধরল গলা। গরম জিভ দিয়ে চেটে দিল। সবল হাতে খুলে এল শাড়ি। জিভ, ঠোঁট

আর দাঁতের জ্বালাময়ী বিষাক্ত ছোবল আমায় খেপিয়ে তুলছে। পিঠের মাংসে, কোমর, তলপেটে যত্রতত্র শক্তিশালী হাতের অসহ্য চাপ।

এক ঝটকায় আমায় পিছন ফিরিয়ে দেওয়ালে ঠেসে ধরল সম্রাট।

—'বড়ো দুঃসাহস তোমার! কত সাহস আজ দেখব।'

জোরালো মদের গন্ধ ঝাপটা মারল নাকে। এ পুরুষ আদর করতে জানে। মেয়েদের শরীরে ঝড় তুলতে জানে। শরীরী খেলায় এ ছেলে পাকা খেলোয়াড়। অর্কর মতো ছেলেমানুষ নয়—রীতিমতো প্রবীণ।

সম্রাট দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে ব্লাউজের গিটগুলো একের পর এক খুলছে। শায়ার গিট, ব্রায়ের স্ট্র্যাপ আর সবশেষে প্যান্টিটাও দাঁত দিয়ে টেনেই খুলে ফেলল। সারা গায়ে একটু সুতোও নেই। থরথর করে কাঁপছি। নীচ থেকে একটা আসন্ন বিস্ফোরণের ইঙ্গিত উঠে আসছে...ঝাঁকাচ্ছে...কাঁপাচ্ছে...।

—'ইউ নো তিস্তা...।' সম্রাট আমায় ছেড়ে দিয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল। ওর চোখ আমার প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গিলছে। চোখ দিয়ে আমায় গিলতে গিলতেই বলল—'তুমি অসহ্য সুন্দর। তাজমহলের মতো সুন্দর, জীবনের মতো সুন্দর, মদের মতো সুন্দর, আমার মায়ের মতো সুন্দর। আর এত সুন্দর বলেই আমি তোমায় ঘৃণা করি, ভীষণ ঘৃণা করি। আই হেট ইউ, আই হেট ইউ...।'

অনেকক্ষণ সহ্য করছিলাম। এবার সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল। আমি ওর কপাট বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চুমু খাচ্ছি, বনবিড়ালের মতো আঁচড়াচ্ছি, কামড়াচ্ছি, শার্টের বোতাম ছিঁড়ে ফেলেছি। মেরে ফ্যালো...মেরে ফ্যালো...পিষে ফ্যালো আমায়...রাক্ষস...আমার রাক্ষস...খোলো...জামা খোলো...আমি তোমায় দেখতে চাই...খোলো খোলো...।

শার্ট ছিঁড়ে রোমশ বুক বেরিয়ে এল। বৃষস্কন্ধ, সিংহের মতো কোমর, উন্মুক্ত সুঠাম বাদামি শরীর। ওঃ...ওঃ...ওঃ...।

সম্রাট খেপে গিয়ে আমায় চুমু খেল। সে চুমু চুমু নয়। দুটো বিষাক্ত সাপের ঠোঁটে ঠোঁটে ছোবল। প্রচণ্ড রাগে দুটো বিষধর ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে গিয়ে পরস্পরের ঠোঁটে বিষাক্ত দংশন করছে। আবার ফিরে এসে গর্জন করে দ্বিগুণ রোষে তেড়ে যাচ্ছে। যেন দুজনেই দুজনকে খেয়ে ফেলবে।

আমার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুমু খেতে খেতেই সম্রাট একহাতে কোমর সাপটে ধরেছে। ওর আঙুলের তীক্ষ্ণতা নাভির চারপাশে খেলে বেড়াচ্ছে।

পাগল করে দিচ্ছে। এক ঝটকায় অবলীলায় তুলে নিল কোলে। আমি সুযোগ পেয়ে ওর কাঁধে কামড়ে দিয়েছি।

—'আ...শ্ শ্...শালি।'

আমাকে বিছানায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে সিংহের মতো দুই থাবায় চেপে ধরল সে। পিঠ, কাঁধ, হাতের পেশি যেন ময়াল সাপের মতো ফুলে ফুলে উঠছে। শরীর বেয়ে উঠে এসে বুকে তীক্ষ্ণ দাঁতের কামড় বসাল। নাভিতে গরম জিভ! কী প্রচণ্ড শক্তি ওর! আমি ওর লৌহবেষ্টনীর মধ্যে তবু যুদ্ধ করে যাচ্ছি। ওর শক্তির কাছে হার মানতে চাইছি। তবু হার মানছি না, হাত দিয়ে ওর মুখ যতবার সরিয়ে দিচ্ছি ততই যেন ও ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। আমায় আদর করছে, যন্ত্রণা দিচ্ছে। অত্যাচার করছে। শরীরটাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করছে। ভেঙে পড়ছে আমার উপর। ঝড়ের মতো উথালপাথাল সম্রাট, ধূমকেতুর মতো জ্বালাময় সম্রাট। পাহাড়ের মতো পেশল, বজ্রের মতো বলশালী সম্রাটকে যতবারই দু'হাতে বন্দি করতে যাচ্ছি, ততবারই ও সরে সরে যাচ্ছে। ধরা দেবে না... কিছুতেই ধরা দেবে না।

অর্কর পছন্দ সিল্পটি নাইন। সম্রাট কিন্তু সে রাস্তা মাড়াল না। হ্যাঁচটা টানে আমার নগ্ন শরীরটাকে টেনে নিল কোলে। হরগৌরীর পোজ। বুঝলাম, ও ছেলে শুধু দামালই নয়, শৈল্পিকও বটে। ওর ঠোঁট আমার গলা বেয়ে চুমু খেতে খেতে নেমে এসেছে বুকের কাছে। স্তন আঁকড়ে ধরেছে তার দুই ঠোঁট। জিভ দিয়ে খেলা করছে। নিপ্‌ল্ ক্রমাগতই শক্ত হয়ে উঠছে। দৃঢ় হয়ে উঠে দাবি জানাচ্ছে—'দংশন করো...দংশন করে আমাকে...।'

আমি দু পা ফাঁক করে ওর কোলে দৃঢ় হয়ে বসলাম। দু পায়ে শক্ত করে এঁটে ধরেছি সম্রাটের সরু কোমর। দুই বাহুতে ওর গলা সাপটে ধরেছি। কিছুতেই ফিরে যেতে দেব না। এসেছে যখন, তখন সব উজাড় করে দেবে ও, দিতেই হবে ওকে।

সম্রাট একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিল। বুঝলাম ও প্রবেশ করার উপক্রম করছে আমার যোনিবিবরে। আমি ওকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরি। আমি ক্ষুধার্ত... বড়ো ক্ষুধার্ত...। আজ খালি পেটে ঘুমোনোর দিন নয়। আজ ভরা পেট খাব। টের পেলাম অন্দরমহল সিক্ত করে তরল কামনা লেগে যাচ্ছে যোনিকেশরে।

সম্রাট কিন্তু প্রথমেই প্রবেশ করল না। বরং মুচকি হেসে আমার আগ্রাসী-আলিঙ্গন ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—'এত তাড়া কীসের? আরেকটু

অপেক্ষা করো।' সে আমাকে বিছানার ওপর চিত করে ফেলেছে। একটা আঙুল দিয়ে আলতো আলতো করে স্পর্শ করছে স্তনবৃন্ত, নাভি, ঠোঁট।

আস্তে আস্তে তার হাত নেমে গেল তলপেটে। উরুতে হাত বোলাচ্ছে সে। কোমল শিরশিরে সে স্পর্শ। না...না...সে স্পর্শ নয়। সে বিদ্যুৎ। ঝিনঝিনে অনুভূতিতে বারবার ধাক্কা দিচ্ছে তলপেটে।

—'এইখানে একটা টিয়াপাখির ঠোঁট আছে। জানো?'

ওর হাত আমার যৌনাঙ্গের একটা বিশেষ জায়গা টিপে ধরল, তারপরই তীব্র কামড়। আঃ...ওঃ। মরে যাব...মরে যাব! আমি দু হাতে বিছানার চাদর আঁকড়ে ধরি। যদি এক্ষুনি ও না আসে তাহলে আমার হৃৎস্পন্দন এক্ষুনি থেমে যাবে। মনে হল মরতে চলেছি। থিরথির করে কেঁপে উঠছে স্তন। নাভির নীচটা প্রচণ্ড আন্দোলনে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

—'এসো...এবার এসো প্লিজ...আমি...পাগল হয়ে যাব...পাগল হয়ে যাব—মরে যাব...এসো...।'

আমার কথাগুলো ক্রমাগত গোঙানিতে পরিণত হল। সম্রাট কি বুঝছে না, আমার কষ্ট হচ্ছে। নাকি ও আমার কষ্টটা উপভোগ করছে? এতদিন বাদে শরীরের ভিতরে আকাঙ্ক্ষিত বিস্ফোরণ টের পাচ্ছি। এখন যদি সম্রাট আমাকে খুনও করে ফেলে তবুও ওকে ছাড়ব না।

আমি ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি। এসো...এক্ষুনি এসো রাক্ষস...। নয়তো আজ কিছুতেই তোমার রক্ষা নেই। আজ তুমি তৃষিত সাগর মন্থন করবে। আর তার গভীরে বপন করবে তোমার প্রাণভোমরা...তোমার সত্তা! এসো...!

—'এত খিদে ছিল তোমার!' সম্রাট আমাকে টেনে নিল ওর উপরে। ও ঠিক আমার নীচেই শুয়ে আছে। মাথাটা আমার পিছনের দিকে। ওর দৃঢ় পুরুষাঙ্গ আমার যোনির মধ্যে প্রবেশ করছে। আঃ! এই তো! আমার অত্যাচারী পুরুষ। ধরা দিয়েছ তাহলে! শেষ পর্যন্ত এলে!

আমার মুখ বেয়ে টপটপ করে ঘামের ফোঁটা পড়ছে। কিন্তু কষে বাঁধা তানপুরার মতো সমস্ত স্নায়ু সজাগ। প্রতিটা নভাচড়া, প্রতিটা ঝাঁকুনির স্বাদ শুষে নিচ্ছে গোটা শরীর। খাড়া হয়ে বসে আছি ওর কোমরের উপর।

আচমকা ওর বলিষ্ঠ হাতদুটো পিছনদিক দিয়ে চেপে ধরল দুই স্তন। আমার গোঙানি তখন প্রায় শীৎকারে পরিণত হয়েছে। প্রবল ঝাঁকুনিতে দুই

স্তন থরথর করে প্রবলভাবে কাঁপছে। কেউ কি কখনো পাহাড়চূড়ায় ভূমিকম্পের দৃশ্য দেখেছে! আমি দেখেছি। এখন দেখছি। উত্তেজনায়, যন্ত্রণায়, আনন্দে সাপের মতো 'শী শী' করে উঠি। তার দুই হাত শঙ্খের মতো পুরন্ত বুক মর্দন করছে, চটকাচ্ছে। আর আমি...আমি...ও! ও! আরো...আরো দাও...!

তৃষ্ণা মিটেও মেটে না। আগুন নিভেও নেভে না। যতবারই সম্রাট আমায় কান্নায় ভাসিয়ে দিয়েছে, পরিপূর্ণ করে তুলেছে ততবারই যন্ত্রণায়, সুখে কাঁপতে কাঁপতে আমি ওকে আরো আঁকড়ে ধরেছি। বলেছি—'আরো দাও...আরো দাও...আরো...আরো...। সম্রাট আরো বন্য হয়ে উঠেছে। মত্ত ঝড়ের মতো প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে বারবার ফিরে এসেছে। লক্ষ লক্ষ আদরে কখনো ঘূর্ণির মতো ঘুরতে ঘুরতে চক্রাকার ঢেউ তুলেছে। কখনো কালবৈশাখীর মতো আকাশছোঁয়া তরঙ্গ বানিয়েছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেকের যুদ্ধ যখন শেষ হল তখন রাত যৌবনবতী। সম্রাট নিস্তেজ হয়ে পাশে পড়ে আছে। ক্লান্তিতে চোখ বোজা। বলিষ্ঠ হাত দুটো আমার কোমরের উপর এলানো। মদ, সিগ্রেটের পুরুষালি গন্ধ মিশে গেছে আমার রোমে রোমে। ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে করছিল ওকে। আরো একবার...আবার।

আমার আঙুল ওর কপাল ছুঁল। তারপর নাক, গাল বেয়ে ঠোঁটে...। সম্রাট চোখ মেলে তাকাল। ফিসফিস করে আপনমনে কী যেন বলছে।

—'কী বলছ?'

—'আমায় চাবুক মারো তিস্তা।'

আমি ওর ঠোঁটে, থুতনিতে, গলায়, কাঁধে আলতো চুমু খেতে খেতে বললাম—'আমি তোমায় আদর করব।'

—'তোমার আদরই চাবুক।'

থেমে গেলাম—'কেন এমন বলছ।'

ও মৃদু হেসে পাশ ফিরেছে। আমায় বুকে টেনে নিয়ে মাথার চুলগুলো এলোমেলো করতে করতে বলল—'তুমি বুঝবে না। কিন্তু আমি ভীষণ খারাপ লোক তিস্তা। মাতাল, লম্পট'।

—'লম্পটেরা নিজের মুখে একথা বলে এই প্রথম শুনছি।'

সম্রাট হেসে উঠল—'অনেক কিছুই তো প্রথমবার শুনতে হয়। কিন্তু আজ যা হল তাতেই তো প্রমাণিত আমি লম্পট।'

—'না।'

—'বোঝার চেষ্টা করো তিস্তা। আজ তোমার একথা মনে হচ্ছে। কিন্তু কয়েকদিন বাদে যখন আমি তোমার সম্পর্কে সব উৎসাহই হারিয়ে ফেলব তখন তুমিই আমার গায়ে "ক্যারেক্টারলেস সার্টিফিকেট" লাগাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।'

ও আমায় ছেড়ে যাবে! ও আমার সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাবে! একটা শীতল ভয়ঙ্কর সরীসৃপ আমায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গলার কাছে উঠে এল।

—'না।' ওকে দু'হাতে জাপটে ধরে রোমশ বুকে মুখ ডুবিয়ে দিয়েছি—'না...তুমি কোথাও যাবে না। তুমি আমার। তুমি আমার কাছেই থাকবে...বলো।'

—'কী করে রাখবে আমায়?'

—'বেঁধে রাখব। এইভাবে।'

—'পারবে না। কেউ পারেনি।'

—'আমি পারব।'

—'অর্কর কী হবে।'

—'জানি না। কিন্তু তোমায় আমি ছাড়ব না।'

—'বেশ ছেড়ো না।' সম্রাট উঠে বসতে চাইছিল। আমি জোর করে ওকে চিত করে ফেলেছি।

—'আগে আমায় ছেড়ে যাবে না, বলো। নয়তো ছাড়ব না। আগে বলো।'

—'ইচ্ছে না হলে ছেড়ো না।' সে শান্ত গলায় বলল—'আমার কোনো প্রবলেম নেই। অর্ক এসে এই অবস্থায় দেখলে বড়োজোর আমায় খিস্তি দিয়ে তাড়িয়ে দেবে। তার বেশি কিছু নয়।'

বাহুবন্ধন শিথিল হয়ে গেল। সম্রাট নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে হঠাৎ খুব একচোট হেসে নিল। হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়ে আর কি! ওর সব ভালো। কিন্তু এই খোঁচা মারা হাসিটা আমার কিছুতেই সহ্য হয় না! যেন এক ঝলক বিদ্রূপ।

—'হাসছ কেন?'

সম্রাট হাসতে হাসতেই বলল—'নাঃ...কিছু নয়।' শার্টটার পকেট থেকে সিগ্রেট আর লাইটার বেরিয়ে পড়ল। সিগ্রেটে টান মারতে মারতে যখন সে

ধীরে সুস্থে শার্ট, ট্রাউজার পরছে তখনো খুক খুক করে হাসি চলছে। তারপর সব আগের মতো হয়ে গেলে পর, সম্রাট চলে গেল। যাওয়ার আগে একবারও ফিরে তাকাল না।

কেন জানি না আমারও মনে হচ্ছিল ও থাকবে না। থাকার জন্য আসেনি। সম্রাট প্রলয়ঝড়ের মতোই আমার অতৃপ্ত জীবনে আছড়ে পড়েছে। কিছুক্ষণের তৃপ্তি, মুহূর্তের শান্তি দিয়ে আবার ঝড়ের মতোই চলে যাবে। যাওয়ার আগে আমার পুরো জীবনটাই ছারখার করে দিয়ে যাবে। আমায় বরবাদ করে দিয়ে যাবে। পালটে দিয়ে যাবে।

কিন্তু এটাই তো আমি চেয়েছিলাম। সুখের বদলে অসুখ, শান্তির বদলে অশান্তি এই-ই তো আমার কাম্য ছিল।

একটা ঘড়ি!

একটা ঘড়ি অনেক সময় সম্পর্কের মধ্যে প্রশ্ন টেনে আনতে পারে। একটা ঘড়িই নিরাপত্তায় ভাঙন ধরায়। একটা ঘড়ি...।

সম্রাট বালিশের তলায় ওর ঘড়িটা ফেলে গিয়েছিল। এটা ছাড়াও ওর সঙ্গে আরো একজন ঘড়ি আছে। তাই হয়তো লক্ষ করেনি। বালিশের তলায় চাপা পড়ার দরুণ ওটা আমার চোখেও পড়েনি।

কিন্তু অর্কর চোখে পড়ল।

—'আরেঃ...এটা কী?' রাতে খাওয়াদাওয়ার শেষে ঘরে ফিরে আয়েশ করে বসেছিল অর্ক। বালিশটা কোলে নিয়ে বসতে গিয়েই কাণ্ডটা ঘটল।

—'ঘড়ি! কার ঘড়ি এটা!'

হতবাক হয়ে তাকাল অর্ক!

—'আমার তো নয়!'

বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। কার সেটা না বললেও চলে। এত দামি ঘড়ি পরার সামর্থ্য ও স্পর্ধা একজনেরই আছে।

—'আমি কী করে জানব?'

যেন সারাদিন আমিই রামোজি ফিল্ম সিটির চক্কর কেটে বেরিয়েছি। আর অর্ক ঘরে বসে বাক্স প্যাঁটরা কড়িকাঠ গুনেছে।

—'ঘড়িটা কার তিস্তা?'

—'জানি না।'

—'সম্রাট এসেছিল নাকি?'

—'সম্রাট!'

—'হ্যাঁ...সম্রাট এসেছিল?'

—'ও...হ্যাঁ...একবার এসেছিল।'

—'তা হলে ও ব্যাটারই হবে।' অর্ক বলল—'ছেলেটা চিরকালই কেয়ারলেস। এত দামি একটা ঘড়ি এভাবে কেউ ফেলে রেখে যায়? আশ্চর্য...' বলতে বলতেই সে উঠে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় সম্রাটকে ঘড়ি ফেরত দিতে যাবে।

কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। তবু বললাম—'কোথায় যাচ্ছ?'

—'কেন? এটা ফেরত দিতে।'

—'কাকে ফেরত দেবে!'

—'কেন? সম...ও হো হো। ওকে তো এখন পাওয়া যাবে না। তাই তো! দেখেছ একদম ভুলে গিয়েছি।'

ভুলে যাওয়াই অর্কর স্বভাব। সকালের তিক্ততাও কী সুন্দর ভুলে গেছে ও! কী সহজভাবে এখন কথা বলছে। যেন কিছুই হয়নি। কোথাও কোনো সমস্যা নেই। সবকিছুই সুন্দর সুস্থ। একবারও সন্দেহ হল না যে ঘড়িটা বালিশের তলায় গেল কী করে? কী অদ্ভুত নিশ্চিন্ত! আমায় সন্দেহ করার মতো, চেপে ধরার মতো সাহসও ওর নেই।

—'তা হলে প্রফেসর মুখার্জিকে অন্তত দিয়ে আসি।'

—'রাত সাড়ে দশটা বাজে অর্ক।'

—'ওঃ...তাও তো বটে। এতক্ষণে বোধহয় শুয়েও পড়েছেন।' অর্ক হতাশ হয়ে আবার বিছানায় ফিরে এল। ঘড়িটা টেবিলের উপর রেখে ব্ল্যাঙ্কেটটা কোমর অবধি টেনে দিয়েছে। আমি ওর দিকে পিছন ফিরে শুয়ে আছি। কিন্তু টের পাচ্ছি সবই। টেবিলের উপরে জলের জার থেকে গ্লাসে জল ঢালছে কুলকুল করে। ঢকঢক করে খেয়ে নিয়ে হাই তুলল। এরপর আলোটা নেভাবে। তারপর আমার কাছে এসে ঘন গলায় বলবে...।

—'এই...কথা বলবে না?' অর্ক প্রায় আমার ঘাড়ের উপর উঠে এসেছে। ওর গরম নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আছড়ে পড়ছে কানের ভেতর। জোর করে আমায় ওর দিকে ফিরিয়ে বলল—'এখনো রেগে আছ?'

—'না।'

—'তবে একটা হামিও দিচ্ছ না?'

—'ভালো লাগছে না অর্ক।'

—'নাঃ...এখনো রেগে আছ। আচ্ছা বাবা আচ্ছা। চলো নাক মলছি, কান মলছি। বহুৎ গলতি হো গয়া মহারানিজি। এবার খুশ?'

—'ঠিক আছে।' আবার পাশ ফিরে শুলাম। ভালো লাগছিল না।

—'এ-ই, শোনো না। আজ কত জিনিস দেখলাম জানো...।'

—'আমার ঘুম পাচ্ছে অর্ক।'

—'ঘুম পাচ্ছে!' অর্ক কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকল। তারপরই আমায় ছেড়ে দিয়ে সশব্দে উঠে গেল। দপ করে আলোটা জ্বলে উঠেছে। ড্রয়ার খোলার শব্দ। তারপরই খুট করে ছিটকিনি খুলল।

—'কোথায় যাচ্ছ?'

—'দ্যাটস নান অফ ইওর বিজনেস।'

—'আলোটা কি মুখের উপরেই জ্বলবে?'

অর্ক প্রায় ঘর থেকে বেরিয়েই গিয়েছিল। ফিরে এসে আলো নিভিয়ে দিল।

অন্ধকার! অন্ধকারের মতো আবরণ আর নেই। অন্ধকারের মতো শান্তি আর কোথায়? কোথাও কোনো চাঞ্চল্য নেই, ব্যস্ততা নেই। নেই মানবজীবনের কোনো উত্তাল তরঙ্গ। নিশ্ছিদ্র, নির্লিপ্ত অন্ধকারে ডুবতে ভালো লাগে। মনে হয় সমুদ্রের কোনো অতল গর্ভে মৎস্যকন্যার মতো ঘুমিয়ে আছি আমি। চতুর্দিকে কালিমাখা জলে মাতৃগর্ভের নিরাপত্তাময় অন্ধকার।

সম্রাটের কথা

আমি কী বলব?

কথা বলতে আমার ভালো লাগে না।

তার মানে আদৌ এই নয় যে বলার কিছু নেই। বলতে চাইলে অনেক কিছুই বলতে পারি। রং ঝলমলে শৈশবের কথা বলতে পারি। সাদা-কালো কৈশোরের কথা বলতে পারি। কুচকুচে কালো যৌবনের কথা বলতে পারি। মৃত্যুর কথা, ঘায়ের কথা, পচা-গলা শবের কথা কিংবা যৌনতার কথাও বলতে পারি। কিন্তু কেন বলব? কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। সামাজিক জীবনে বোবা পদবিটা এড়ানোর জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু কথাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। বাদবাকিটা না বললেও চলে।

অবশ্য বলেও বিশেষ লাভ হয় না। লোকে যতটুকু শুনতে চায় তার বেশি কথা মানেই অবান্তর বুকনি। কথা মানেই নিজেকে প্রকাশ করার ব্যর্থ চেষ্টা। কারণ বহুদিন ধরে একই কথা বারবার বলা সত্ত্বেও সে প্রকাশ মানুষের কাছে অপ্রকাশিতই রয়ে যায়। কেউ কাউকে চিনতে পারে না। কেউ কাউকে বুঝতেও পারে না। তাই কথা বলাটাই একরকম ভণ্ডামি।

ঠিক এই কারণেই মদকে আমি ভয় পাই। পেটে পড়তে না পড়তেই মাথায় চড়ে বসে। পেটের ভিতর, বুকের গোপনে যত অকথিত কথা আছে সব খুঁজে খুঁজে টেনেটুনে উগড়ে দেয়। লোকে ভাবে ভাঁট বকছে। ভয় পায়। দয়া দেখায়। রাগ করে, হাততালিও দেয়—যেন ভানুমতীর খেল। অসংলগ্ন কথায় লেখা ট্র্যাজেডি শুনে হাসে।

তবু আমি মদ খাই। মদ ছাড়া চলে না, কারণ ওটা ছাড়া আমি ঘুমোতে পারি না। রাত হওয়ার সাথে সাথেই মনে হতে থাকে কালো চাদরে মোড়া

একটা মূর্তি রাতের অন্ধকার গায়ে মেখে দরজার ফাঁক দিয়ে সাঁৎ করে চলে গেল। একবার নয়, দুবার নয়, বারবার—একের পর এক। সিনেমাহলে আটকে যাওয়া রিলের মতো বারবার সেই একই দৃশ্য। অশরীরী ছায়া ছায়া—নির্লজ্জের মতো কেউ চলে যাচ্ছে করিডোর বেয়ে।

হেঁটেই যাচ্ছে...হেঁটেই যাচ্ছে...হেঁটেই যাচ্ছে...।

—'সম্রাট।'

—'হে-ই প্র-ফে-স-র! তুমি কো-থে-কে এলে বস! তোমায় তো এতক্ষণ দেখিনি।'

—'চোখ পরিষ্কার থাকলে তবে তো দেখবে। মদ খেয়েই তো চোখ ঝাপসা করেছ। দেখবে আর কী করে?'

—'নাঃ...না...না।'

—'কী হল?'

—'আমি তো-মা-য় দেখলাম না কে-ন? কে-ন? ...কে-ন?

—'কী আপদ! অন্ধকারে ছাতে এসে আকণ্ঠ মদ গিলে বসে থাকলে না দেখাটাই তো স্বাভাবিক।'

—'না...না...না...তা নয়।'

—'তবে কী?'

—'তুমি কালো চাদর গায়ে দিয়েছ। করিডোর বেয়ে অন্ধকার হয়ে হাঁটছিলে। অ্যাম আই রাইট? এটা কী চাদর? কালো? দেখি...দেখি...আঃ... দেখতে দাও আমায়...।'

—'সম্রাট। সোজা হয়ে দাঁড়াও। তুমি পড়ে যাচ্ছ।'

—'আমায় পড়তে দিয়ো না প্রফ, ধরো...ধরো...এই...।'

—'এই তো ধরেই আছি।'

—'আরো জোরে ধরো। আরো শক্ত করে...যাতে আমি বুঝতে পারি যে তুমি আছ। ভীষণভাবে আছ।'

—'এই তো আছি সম্রাট। আমি তো তোমার পাশেই আছি। এখন চলো।'

—'দু হাত বাড়িয়ে আছ প্রফ? আমার বাবার মতন?'

—'আছি। এখন চলো। নীচে চলো।'

—'কোথায়?'

—'আমাদের ঘরে।'

—'আমার ঘর? সে তো নেই।'

—'আমাদের ঘর। হোটেলের ঘরে।'

—'ওঃ...হ্যাঁ। হোটেলের রুম। নাঃ...এখন যাব না। এখানেই আমায় থাকতে দাও না। আর কিছুক্ষণ...প্লিজ।'

—'আচ্ছা। বেশ।...তবে এইখানে বোসো...আরে...আরে...কী করছ? অত হড়বড় করলে পড়ে যাবে যে। ধীরেসুস্থে বোসো। হ্যাঁ...এইবার ঠিক হয়েছে।'

—'ঠিক হয়েছে প্রফ? আর পড়ব না?'

—'না।'

—'এইবার...কী যেন বলছিলাম? ও হ্যাঁ, তুমি কখন এলে বলো তো? আমি...আমি তোমায় দেখলাম না কেন?'

—'তোমার প্রশ্নের উত্তর পরে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমার কথার উত্তর দাও।'

—'ব-লো।'

—'তুমি মদ খাও কেন? এমন কী দুঃখ তোমার?'

—'হুম্।'

—'কী চাপা দিতে চাও তুমি? বলো...।'

—'মদ কেন খাই?'

—'কেন খাও?'

—'হু ম্ ম্ ম্...খারাপ লোকেরা তো তাই খায়। খায়, ফুর্তি করে—আর ভি-স্যু-ম!...খুন করে—তাই আমিও...।

—'তুমি তো তা নও।'

—'সে তুমি মনে করো। হ্যাঁ...হ্যাঁ...আরো একজন...আরো একজন তাই ভাবে।'

—'কে?'

—'ওই যে...ওই মেয়েটা কী যেন নাম?'

—'কে?'

—'ধু-স্। বাদ দাও। হ্যাঁ...কী যেন বলছিলাম...তোমায় আমি দেখতে পাইনি কেন?'

—'এটা আমার প্রশ্নের উত্তর হল না।'

—'কী প্রশ্ন? কী প্রশ্ন ছিল প্রফ? প্রসিড...প্রসিড এগেইন।'

—'মদ কেন খাও?'

—'না খেলে ঘুমোতে পারব না যে! ওই লোকটা...ওই লোকটা আমায় আবার বিরক্ত করবে। ঘুমোতে দেবে না।'

—'কোন্ লোকটা?'

—'ওই যে—করিডোর দিয়ে হেঁটে যায়। চুপিচুপি। কালো চাদর গায়ে। বাই দ্য বাই। তোমার চাদরটা কী রঙের?

—'সাদা। কিন্তু কোন্ লোকটার কথা বলছ তুমি?'

—'ওই যে...ওই লোকটা।'

—'কোন্ লোকটা।'

—'যে লোকটা ওই মহিলার ঘরে যায়। রাতের বেলা...চুপিচুপি।'

—'কোন্ মহিলা?'

—'কোন্ মহিলা! আমি কী জানি!'

প্রফেসর চুপ করে গেলেন। কেমন যেন মনে হচ্ছে একটা বৃষ্টিভেজা ঘষা কাচের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঝাপসা গা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। কখনো টুপটাপ পড়ছে, কখনো বা অঝোরধারে। একি বৃষ্টি! নাঃ...তা নয়। তবে এ স্বাতী নক্ষত্রের জল।

কিন্তু প্রফেসরের গায়ে পড়ছে কেন? মুক্তো তৈরি হবে? প্রফেসর কি ঝিনুক? হাতের উপর একঝলক নিঃশ্বাস!

—'প্রফ! দীর্ঘশ্বাস ফেলছ!'

—'চলো, আর বসে থেকে কাজ নেই।'

—'দীর্ঘশ্বাস ফেলছ কেন? আ-মার জন্য? কেন-কেন?'

—'ওঠো সম্রাট।'

—'না, বলো। টেল মি। ঠিক করে বলো। এই...এই...আমার মতো শালা একটা বেজন্মার জন্য তুমি দীর্ঘশ্বাস ফেলছ! কেন গো? এই...এই...তুমি আবার আমার প্রেমে পড়লে না তো? ওই মেয়েটার মতো? হাঃ...হাঃ...হাঃ...।

—'যথেষ্ট হয়েছে। তুমি একদম মাতাল হয়ে গেছ সম্রাট। চলো ঘরে চলো।'

—'শোনো না...শোনো না। একটা মজার কথা বলি। ওই যে মেয়েটা

আছে না...।'

—'কোন্ মেয়েটা?'

—'আঃ। মাঝখানে বড্ড কথা বলো তুমি। আগে শোনো।'

—'বলো...শুনছি।'

—'হ্যাঁ...ওই মেয়েটা। ওই মেয়েটা সেদিন আমায় ডেকে কী বলে জানো? বলে কিনা...খিঁক...খিঁক...খিঁক...বলে কিনা আমায় ভা-লো-বা-সে। কা-কে ভালোবাসে? না...আমায়। আমার মতো একটা ইতর, অভদ্র, মাতাল, লম্পটকে ভালোবাসে। হোঃ...হোঃ...হোঃ...মজার কথা নয়?'

—'বাসতেই পারে। এতে হাসির কী হল?'

—'হাসির কথা নয়? শা-লা গোটা লাইফটায় এই একটা কথা বলার জন্য কেউ জুটল না। যখন এই একটা কথা এই ব্লাডি বাস্টার্ডের ভাগ্য পাল্টাতে পারত, যখন এই কথাটার মানে আমি বুঝতাম—তখন শালা কারো মুখ থেকে বেরোল না।...আর আজ, যখন আমি ধ্বংসস্তূপ, হাফমরা...বাকিটাও মরতে চলেছি তখন কিনা বলে আমায় ভালোবাসে। আমায় ভালোবাসে। মরণকালে ভাবের কথা...what a joke ...হাঃ...হাঃ...হাঃ...।'

—'কাঁদছ সম্রাট?'

—'কাঁদব কেন প্রফ? হাসছি...আমি হাসছি।'

—'তুমি কাঁদছ সম্রাট।'

কাঁদছি! হতে পারে! ...হতে পারে! কিন্তু কেমন করে বুঝলে তুমি? তুমি কি বোকো প্রফেসর বুকের ভিতরে যখন দাবানল জ্বলে তখন কেমন লাগে? তুমি সাত্ত্বিক মানুষ। পাপের কী বোঝো? আমি বুঝি। আমি ছুঁয়ে দেখেছি। পাপ অন্ধকূপের মতো ভয়ঙ্কর, মৃত্যুর মতো শীতল। অশরীরীর মতো না থেকেও রয়ে যায়।

—'চলো...নীচে চলো। আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলো।'

—'বন্দনা...বন্দনা...।'

—'আমি বন্দনা নই।'

না তুমি বন্দনা নও। তুমি প্রফেসর। কিন্তু যদি বন্দনা হতে! কিংবা বন্দনা তোমার মতো হত!

সোজা, সরল মেয়ে। ও মেয়ে শরীরের কথা জানে না। অন্ধকারের কথা জানে না। সরীসৃপের কথা জানে না। ওকে নিয়ে আমি কী করব? দু চোখে

আগুন জ্বেলে ও তাকিয়ে থাকে। সারল্যের আগুন, পবিত্রতার আগুন। ও বোঝে না ওই আগুন আমার মতো অন্ধকারের প্রাণীর সইবে না। আমি পুড়ে যাব, ছারখার হয়ে যাব।

বন্দনা...বন্দনা। আমি তোমার ঠোঁটে চুমু খাচ্ছি। গলায় চুমু খাচ্ছি, বুকে চুমু খাচ্ছি। কিন্তু এর বেশি আর কিছু চেয়ো না। এর বেশি তোমায় আর কিছু দিতে পারব না। আর পারব না। আমায় ক্ষমা করো, আমায় মাফ কোরো।

সকালবেলা ঘুম ভাঙল নাকঝাড়ার শব্দে!

এটা দাসবাবুর প্রাত্যহিক অভ্যাস। রোজ সকালে স্নানে যাওয়ার আগে নাক দিয়ে সারাদিনের ক্লেদ, ক্লান্তি না ঝেড়ে ফেলা অবধি তার শান্তি নেই। মাঝেমধ্যে তার নাকঝাড়ার চোটে আশঙ্কা হয় যে শেষ পর্যন্ত নাকটাই না খুলে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয়নি—হওয়ার সম্ভাবনাও নেই।

চোখ মেলতেই একটা তীব্র যন্ত্রণা মাথা থেকে মেরুদণ্ড অবধি ঝিলিক দিয়ে গেল। মাথার দু-পাশের শিরা দপদপ করছে। গলার কাছটা শুকিয়ে কাঠ। পেটের ভিতর বমিবমি ভাব ঘোঁট পাকাচ্ছে। বাইরে খটখটে আলো। বুঝলাম বেশ বেলা হয়ে গেছে।

—'হ্যালো সম্রাট, নেশা কেটেছে?'

প্রফেসর মুখার্জি! সকালবেলাই তার স্নান কমপ্লিট। বিছানার চাদর ফিটফাট। ব্ল্যাঙ্কেটটা পোষা বিড়ালের মতো গোছানো গাছানো হয়ে পায়ের কাছে পড়ে আছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। সম্ভবত আয়নার কাচে আমায় নড়াচড়া করতে দেখেই পিছন ফিরে তাকিয়েছেন।

তার দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে ঘুম ঘুম হাসি দিয়ে বললাম—'হ্যালো প্রফ। গুড মর্নিং।'

—'ব্যাড মর্নিং।' চিরুনিটা ড্রেসিং টেবিলের উপর ঠকাস করে রেখে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর—'কাল রাতে খুব জ্বালিয়েছ তুমি।'

—'কেন? নাক ডেকেছি?'

—'নাঃ।' তিনি এসে বিছানার উপর বসলেন—'নাক তুমি ডাকো না। তবে আরো অনেক কিছু করেছ।'

আশঙ্কায় প্রায় কাঁটা হয়ে গেলাম। সর্বনাশ! কী করেছি! খিস্তিখেউড়

করিনি তো। কাল রাতে ছাতে বসে এন্তার মদ খাচ্ছিলাম। প্রফেসর আমায় নীচে নামিয়ে আনছিলেন। কিন্তু তারপর! তারপর কী হয়েছিল? প্রাণপণে ভাবার চেষ্টা করলাম। নাঃ...সব ব্ল্যাঙ্ক।

—'কী করেছি প্রফ? আপনাকে কিছু বলিনি তো।'

—'হুম্।' প্রফেসর গম্ভীর হয়ে বললেন—'বলেছ তো অনেককিছুই। কালোচাদর পরা লোকের কথা বলেছ। এক মহিলার কথা বলেছ। অনেক কথাই বলেছ। তবে খারাপ কিছু বলোনি।'

—'কেঁপে উঠলাম! কালো চাদর! মহিলা! প্রফেসরকে এমন কথা আমি বলেছি! কেমন করে বললাম! কেমন করে বেরিয়ে গেল! আর কিছু বলিনি তো!

—'আর কী কী বলেছি?'

—'নাঃ, আর কিছু নয়।'

—'তবে?'

—'নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো। বুঝতে পারবে।'

তাকালাম। তাকিয়েই মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। ব্ল্যাঙ্কেটের তলায় থাকার দরুন এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। আমরা গায়ে জামা নেই। কিছুই কি নেই! নাঃ...গেঞ্জি আর বারমুডা আছে। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল এই যে সারা গায়ে ছোপ ছোপ কালি জমে আছে। কেউ যেন মনের আনন্দে কালির দোয়াতটা পুরো ঢেলে দিয়েছে আমার উপরে।

—'একী প্রফেসর? আমায় এমন করে কালি মাখাল কে? আমি তো...আমার তো কিছুই...।'

প্রফেসর আবার আয়নার কাছে ফিরে গেছেন—'তুমি নিজে থাকতে কালি মাখানোর জন্য অন্য আর কাউকে দরকার আছে?'

—'মানে?...আমি নিজে...?'

'হ্যাঁ। তুমি নিজেই। ছাতের সিঁড়ির নীচে একটা হাফ-ভর্তি কালো পেইন্টের ড্রাম ছিল মনে আছে? উপর থেকে নীচে নামার সময় কথা নেই বার্তা নেই ওটার ঘাড়ের উপরই উলটে পড়লে। তুমি নীচে সেন্সলেস। আর ড্রামটা তোমার উপর। কেলেঙ্কারিয়াস কাণ্ড! তাও কপাল ভালো যে অর্ককে পেয়ে গেলাম।'

—'অর্ক!'

—'হ্যাঁ...সে করিডোরে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট খাচ্ছিল। কাণ্ডটা দেখেই ছুটে এসেছে। তারপর দুজনে মিলে ঘাড়ে করে তোমায় ঘরে টেনে আনলাম। জামাকাপড়ের যা অবস্থা হয়েছিল সে আর বলার নয়।'

—'সেগুলো কোথায়?'

—'কোথায় আর যাবে?' কাল রাতেই সেগুলো খুলে বাথরুমে ফেলে রেখেছিলাম।'

—'বাথরুমে...আচ্ছা।' আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিলাম। কালিমাখা জামাকাপড়গুলোর কিছু একটা গতি তো করতে হবে। এতক্ষণ পরে থাকার পর সেগুলোর রং কতটা খোলতাই হয়েছে কে জানে! তেমন হলে ফেলে দিতে হবে। তাছাড়া নিজের বর্তমান রূপটাও যে খুব নয়নবিমোহন তা-ও বলা যাচ্ছে না।

—'কোথায় যাচ্ছ?'

—'বাথরুমে। কাপড়গুলো....।'

—'সেগুলো কি আর তোমার জন্য বসে আছে? ওগুলো রাতেই কাচা হয়ে গেছে। সকালবেলা বয়ের হাতে লন্ড্রির জন্য পাঠিয়ে দিলাম।'

ওঃ, তা হলে তো সবই হয়ে গেছে। কিছুই বাকি নেই।

মনে মনে বেশ বিরক্ত হলাম। চিরদিন নিজের কাজ নিজেই করে অভ্যস্ত। রাত্রে বমি করে তার উপরেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে থেকেছি। সকালে উঠে সেই সব নিজেই পরিষ্কার করেছি। 'মেড'কেও ছুঁতে দিইনি। কারো সহযোগিতা, দয়া কোনোদিন প্রয়োজন হয়নি। প্রয়োজন পড়ুক তা আমিও চাই না।

কিন্তু এই লোকটা সেই অভ্যাস নষ্ট করে দিচ্ছে। বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ। তাই কিছু বলতেও পারি না। অথচ রোজ রাতে এই লোকটা আমায় ঠিক খুঁজে পেতে ঘরে ফিরিয়ে আনে। বমি পরিষ্কার করে। জামাকাপড় পাল্টে দেয়। নিশ্চুপে আমার উৎপাত সহ্য করে। কেন? ও কে হয় আমার—যে আমার জন্য ওর এত দরদ? কী চায় লোকটা?

আমি অঙ্কটা মেলাতে পারছিলাম না। এতদিন যাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, যারা আমাকে ঘিরে ছিল, তাদের হাওয়া অনেক সহজ। তারা প্রত্যেকেই ছোটোখাটো ভিখিরি। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু চেয়েছে। কেউ চেয়েছে অর্থ কেউ চেয়েছে শরীর।

তাদের কাউকে আমি ফেরাইনি। একহাজার চাইলে দশহাজার দিয়েছি। মেয়েরা আমার কাছে এত নষ্ট হতে এসেছে। কেন এসেছে জানি না। আমার মধ্যে তারা কী এমন আকর্ষণীয় বস্তু দেখে তা-ও তারাই জানে। কিন্তু এসেছে এটা ঠিক তারা সব এক। একই স্বাদের মাংস। একঘেয়ে প্রেমহীন যৌনতা। তবু আকণ্ঠ মদে ডুবে, বিবেকবুদ্ধির তোয়াক্কা না করে তাদের বিছানায় নিজেকে মেলে ধরেছি। প্রথম উপভোগ করলেও পরের দিকে এই যান্ত্রিক রিরংসা ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। ভালো লাগেনি তা-ও...।

কিন্তু এই লোকটা কী চায় আমার কাছে? কেন এখনো কিছু বলছে না? অর্থের প্রয়োজন ওর নেই। পরের চাহিদাটাও থাকতেই পারে না। তবে? এই দুনিয়ায় স্বার্থ ছাড়া কেউ কি এক পাও চলে? পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই যে গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি।

অস্বস্তিটা ক্রমশই বাড়ছিল। প্রফেসর মুখার্জিকে কিছুতেই চেনাজানা ফর্মুলায় ফেলতে না পেরে বিরক্তি হচ্ছিল। ভাবলাম সরাসরি জিজ্ঞাসাই করে ফেলি।

—'প্রফেসর?'

প্রফেসর চুল আঁচড়ানো শেষ করে বিছানায় বসে খুব মনোযোগ দিয়ে চশমার কাচ পরিষ্কার করছিলেন। এবার চোখ তুলে তাকালেন—'বলো।'

প্রফেসরের চুলে কাঁচাপাকা রং ঝিলমিল করছে। একটু ভাসা ভাসা দৃষ্টি। হয়তো কিছু ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। ডাক শুনে তাকিয়েছেন। ভারী পাওয়ারের চশমায় রোদ্দুরের প্রতিবিম্ব। অবিকল আমার বাবার মতো। আমার বাবাও এমনভাবেই চোখে রোদ্দুর ধরতেন। ঠিক এমন করেই।

—'কী হল? কিছু বলবে?'

—'থ্যাঙ্কস প্রফ।'

—'থ্যাঙ্কস? কেন?' প্রফেসর অবাক হয়ে বললেন—'এতক্ষণ পরে হঠাৎ ঘটা করে থ্যাঙ্কস?'

—'এমনিই, মনে হল।'

—'মনে হল!' তিনি হাসলেন। যেন ঝরঝর করে একরাশ বকুলফুল ঝরে পড়ল।

—'তাও ভালো।'

আমি খারাপ!

আমি জানি আমি খারাপ। আমি মদ খাই, কিন্তু কারো বাপের পয়সায় খাই না। মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করি, কিন্তু তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়। আমি রুক্ষ, কঠিন। নমনীয় হতে জানি না। কারণ কোমল প্রবৃত্তির 'ক' এর সাথে আমার বর্ণপরিচয় হয়নি। জানি না কেমন করে ভালোবাসতে হয়, বিশ্বাস করতে হয়। ঘর, সম্পর্ক, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা, মায়া শব্দগুলোকে সিগ্রেটের ধোঁয়ার মতোই বায়বীয় উড়নচণ্ডী মনে হয়। ওই শব্দগুলোর জায়গা আমার অভিধানে নেই।

আজ সকালবেলা অর্ক এসে হানা দিয়েছে আমাদের ঘরে। কাল আমি ওদের রুমে ঘড়িটা ফেলে এসেছিলাম। ও সেটাই ফেরত দিতে এসেছিল। তার আসা থেকেই আমি যে কতটা কেয়ারলেস তার ফিরিস্তি শুরু হয়েছে।

—'বুদ্ধিটাকে তো মদের বোতলেই রেখে দিয়েছিস।' অর্ক জোর গলায় বলল—'এত মদ না খেলেই পারিস সম্রাট। কাল তোর যা অবস্থা ছিল, ভাবা যায় না। এত অল্পবয়সে এমন মারাত্মক নেশা!—এটা ঠিক নয়।'

বিনামূল্যে জ্ঞান দিতে সকলেরই ভালো লাগে। এটা অর্কর দোষ নয়। আমরা যাকে সমাজ বলে থাকি সেই অবয়বহীন প্রাণীটাই ওদের এমন বুলি শিখিয়েছে। মালটা নিজেকে যে কী ভাবে কে জানে! হাত নেই, পা নেই, রাঙানোর জন্য চোখ নেই, শাসন করার মুখ নেই অথচ খবরদারি করতেও ছাড়বে না। অর্কর মতো ছাপোষা লোকগুলো তার ভয়ে জুজু হতে পারে, কিন্তু আমার মতো তস্য হারামজাদারা সে কথা শুনবে কেন? যাকে চোখে দেখা যায় না, যার কণ্ঠস্বর শোনা যায় না, যার অস্তিত্ব কোনোদিন টের পাইনি তার কথা শোনার ধার ধারি না আমি। চুলোয় যাক সমাজ! জাহান্নমে যাক দুনিয়া।

—'কী রে? কিছু বলছিস না যে?'

—'কী বলব?'

—'এতক্ষণ ধরে যে আমি বকে যাচ্ছি, সেকি ওই দেয়ালটাকে উদ্দেশ্য করে?'

—'বকছিস কেন?'

—'ধ্যুৎ।' অর্ক রেগেমেগে উঠে যাচ্ছিল। বেগতিক দেখে আমিই আবার ওর হাত ধরে টেনে বসিয়েছি—'আরে...বোস...বোস...।'

—'না...তুই কিছু শুনবি না ঠিক করেছিস। বসে কী করব?'

—'এইবার শুনব। প্রমিস। নে, বল...কী বলছিলি।'

অর্ক এবার খানিকটা ঠান্ডা হয়েছে।

—'তুই বন্দনার বিষয়ে কিছু ভেবেছিস?'

—'বন্দনা! তার বিষয়ে ভাবতে হবে নাকি?'

—'যাচ্চলে! ভাবতে হবে নাকি মানে? বন্দনা তোকে কিছু বলেনি?'

মাথাটা অসহ্য ভার হয়েছিল। সকাল থেকে ঘুম ঘুম ভাবটা ছাড়তেই চাইছে না। এর মধ্যে এমন আলোচনা ভালো লাগছিল না। মনে হচ্ছিল ওর মুখের উপরই বিকট হাঁ করে বিরাট একটা হাই তুলি। সেটাকে একটা আলতো আড়মোড়ার উপরেই কাটিয়ে দিয়ে বললাম—

—'কী বিষয়ে বল তো?'

—'আশ্চর্য! তুই কী রে? মেয়েটা এত আশা করে তোকে মনের কথাটা খুলে বলল। আর তুই ভুলে মেরে দিলি।'

—'ওঃ' আমি আবার নরম বালিশ আর ব্ল্যাঙ্কেটে ডুবতে ডুবতে বললাম—'ওই ব্যাপারটা। ওটা ভাবার কিছু নেই।'

—'মানে?'

—'বাচ্চা মেয়ে, ইনফ্যাচুয়েশন হয়েছে...কেটে যাবে।'

—'আর ইউ শিওর?'

—'ড্যাম শিওর বেবি।' পাশবালিশটার উপর পা তুলে দিয়ে বলি—'ওর কাছে আমি বিস্‌সা-ল হিরো। অরণ্যদেব, সুপারম্যান আর জন আব্রাহামের মিক্সচার। ও তো জানে না যে আমি আসলে কী চিজ। জানাবোঝার মতো বোধবুদ্ধি নেই।'

—'সেটা ওকে খোলাখুলি বললেই পারিস। অভি বলছিল মেয়েটা খুব কষ্ট পাচ্ছে!'

অভি! অভিজিৎ! ওঃ হো...এইবার কেসটা বোঝা গেল। তাই ভাবি অর্কর মতো এমন ব্যোমভোলা লোক এ ব্যাপারটা জানল কেমন করে! ভালো লোকের কাছেই গেছে বন্দনা। এতক্ষণে বোধহয় এ হোটেলের সামনে বসে থাকা কুত্তাটারও খবরটা জানা হয়ে গেছে।

—ফিকে হয়ে যাওয়া বিরক্তিটা আবার মাথায় চেপে বসল। মেয়েগুলো চিরকালই বিশ্বন্যাকা। সব একরকম। ছুঁতে না ছুঁতেই তোলো হাঁড়ি পিটিয়ে বলবে—'আমি প্রেগন্যান্ট।'

—'কিন্তু সম্রাট, এভাবে কতদিন চলবে? বন্দনা মেয়েটা খারাপ নয়। ভেবে দ্যাখ...'

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল।

—'আমার এসব ভালো লাগে না ইয়ার।' আমি প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছি—'আমার ভালো লাগে না। ও একটা কুড়ি-একুশ বছরের বাচ্চা মেয়ে। ওর হাসি আছে আনন্দ আছে, উচ্ছলতা আছে। ছেলেমানুষের মতো লাফালাফি করতে ভালোবাসে। ওর বয়সে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি? আমি শালা বত্রিশ বছরের বুড়ো ধাড়ি। চুল পাকার সময় হল। তুই এখন আমায় কমলালেবু, আঙুলওয়ালা শার্ট আর হাফপ্যান্ট পরে সি-বিচে সাম্বা নাচতে বলিস?... ওঃ...ওঃ...'

এমনিতেই হ্যাংওভার। তার উপর বেশি উত্তেজনার চোটে সটান উঠে বসেছিলাম। মনে হল মাথার ভিতরে কী যেন ফুটে গেল। তীব্র যন্ত্রণায় কিছুক্ষণের জন্য চোখে অন্ধকার দেখলাম।

—'বি কোয়ায়েট...বি কোয়াটে সম্।' অর্ক তড়াক করে এসে আমায় ধরেছে—'কুলডাউন...কুলডাউন...তোর শরীর পুরোপুরি ঠিক নেই।'

—'আমায় ছেড়ে দে, আমি ঠিক আছি।'

—'না...ইউ নিড রেস্ট। তুই শুয়ে পড়।'

—'আমি ঠিক আছি।'

—'না তুই ঠিক নেই।'

—'আই সে...আই অ্যাম অলরাইট।'

—'অর্ক আমায় ছেড়ে দিল। কিন্তু চলে গেল না। একটু দূরে গিয়ে সে আমায় অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখছে।

—'কী দেখছিস?'

—'তোকে। তুই ভাঙবি তবু মচকাবি না-নারে?'

কষ্ট হচ্ছিল। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। চোখে জল আসছিল। তবু হাসলাম। কেন বুঝতে দেব যে কতটা যন্ত্রণা হচ্ছে আমার? ত্রিভুবনে কাউকে আমি আপন মনে করি না। কাউকে বিশ্বাস করি না। আমার জন্য কোথাও কেউ নেই...আমি জানি... কেউ নেই...কেউ না।

—'একটা সত্যি কথা বলবি?'

কথা বলতে পারছিলাম না। মাথা নেড়ে জানলাম 'বলব।'

—'তুই কি কোনোদিন সেটল করবি না? ঘর বাঁধবি না? চিরদিনই এমন ছন্নছাড়ার মতো ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়াবি?'

অত কষ্টেও হেসে ফেললাম। কী সরল রে তুই অর্ক। দুনিয়া এখনো দেখিসনি বাপ! আমরা সবাই যাযাবর। ঘর-ঘর সব ফালতু কথা। কবিতা-উপন্যাস-গল্পে ওসব থাকে। বাস্তবে থাকে না।

কিন্তু এসব কথা তো আর বলা যায় না।

—'নাইন সেভেন থ্রি টু সেভেন ফাইভ নাইন ওয়ান থ্রি ওয়ান।'

—এটা আবার কী?'

—'একজন কলগার্লের ফোন নম্বর। নাম রেশমী, হাইট পাঁচ-ছয়। বডি স্ট্যাটিসটিক্স ৩৮-২৬-৩৮। রেট পাঁচ হাজার টাকা পার নাইট। টিপিক্যাল মোম পালিশ। দিঘা বা দার্জিলিংয়ে সাতদিনের জন্য নিয়ে চলে যা। খরচ যা পড়বে তা তুই অ্যাফোর্ড করতে পারবি। বেরিয়ে টেরিয়ে এসে জানাস কেমন লাগল। তখনো যদি তুই আমাকে সেট্‌ল করার কথা বলিস তবে আই উইল থিঙ্ক ওভার ইট, প্রমিস।'

—'ধুস্'—অর্ক উঠে দাঁড়াল—'ইউ আর রিয়েলি...সম্রাট।'

—'বঞ্চিত বাক্কোৎ...রাইট?'

—'তোর সাথে কথা বলাই আমার অন্যায় হয়েছে। ঘটি হয়েছে।' অর্ক হুড়মুড় করে বেরিয়ে গেল।

অর্ক চলে গেল।

আমি ওর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই খুব একচোট হেসে নিলাম। ও এমন করে পালাল যেন আর কিছুক্ষণ থাকলেই আস্ত একটা কলগার্ল এসে ওর ঘাড়ে চাপবে। মানুষ এত ভীতুও হতে পারে। অর্কটা চিরকালই এমন। টিপিক্যাল গুড বয়! তিস্তার মতো একটা আগুনের হলকাকে কীভাবে ম্যানেজ করল কে জানে! কে বলতে পারে, তখন হয়তো ডোপিং করে মাঠে নেমে পড়েছিল! তাতেই তিস্তা বোল্ড আউট!

তিস্তা!—অনেকক্ষণ ওর কথা ভুলেছিলাম। এবার মনে পড়ে গেল। মেয়েটার দম আছে! বত্রিশ বছরের নীতিদীর্ঘ জীবনে কম মেয়ে তো দেখলাম না! বাঙালি মেয়েদের বিছানায় উষ্ণতা বিশেষ পাইনি। সেক্স সম্পর্কে তাদের নব্বই শতাংশের ধারণা যে—'আমি চুপচাপ শুয়ে থাকব, আর পুরুষমানুষটা আমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।'

কিন্তু এ মেয়ে তেমন নয়। যে কোনো পুরুষকেই তৃপ্ত করার ক্ষমতা ও [illegible]। আদর করলে পাল্টা আদর করতেও জানে। শি মেক্স মি [illegible]। যদিও আমি জানি যে কয়েকদিন বাদে তিস্তাও চলে যাবে [illegible]চের খাতায়! তবু এই মুহূর্তে শরীরটা কেমন করে উঠছে। মেয়েটা এখন কোথায়? সারে কাছে থাকলে বড়ো ভালো হত।

দমাস করে দরজাটা খুলে গেল। প্রফেসর মুখার্জি। এতক্ষণ প্রফেসর রুদ্রকে পাহারা দিচ্ছিলেন। কোনো দরকারে ফিরে এসেছেন।

—'একী। তুমি এখনো বিছানায়। ওঠো...ওঠো উঠে পড়ো। বেলা প্রায় বারোটা বাজতে যায়। স্নান করে নাও।'

—'প্রফ।' আমি ব্ল্যাঙ্কেটটা সরাতে সরাতে বললাম—'মাঝেমধ্যে আপনার এই মাস্টারিটা আমার অসহ্য লাগে জানেন?'

—'অসহ্য জিনিস একটু সহ্য করতে শেখো সম্রাট। মাথাধরা এখন কেমন আছে?'

—'আই অ্যাম ফাইন।'

—'দেখে তো মনে হচ্ছে না। এনিওয়ে, স্নান করে নাও, তারপর প্রফেসর রুদ্রকে একটু সামলিও। লোকটাকে আর রাখা যাচ্ছে না। কবে যে আমরা ফিরব।'

—'কেন? তার আবার কী হল?'

—'আবার খেপে উঠেছেন, পারলে অভিজিৎকে একহাত নেন।' তার মুখে চিন্তার ছাপ।

—'কী যে ভূত চাপল লোকটার ঘাড়ে। জানি না আদৌ সুস্থ হবে কি না।'

প্রফেসর আমার দিকে তোয়ালে আর সাবানটা ছুড়ে দিয়েছেন—'যাও, স্নানে যাও। দেরি কোরো না।'

অগত্যা। তোয়ালেটা ঘাড়ের উপর ফেলে আপনমনেই শিস দিতে দিতে বাথরুমে ঢুকে পড়লাম। একসময় গানটা বেশ ভালোই গাইতে পারতাম। ঈশ্বর আমাকে একেবারে বেগুন করে পাঠাননি। ভালো মাউথ অরগান বাজাতাম। আঁকার হাত দিয়েছিলেন। রাজ্যস্তরে বেশ কয়েকবার ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছি। অল্প বয়সে মনটার গায়ে যখন ফোসকা পড়েনি তখন কবিতাও লিখতে পারতাম। অবশ্য সে কবিতা শুনে শ্রোতারা ঘুমিয়ে পড়ত কিনা সেটা আলাদা বিষয়—কিন্তু লিখতাম তো।

সেসব কোথায় গেল কে জানে। হঠাৎ একদিন ব্যথিত হয়ে দেখলাম আমার ক্যানভাসের রংগুলো রং হারাতে হারাতে কালো হয়ে গেল। কবিতার ছন্দ, তালগুলো কোনো গুপ্তঘরে ঢুকে পড়ে তালা এঁটে দিল। সুরগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছোটো হয়ে মাধুর্য হারিয়ে ফেলল। তাই এখন শেষ সম্বল শিস।

কালো গ্র্যানাইট আর মার্বেলে মোড়া কী চকচকে বাথরুম। এক চিলতে অবসর। কিছু নিঃসঙ্গতা। আর অনেকখানি নীরবতা। বাঁচা গেল। এবার আমি একা। বেশ কিছুক্ষণের জন্য একাকিত্ব ঘিরে রাখবে আমায়। চারপাশে আগাছার মতো জমে থাকা ভিড় থেকে কেউ বলতে আসবে না—'সম্রাট, কেমন আছ?'

বাথরুমের র‍্যাকে আমার ব্রাশটা কে যেন গুছিয়ে রেখেছে। পেস্টটাও যথাস্থানেই রাখা। শ্যাম্পু, তেল, গোলাপজল এমনকি বিয়ারের ক্যানটাও ছবির মতো সেজে আছে। সিগ্রেট, লাইটার, রেজার, শেভিং ব্রাশ, সাবান আফটার-শেভ—সবই উপস্থিত। কিন্তু শেভিংক্রিম? সেটা তো দেখতে পাচ্ছি না।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম। শেভিং ক্রিমটা বাদে সবই আছে। গেল কোথায়? বেসিনের ধারে? নেই—বাথটবের ভিতরে?—নাঃ, গিজারের মাথায়?—ধুত্তোর—উপরের তাকে?

ওঃ! হিয়ার ইউ আর বে-বি। শ্যাম্পুর পিছনে লুকিয়ে আছ। কাম অন...কাম অন! কাম টু মি।

শেভিংক্রিমের টিউবটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। লেজের কাছটায় চাপ দিতেই ফট করে অনেকখানি ক্রিম একসাথেই বেরিয়ে এল। মেয়েদের নরম ঠোঁটের মতো সে একঝাঁক ফেনা নিয়ে মুখে, ঠোঁটে, গলায় ছড়িয়ে পড়েছে। মসৃণ, সাদা—ঠিক যেন তিস্তার বুক। রেজারের ধারালো দাঁত তাকে কামড়ে কামড়ে ছিন্নভিন্ন করছে।

উপ্‌স কেটে গেল! থুতনি বেয়ে লম্বালম্বি একটা রেখা। আদরে, সোহাগে লাল বিন্দু গলে গলে টপ করে ফোঁটা হয়ে খসে পড়েছে সাদা বেসিনের উপর। নিজের রক্তের দিকে তাকিয়ে নিজেই মোহিত হয়ে গেলাম। আমার রক্ত এত লাল! আজও! জানতাম না তো! এত লাল! এত অন্ধকারের এক চিলতেও কি জমেনি! আজও এত পবিত্রতা তার প্রতি ফোঁটায়! চুনি চুনি রক্তবিন্দুর কোথাও কি বিষাক্ত নীল নেই? এত লাল! কী করে হল! কী করে সম্ভব!

—'সম্রাট।'

বাইরে থেকে প্রফেসরের হাঁক ভেসে এল—'আমি অভিজিতদের রুমে আছি। তুমি স্নান সেরে ওখানেই চলে এসো।'

—'ওকে প্রফ।'

দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ। প্রফেসর বেরিয়ে গেলেন। বেসিনের কল খুলে থুতনির রক্ত মুছে নিলাম, বারমুডার দড়িটায় টাইট গিঁট পড়েছে। নখ দিয়ে টানাটানি করতে গিয়ে ছিঁড়েই গেল। যাক গে। আপাতত তো ওটাকে ফেলে রাখি। আবার কী করে পরব—তা নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে! কমোডের উলটোদিকের আয়নায় আমার সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়েছিল। দেখেও রাগ হল! ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের কী বুদ্ধি! কমোডে বসে বা উদোম হয়ে কারো নিজেকে দেখতে ভালো লাগে এমন কথা কেউ কখনো শুনেছে! অথচ সারা বাথরুমে ভর্তি আয়না!

মাথার ভিতরটা চিড়বিড় করে জ্বলছিল। ঠান্ডা জলের ধারা এসে পড়তেই বেশ আরাম পেলাম! জল! জলই জীবন! জলই শান্তি! ক্লান্তির অব্যর্থ নিদান। অনাবিল ধারায় শরীরে ঝরে ঝরে পড়ছে। অথচ বুক বেয়ে একফোঁটাও কি ভিতরে পৌঁছতে পারত না?

প্রফ...প্রফেসর!...প্রফেসর!...প্রফেসর বিদ্যুৎ মুখার্জি! কী চাও তুমি আমার কাছে? মাতাল হয়ে রাজ্যের জ্বালা তোমার উপর ঝেড়েছি। তোমার ছোট্টখাট্টো শরীরটাকে পেঁচিয়ে বিছানার পাশে বসিয়ে রেখেছি। যেন তুমি চলে গেলেই কালোচাদরওয়ালা ভূতটা আমায় চেপে ধরবে। বক বক করে সারারাত তোমায় ঘুমোতে দিইনি। তবুও আমার উপর কেন তোমার এত সহানুভূতি? কেন অন্য লোকের মতো তুমিও আমায় ঘৃণা করবে না? আমি তো অন্ধ নই? তোমার ওই শান্ত, গম্ভীর চোখ অপলক দৃষ্টিতে আমার কাছে কিছু চায়। সে চাওয়া অসীম, সে চাওয়া গভীর। আমি বুঝতে পারি না। কী চাও তুমি? কেন সে কথা মুখ ফুটে বলো না।

শাওয়ারের ঝাঁঝরা মুখ থেকে অঝোরে জল ঝরে পড়ছিল মুখে, বুকে তলপেটে। বাথটবের গায়ে আমি আস্তে আস্তে এলিয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ করে পেয়ে যাওয়া একটুকরো শান্তি স্নায়ুগুলোকে ছুটি দিয়েছে। বাথটবে জল ভর্তি হয়ে যাচ্ছিল। একটু একটু করে আমার গোটাটাই চলে যাচ্ছে জলের তলায়। কেমন যেন ঘুম ঘুম পেয়ে গেল। শরীরের সাথে আমিও যেন তলিয়ে

যাচ্ছিলাম। ...কোন্ অন্ধকারের অতলে...মৃত্যুর তলানি ঘেঁষে...।

সামনে অনন্ত অন্ধকার! খালি কালো! কালো আর কালো। জমাট বাঁধা কালো। হালকা হয়ে আসা কালো; ধূসর রঙের কালো, থেমে যাওয়া কালো, চলমান কালো। শুধু কালো আর কালো...কালো।

আমি কোথায়?

একটু আগেও তো হোটেলের বাথরুমে ছিলাম। কালো গ্র্যানাইট আর মার্বেলের কালো কখন এমন কষ্টিপাথর অন্ধকার হয়ে আমায় ঘিরে ধরল? শাওয়ারের জল কখন এমন বিস্তৃতি পেয়ে চতুর্দিক গিলে নিল? একি শাওয়ারের জল? না...না বৃষ্টি! বৃষ্টি হচ্ছে! কিন্তু কী করে!...আমি তো বাথরুমে ছিলাম...তবে? তবে কি ছাত ফেটে গেল? কোনো প্রাগৈতিহাসিক শক্তি কি ছাত ফাটিয়ে চৌচির করে দিল? আমি...আমি কোথায়?

মাথার উপরে তাকালাম। কোথায় ছাত? আমি শুয়ে আছি উন্মুক্ত আকাশের নীচে। সহস্র জলের বিন্দু বিনা বাধায় আঘাত করছে মুখে, চোখে। শোঁ শোঁ করতে করতে ঠান্ডা হাওয়া এসে লুটোপুটি খাচ্ছে ঘাড়ে, মাথায়। বিদ্যুৎ নির্লজ্জের মতো ঝলসে ঝলসে উঠে রাত্রির কালো পর্দা তুলে দিচ্ছে। আধা অন্ধকারে...আধা আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা কারা? মাথা উঁচু করে, দুর্ভেদ্য অহঙ্কারে পাহাড় প্রমাণ কলেবর নিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে আছে—ওরা কারা? আমি কোথায়?

হাতের কাছে সর্‌সর্ করে একটা কী যেন নড়ে উঠল। চমকে উঠলাম। কী এটা? সাপ? না—সাপ নয়, সাপ ঠান্ডা প্রাণী। হাতে ঠেকল পশম পশম কী একটা যেন। ছাতার কাপড়ের মতো ফ্যাৎফ্যাতে অনুভূতি। তার মাঝে সরু সরু শক্ত শক্ত। আমায় আরো চমকে দিয়ে ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল সে। ওঃ চমচিকে! ছোট্ট ছোট্ট পাখা মেলে আমার চারিদিকে একটা পাক খেয়ে লাট খেতে খেতে চলে গেল।

চামচিকে তো বুঝলাম! কিন্তু আমি কোথায়?

একটাই প্রশ্ন আংটার মতো মাথায় আটকেছিল। অচেনা জায়গায় কী করে এসে পড়লাম—এই এসে পড়ার যুক্তিহীনতাটাই অস্বস্তিতে ফেলেছে। ভয় আমি পাইনি। কারণ কৈশোর থেকে ভয় নামের বস্তুটাকে হিপ পকেটেই পুরে রেখে দিয়েছি। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে কদাকার রূপ নিয়ে আমায় ভয় দেখানোর সাহস তার আর নেই। অন্ধকারে একা একা হেঁটে চলার অভ্যাস

আমার আছে, সারাজীবন ধরে তাই-ই তো চলেছি। খাঁ খাঁ শূন্যতা গিলে নিতে চেয়েছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলেও সেই দমফাটা অন্ধকারে একাই লড়ে গিয়েছি। আলো ধরার জন্য কেউ আসেনি। সাহায্যের হাত কেউ বাড়িয়ে দেয়নি।

আজও তার ব্যতিক্রম হবে না। তাই আমাকেই উঠে দাঁড়াতে হবে। আমাকে খুঁজে নিতে হবে বেরোবার পথ, আমাকেই দেখতে হবে যে কোথায় আছি।

হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। হাতের তলায় পাথরের নিরেট মেঝে। খরখরে, পালিশ না থাকার দরুন মসৃণ। তার উপর দিয়ে জলের ধারা বয়ে চলেছে। দূরে যমদূতের মতো বিরাট কদাকার কিছু একটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভিত, নির্বাক বস্তুটা কোনো প্রাণী নয়। বরং কিছু পাথরের সমষ্টি। একটা লম্বা পাঁচিল। তা সত্ত্বেও আশ্চর্য জীবন্ত মনে হচ্ছে তাকে। যেন এখুনি হুড়মুড় করে ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে বলবে—'কোথায় ছিলে এতদিন?'

আরো একবার, হয়তো এই শেষবারের মতো বিদ্যুৎ সর্বশক্তি দিয়ে জ্বলে উঠল। তার আলোয় স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে উঁচু-নীচু পাথরের সিঁড়ি লম্বা লম্বা পাথুরে আর্চ। গরাদহীন প্রাচীন জানলার হাঁ-করা মুখগহ্বর। চিনি, চিনি...আমি এ আর্চ, এই জানলা, এই সিঁড়ি চিনি। বেশ কয়েকদিন আগেই এমন অন্ধকার রাতে এখানে আমি এসেছি। জায়গাটা আমার চেনা।

গোলকোন্ডা ফোর্ট!—কিন্তু এখানে এলাম কী করে? কে আমায় এখানে টেনে আনল? স্বপ্ন দেখছি নাকি? স্বপ্নই হবে। মনে মনে বেশ হাসি পেল। অন্ধকার আমায় স্বপ্নেও ছাড়বে না। সেখানেও সে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে চলেছে। একা, নিঃসঙ্গ দাঁড় করিয়ে মজা দেখছে। চারিদিকে অসহায়তা ছড়িয়ে দিয়ে দেখছে আমি তার বশ্যতা স্বীকার করি কি না। তার পদানত হই কি না।

মাথার উপর বিরাট আর্চ। চারপাশে ক্ষয়ে যাওয়া, চাপড়া খসা দুর্গের দেওয়াল। সামনাসামনি বেশ খানিকটা এগোতেই প্রকাণ্ড জানলা কুচকুচে কালো অট্টহাসি হাসছে। যদি চিনতে ভুল না করি তবে এটা সেই দাদমহল। বাঃ, স্বপ্নের মধ্যেও দিব্যি চিনতে পেরেছি তো! এটা সেই দাদমহলই বটে। যেখানে বসে গোলকোন্ডার অধিপতিরা বিচার করতেন। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানেই কোনো সময়ে নতজানু হয়ে বিচারের অপেক্ষায় বসে

থাকত অপরাধীরা। বিচারকের দণ্ডের কোপ কখন নেমে আসবে তারই প্রতীক্ষায় উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকত উপরের দিকে। আশেপাশে প্রহরীর সতর্ক পাহারা। কয়েদি যাতে বিচারসভা ছেড়ে পালাতে না পারে সেইজন্য উগ্র দৃষ্টি আর উদ্যত তরোয়াল নিয়ে দাঁড়িতে থাকত কোতোয়াল। বিচারকের ঠোঁট ছুঁয়ে এক-একটা শব্দ বেরোনোর সাথে সাথে আসামীর স্নায়ুতন্ত্রের এক-একটা তন্তু শক্ত হয়ে উঠত, তার সাথে সাথেই শক্ত হয়ে উঠত প্রহরীদের তরোয়াল ধরা হাতের মুঠো।

কিন্তু আমি দাদমহলে দাঁড়িয়ে আছি কেন? আমারও বিচার হবে না কি? কুতুবশাহী রাজাদের আধভাঙা, আধখাওয়া বিচারালয়ে আমার বিচার হবে ভেবেই বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। বেশ মজার ব্যাপার তো? কে বিচার করবে আমার? কাউকেই তো আশেপাশে দেখছি না। সামনের জানলায় বিচারকের আসনও তো দেখছি ফাঁকা! কোথায় গেল সব? ভয়ে পালিয়ে গেল নাকি?

—'চেঁচিয়ে উঠলাম—'কেউ আছে এখানে?'

—'কো-ই হ্যা-য়? ...হ্যা-য়...হ্যায়? ...হ্যায়...'

বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। এ আবার কোন্ ভাষা বলছি? মাতৃভাষা ভুলে গেলাম নাকি? টেন অবধি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েও সুন্দর বাংলা বলতে পারার জন্য আমার একটু অহঙ্কার ছিল। সে অহঙ্কার বুঝি আজ জলাঞ্জলি যায়!

প্রথম চমকটা কোনোমতে হজম করে দ্বিতীয়বার চেঁচিয়ে উঠলাম—'কেউ...।

—'কো-ই হ্যা-য়? ...হ্যা-য়...হ্যায়...।'

নাঃ...চেষ্টা করে লাভ নেই। এ স্বপ্নে আমার ইচ্ছেমতো কিচ্ছু হবে না। এ স্বপ্নে আমি হিন্দিই বলব। শত চেষ্টাতেও মুখ দিয়ে বাংলার 'ব'ও বেরোবে না। তাই সে চেষ্টা করে পণ্ডশ্রম না করাই ভালো।

—'হাম হ্যায়!'

কালো কালো কতগুলো ছায়া কখন যেন ঘনিয়ে এসেছে আমার চারদিকে। আগে ওদের লক্ষ্য করিনি। কালো প্রেক্ষাপটের মধ্যে আরো কালো হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলেই হয়তো চোখে পড়েনি। ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি। ওরা আমায় ঘিরে ঘুরছে। গোল হয়ে তৈরি করছে চক্রব্যূহ। মাকড়সার

জালের মতো নরম অথচ দৃঢ় সে বন্ধন। ছায়া ছায়া—আধো আলো, আধো অন্ধকার। কিছু দেখা যায়। কিছু দেখা যায় না।

কে ওরা? অর্ক? অভিজিৎ? শিবাকুমারণ? নাকি কালোচাদর-পরা লোকটা? অন্ধকারটা চোখে সয়ে এসেছে। গোলকোণ্ডার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, গগনচুম্বী বারাদরি সবই তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এত কাছে থাকা সত্ত্বেও ছায়াগুলো অস্পষ্ট। তাদের মুখে কোনো কথা নেই। শুধু অনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কষে বাঁধার জন্য ওরা ঘুরেই যাচ্ছে...ঘুরেই যাচ্ছে...ঘুরেই যাচ্ছে...।

—'ঝনাৎ।'

কিছু একটা ভাঙার শব্দ! একটা জোর ঝাঁকুনি দিয়ে ঘোরটা কেটে গেল। চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালাম। কোথায় আছি? মাথার উপর আধুনিক ছাত। তার নীচে জলের ঝাঁঝরি। মুখের উপরে, ঠোঁটের উপর প্রবল বেগে জলের মোটা মোটা ফোঁটা ঝরে ঝরে পড়ছে। ওঃ...এটা বাথরুম। আমি বাথরুমে। বাথটবে আপাদমস্তক ডুবে বসে আছি। বুক ভেঙে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। ওটা তবে স্বপ্নই ছিল। কিন্তু কীসের একটা আওয়াজ শুনলাম না? ওটাও কি স্বপ্নের মধ্যেই ছিল? না ঘর থেকে এল? প্রফেসর কি আবার ফিরে এলেন?

—'প্রফ? ...ইজ ইট ই-উ?'

কোনো উত্তর এল না।

বাথটবের ভিতরেই সটান উঠে বসলাম—'হ্যালো...প্রফ...কী ভাঙল?'

কোনো উত্তর নেই। শুধু নীরবতা। এই নীরবতার মানে আমি জানি। বুঝি। বাথরুমের বন্ধ দরজার নীচে কালো হয়ে ছড়িয়ে আছে কারো ছায়া। বাথটব থেকে উঠে পড়লাম। সারা গা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জলের স্ফটিককণা ঝরে ঝরে পড়ছে। আমি জানি একজোড়া চোখ দরজার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আমায় দেখছে। সে-সেটাও বোধহয় আমি জানি। অন্তত আন্দাজ করতে পারি।

আচমকা দরজা খুলে গেল।

—'বাইরে কেন ডিয়ার? এসো, এসো, ভেতরে এসো...।'

তিস্তা এই ব্যাপারটা আদৌ আশা করেনি। ঘটনাটার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে তারপরই হাঁচোড় পাঁচোড় করে পালানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। পালাবার

আগেই হ্যাঁচকা টানে সোজা একেবারে বাথরুমের ভিতরে।

দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

আমার বুকের উপর পাগলের মতো গুমগুম করে কিল মারতে মারতে তিস্তা বলল—'ছাড়ো...ছেড়ে দাও বলছি...রাক্ষস!'

—'কী করছিলে বাইরে? হ্যাঁ? ...বাথরুমের দরজায় চোখ রেখে কোন্ পাহাড় সমুদ্র দেখছিলে শুনি?' এতক্ষণ তিস্তা আমার নাগপাশের মধ্যে রীতিমতো যুদ্ধ করছিল। এবার যেন খানিকটা শান্ত হয়ে বলল—'যাই দেখি... তোমার স্ত্রী?'

—'আমার কিছুই না।' আমি ওর কান, গলা চেটে দিতে দিতে বললাম... 'মিছিমিছি তুমিই কষ্ট করছিলে। এর চেয়ে আমায় বললেই হত।'

তিস্তা জোরে জোরে গরম শ্বাস ফেলছিল। টের পেলাম ও গলছে। হিমবাহ যেমন গলে তেমনইভাবেই গলছে। এইবার খরস্রোতা নদীর মতো এসে ঝাপটা মারল বলে।

—'বললে কী করতে?'

—'হুম্‌ম্‌ম্‌...দরজা খুলে দিতাম, এসো।'

ওর বুকের কাপড় সরিয়ে দিয়ে পটাপট ব্লাউজের বোতাম খুলতেই সাদা শঙ্খের মতো বুকের আদল বেরিয়ে পড়ল। আজ লাল ব্রা পড়েছে। কিন্তু তাতেও ঢল সামলাতে পারছে না। ঈশ্বর মেয়েদের কী জিনিসটাই না দিয়েছিলেন! এই বুক দুটো দিয়ে ওরা সারা বিশ্বে আগুন ধরাতে পারে। হাত পড়লেই মনে হয় শালা স্বর্গে পৌঁছে গেছি। ওঃ...কী জিনিসই বানিয়েছিলে বস! থ্যাঙ্ক ইউ, ফর মেকিং দিস বিউটিফুল বুব্‌স। এই দুটো না থাকলে মেয়েদের দিকে তাকাত কে?

—'না...না...উঃ...ছেড়ে দাও...প্লিজ...পায়ে পড়ি!'

নখরা! সব মেয়েরই এক কথা! নেশা ধরিয়ে দিয়ে না-না করাটাই ওদের স্বভাব। কতক্ষণ রেসিস্ট করতে পারবে তা-ও জানা আছে। ও ওর মনে বকে যাক। আমার কাজ আমি করবই।

—'না...সম্রাট...এখন নয়। প্লিজ...তুমি বুঝতে পারছ না। আমার জামাকাপড় ভিজে যাচ্ছে। কেউ দেখলে কী বলবে?'

—'ভিজুক', আমি ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম। তিস্তা হাত পা ছুড়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে। মেয়ে একেবারে বাঘিনী। আঁচড়ে কামড়ে

একসা করে—'কী করছ? এই...না...না... আমার শাড়ি...আমার শাড়ি ভিজে যাবে...।'

—'দ্যাট্স নট মাই প্রবলেম।'

ঝপাং! জোর করে ওকে জামাকাপড়সুদ্ধ বাথটবের সাবানজলে ফেলে দিয়েছি। ভিজুক! একেবারে চুপচুপে হয়ে ভিজে যাক। বেশ হবে! বাথরুমের দরজার ফাঁক দিয়ে পরপুরুষের স্নান দেখতে লজ্জা হয় না। তার সামনে জামাকাপড় খুলতে লজ্জা হয় না আর যত লজ্জা ভেজা কাপড়ে ঘরের সামনে যেতে! আমার সাথে ফস্টিনস্টি করে বরের পাশে সতীলক্ষ্মী হয়ে বসে থাকবে! ওই মহিলার মতো আরেকটা ব্লাডি বাস্টার্ড পেটে ধরে বরের আদর খাবে। আহ্লাদ!

আদরে আদরে বিপর্যস্ত হতে হতে তিস্তা আমাকে জড়িয়ে ধরল। ওর ঠোঁটে ম্যারাথন চুমু খেতে খেতে টের পেলাম ওর হাত আমার পিঠে, বুকে খেলা করতে করতে পেঁচিয়ে ধরছে গলা। কামার্ত নারীর মতো সুস্বাদু মাংস বোধহয় আর হয় না। তিস্তা চোখ বুঁজে কাঁধে মুখ ঘষতে ঘষতে বলল—'সম্রাট...তুমি বর্বর...আমার বর্বর...!'

প্রফেসর! এই মুহূর্তে যদি এখানে তুমি থাকতে! দেখতে পেতে আমি কতটা কুৎসিত, কতটা ঘৃণ্য...কতটা...।

চুল ছোটো করে ছাঁটা। লম্বা দাড়ি ছোটো হয়ে চাপদাড়িটুকুই বাকি আছে। গায়ে সাবান পড়ে রুক্ষতা খানিকটা কম। নতুন জামাকাপড়ে প্রফেসর রুদ্রকে দেখেই চমক লাগল। লোকটার গেট-আপটাই কেমন আমূল পালটে গেছে! আগে থেকে অনেক ভদ্র লাগছে। এখন দেখলে শুধু ভয়ই নয়, তার সাথে শ্রদ্ধা এসেও মেশে।

অভিজিৎ এতক্ষণ খাটের উপরে বসে টিনটিনের কমিক্স পড়ছিল। আমায় ঢুকতে দেখে উঠে বেরিয়ে গেল। প্রফেসর মুখার্জি প্রায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

—'যাক, তুমি এসে গেছ। তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

—'এখন তো শান্তই আছেন দেখছি।'

—'হ্যাঁ...সাময়িক।'

প্রফেসর রুদ্র তার আচ্ছন্ন চোখজোড়া নিয়ে আমার দিকে তাকালেন। গা

শিরশির করে উঠল। এ চেহারা প্রফেসর রুদ্রর নয়। এ চেহারা একবিংশ শতকের কোনো মানুষের হতে পারে না। এই মানুষটার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে অতীতের গন্ধ আসে। ইতিহাস যেন ওঁর শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। নাঃ, এ লোক আজকের নয়। এ লোক কয়েক শতাব্দী ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে এক-একটা যুগের ভিতরে। বটগাছের ঝুড়ির মতো শক্ত শক্ত প্রবীণ শিরাগুলোই সে অভিজ্ঞতার সাক্ষী।

প্রফেসর কৌশিক রুদ্র। না সুলতান কুলি। সুলতান কুলি, না হতভাগ্য পিতা! সুলতান কুলির পরিচয় নিশ্চয়ই শুধু এটুকুই নয় যে তিনি জামশেদকুলি কুতুবশাহের বাবা! তার আরো একটা পরিচয়ও আছে। তিনি গোলকোন্ডার শাহেনশাহ। কুতুবশাহী মসনদের প্রতিষ্ঠাতা। অথচ এ লোকটার চোখে সে দম্ভ, সে গৌরব কই? সবসময় কীসের আতঙ্কে যেন জবুথবু হয়ে থাকেন। নয়তো প্রচণ্ড রাগে উত্তাল হয়ে ওঠেন। ওঁর চোখে শুধু দুটো রং-ই ফোটে—ভয় ও ঘৃণা। অভিজিৎকে কতটা ঘৃণা বা ভয় করেন জানি না। তবে আমায় দুটোই করেন। কারণ আমিই ওর উপর জোর বেশ ফলাই। আমার সাথে উনি পেরে ওঠেন না। তাই রাগটা বেশি।

প্রফেসর রুদ্র আমার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছেন। জানলার কাচে নাক ঠেকিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

—'প্রফেসর।'

প্রফেসর সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। অথবা কথাটা শুনতেই পেলেন না। তিনি তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে। বাইরে নারকেল গাছের মাথায় রোদটা এসে ঠিকরে পড়েছে। মসৃণ পাতা বেয়ে পিছলে পিছলে পড়ছে আলো। একমাথা নারকেল নিয়ে ঝাঁকড়াচুলো গাছটা প্রায় জানলা ঘেঁষে উঠে এসেছে। আর তার পাতায় বসে একটা কাক ঘাড় কাত করে খুব মনোযোগ দিয়ে বাসা বানাচ্ছে। প্রফেসর কাকটার মতোই ঘাড় কাত করে শিশুর মতো অবাক চোখে তাকিয়েছিলেন। নারকেলের পাতায় বসে একটা কাক বাসা বাঁধছে—এটাই যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য!

দেখতে দেখতেই তার মুখে অদ্ভুত হাসি ভেসে উঠল। হাসিটা ক্রমশ চওড়া হতে হতে একসময় প্রায় বাচ্চা ছেলের মতোই দুলে দুলে খট্‌খট্‌ করে হেসে উঠলেন। আমাদের দিকে ইশারা করে যেন বলতে চাইছেন—'দ্যাখো... দ্যাখো...উজবুকটা বাসা বানাচ্ছে।' অস্ফুট স্বরে একটা শব্দই বারবার তার মুখ

দিয়ে বেরোচ্ছে—'কৌ...কৌ...কৌয়া...কৌয়া।'

—'প্রফেসর মুখার্জি!'

—'দেখেছি', প্রফেসর মুখার্জি নির্লিপ্তমুখে বললেন—'এত হাসি হচ্ছে কেন বুঝতে পেরেছ?'

—'না প্রফ। কী ব্যাপার বলুন তো!'

—'এতক্ষণে একটা চেনা জীব পেয়েছেন। আমাদের কাউকে তো আর চিনতে পারছে না। ষোড়শ শতকে যে লোকটা পড়ে আছে তার কাছে আমরা তো মঙ্গলগ্রহের প্রাণী। কিন্তু কাক তো আর পালটায়নি। ষোড়শ শতকেও কুচকুচে কালো ছিল এখনো তাই আছে। তখনো কা কা করে ডাকত। এখনো তাই ডাকে।'

—'তাই! বুঝলেন কী করে?'

প্রফেসর হাসলেন—'বুঝতে গেলে একটা সহৃদয় মন ছাড়া আর কিছুই লাগে না সম্রাট। তুমিও পারবে। এই ধরো না, তোমার বিষয়েও অনেককিছুই আমি বুঝতে পারি। তোমার মদ খাওয়ার বিষয়ে, তোমার ফ্যামিলির বিষয়ে, তোমার উলটোপালটা প্রলাপের বিষয়ে।'

নিজেকে এতটা অপ্রস্তুত আগে কখনো মনে হয়নি। লোকটার অসম্ভব বুদ্ধি। চোখ দুটো যেন মার্বেলের গুলি! মাতাল হয়ে ওর সামনে কী বকেছি কে জানে! উনি কিছু জানেন নিশ্চয়ই। কিন্তু কি জানেন? কতদূর জানেন?

—'কী বুঝেছেন?'

—'যেমন ধরো, সারাদিনে তোমার যা অ্যাকটিভিটি এবং রুটিন তার মধ্যে মদ জিনিসটা বিশেষ থাকে না। সিগ্রেটও তুলনায় কম-ই খাও। কিন্তু সন্ধের পর থেকেই ওটা রুটিনে ঢুকে পড়ে। আর রাত হওয়ার সাথে সাথেই মাত্রাটা বাড়তে থাকে। অ্যাশট্রেটাও উপচে পড়ে। তার উপর লক্ষ করে দেখেছি তুমি মদটা শৌখিন মাতালদের মতো খাও না। যতক্ষণ তোমার সেন্স থাকে ততক্ষণ যেন জেদ করে খেয়ে যাও। এর থেকে একটা বিষয়ে স্পষ্ট।'

—'কী?'

প্রফেসর আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন। কটা চোখ দুটোয় অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য! এমন চোখই পারে হৃদয়ের জটিল ঘোরপ্যাঁচ কেটে সরল সত্যটাকে বের করে আনতে। চুম্বকের মতো তার আকর্ষণী শক্তি! রহস্যভেদী আলো।

—'তোমার রাতে অ্যালার্জি আছে। রাত আর কালোচাদরের মধ্যে কিছু

একটা যোগ আছে সেটাও বুঝেছি। কানেকশনটা কী সেটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু এইটুকু বুঝতে পেরেছি, বন্দনাকে যে তৃতীয় ভয়ের কথাটা সেদিন তুমি চেপে গিয়েছিলে সেটা নাথিং বাট দ্য নাইট।' তিনি একটু হেসে বললেন—'রাতকে তুমি ভয় পাও। কেন সম্রাট? হোয়াই?'

প্রফেসর রুদ্রর বোধহয় কাক সম্পর্কে কৌতূহল নিবৃত্ত হয়েছে। তিনিও বুঝতে পেরেছেন যে তার সামনেই দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনো রহস্যপূর্ণ কথাবার্তা চলছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। দড়ি বাঁধা দুটো হাত দিয়ে আমায় স্পর্শ করতে চাইছেন। মৃতের মতো কঙ্কালসার তার হাত। সে হাতে উষ্ণতা নেই, আছে শুধু শীতলতা।

আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি একটা পাতকুয়োর উপরে। একটু পেছোলেই পড়ে যাব। অথচ এগোনোর উপায়ও নেই। সামনে অনেকগুলো জিজ্ঞাসা-চিহ্ন উদ্যত ফণা তুলে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। এগোলেই...

—'আপনার বুঝতে ভুল হয়েছে প্রফ।'

প্রফেসর রুদ্র আমার মুখ স্পর্শ করেছেন। সারা গা ছ্যাঁৎ করে উঠল। অস্বস্তিটা ক্রমশই বাড়ছে। তা সত্ত্বেও জোর করে বললাম—'আমি কাউকে ভয় পাই না।'

কঙ্কালসার আঙুলগুলো সারা মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কপাল থেকে গাল বেয়ে একবার নাকে দাঁড়াল। তারপর জামার কলারে। প্রফেসর রুদ্র এবার জামার সোনালি বোতামগুলো নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। পাকা জহুরির মতো বোতামটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন।

—'তাই?' বিদ্যুৎ চ্যাটার্জি হাসছেন—'তবে একটা জিনিস অন্তত ভুল বুঝিনি।'

—'কী?' ঘাড়ের শিরা টানটান হয়ে উঠল।

—'তুমি তোমার বাবাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো। আউট হয়ে গেলে সবচেয়ে বেশি বাবাকেই ডাকাডাকি করো। রাইট?'

—'ওঃ', হাসলাম—'রাইট, তবে টেন্‌সে ভুল, ভালোবাসতাম।'

—'তিনি কি...।'

—'মারা গেছেন।'

—'ওঃ...আই অ্যাম সরি।'

—'ইটস ওকে।'

—'ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড। কী হয়েছিল ওঁর?'

—'সেরিব্রাল।'

প্রফেসর মুখার্জি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—'তোমার বাড়িতে আর কে কে আছেন?'

এই তো! কনফিউজিং প্রশ্ন! আমি নিজেও ঠিকঠাক জানি না যে আমার বাড়িতে কে কে থাকেন! আমি নিজে প্রায়ই থাকি না শুধু এইটুকুই বলতে পারি।

—'আমি আছি, মা আছেন।'

—'আর? আর কেউ?'

—'নাঃ।'

—'তোমার নেশা সম্পর্কে তোমার মা কিছু বলেন না? বারণ করেন না?'

—'মনে মনে দুঃখ পেলেও পেতে পারেন। প্রকাশ করেননি কখনো।'

—'তার মানে তোমার মা-ও তোমারই মতো। বুক ফাটলেও মুখ ফোটে না।'

তাই কি? হয়তো তাই। ভেবে দেখিনি কখনো।

—'হবে।'

প্রফেসর মুখার্জি যেন মজা পেয়েছেন—'আচ্ছা সম্রাট, তুমি কার মতো? বাবার মতো না মা...?'

—'কী বিষয়ে?'

—'চেহারা, স্বভাব, অভ্যাস।'

—'আমার বাবা আপনার মতোই ছোটোখাটো চেহারার মানুষ। মদ, সিগ্রেট জীবনে স্পর্শ করেননি। সারাজীবনে কাউকে কটু কথা বলেননি। তার স্বভাব আমার ঠিক উলটো। প্রশান্ত, কোমল, নরম। হি ওয়াজ ফুল অফ লাভ।'

—'আর তুমি ফুল অফ হেট্রেড?'

—'হবে।'

—'আর মা?'

কথা বলতে ভালো লাগছিল না। প্রথমত, এই বিষয়ে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কাছে মুখ খুলতে চাই না। দ্বিতীয়ত, হ্যাংওভারের দরুন মাথা টিপটিপ করছে। তৃতীয়ত, প্রফেসর রুদ্র বোতাম দেখার আগ্রহে প্রায় আমার ঘাড়ে চেপে

বসেছেন। কথা না বলার এই তিনটে যুতসই কারণ থাকা সত্ত্বেও বললাম—'তিনি একসময় ডাকসাইটে সুন্দরী ছিলেন। এখনো রূপবতী বলা যায়।'

—'তার মানে তুমি তাঁরই রূপ পেয়েছ?'

—'জানি না।'

—'লোকে কী বলে?'

—'লোকের সাথে কথা বলে দেখিনি।'

—'আর তোমার গার্লফ্রেন্ডরা?'

—'কারা?'

—'গার্লফ্রেন্ড? তোমার গার্লফ্রেন্ড নেই একথাটা অন্তত বিশ্বাস করতে বোলো না।'

—'নাঃ...নেই। মেয়েদের বন্ধুত্ব আমার প্রয়োজন হয় না। গার্লফ্রেন্ড নেই। যারা আছে তারা আমার বেড পার্টনার।'

—'তারা তোমার সম্পর্কে কী বলে?'

—'সেটা তারাই বলতে পারবে।'

—'তাদের মধ্যে কাউকে ভালো লাগেনি?'

—'প্রয়োজনের সময় সবাইকে ভালো লাগে। নয়তো কাউকেই নয়।'

—'এরকম কজন আছে?'

—'গুনিনি। সবাইকেই মনে রাখা সম্ভবও নয়।'

—'তবু। বিশেষ কেউ...।'

—'এগুলো আমার পার্সোনাল ম্যাটার প্রফ।' আমি প্রসঙ্গটা বন্ধ করার জন্য জোর দিয়ে বলি—'ওসব থাক।'

গলাটা শুকিয়ে আসছিল। একটা সিগ্রেট ধরাতেই আরাম পেলাম। লোকে যে কী করে শুধু ধোঁয়া ছাড়া শান্তি পায় বুঝি না। আমি ধোঁয়া গিলতে ভালোবাসি। তামাকের কড়া আমেজটা গলায় এসে ধাক্কা মারলে তবেই সুখ।

নাক দিয়ে ধোঁয়ার রাশ বের করে দিয়ে বললাম—'আমার কথা থাক প্রফ। আপনার কথা বলুন। আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?'

—'আমি?' প্রফেসর মিটিমিটি হাসছেন—'সেটাও তো আমার পার্সোনাল ম্যাটার।'

—'অ্যাজ ইউ উইশ।'

—'তা সত্ত্বেও আমি বলব। আমার বাড়িতে আমি একাই থাকি। আরো

একজন অবশ্য থাকেন। আমার কাজের মাসি।'

—'কাজের মাসি! ই-য়া-ং প্রফ?'

প্রফেসর আবার ঝরঝর করে হেসে ফেললেন—'না...তুমি যা ভাবছ তা নয়। তার বয়েস বর্তমানে ষাট ছাড়িয়ে গেছে। উনি আমার দিদির মতো। ছোটোভাইয়ের মতোই আমাকে স্নেহ করেন। প্রয়োজন হলে বকাও দেন।'

যা ক্বাবা! তা হলে এমন মেড রাখার মানে কী? মেডরা তো থাকেই ব্যবহৃত হওয়ার জন্য। শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে ওরাই বরং বেশি সুবিধাজনক। ইজি অ্যাভেইলেবল—ইউজ অ্যান্ড থ্রো।

—'আর কেউ?'

—'নাঃ, আর কেউ নয়। বিয়ে থা তো করিনি। একা মানুষ। বিয়ে করলে কেউ থাকত। সে বালাই যখন নেই তখন একা থাকা ছাড়া উপায় কী?'

প্রফেসর রুদ্র আমার বোতামগুলোর সাথে তার নতুন জামাটার বোতাম মিলিয়ে দেখছে। নিজের জামাটা তার বিশেষ পছন্দ হচ্ছে না। তাই মাঝেমধ্যেই আমার জামাটা ধরে টানাটানি করছেন। তাঁকে ছোটো ছোটো ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে দিতে বললাম—'তা এখন দোকা হলেই পারেন।'

—'হ্যাঁ...ওটাই বাকি আছে। বুড়ো বয়সে ভীমরতি', প্রফেসর হাসতে হাসতেই উঠে দাঁড়ালেন।

—'মহাদেব বুড়ো বয়েসে বিয়ে করে ফাঁপরে পড়েছিলেন জানো তো! সারাজীবন বউয়ের পায়ের তলায় বুক দিয়ে শুয়ে থাকতে হয়েছিল বেচারাকে। আমি আর সে ঝুঁকি নিইনি।' মৃদু হাসলাম। এর বেশি আর কোনো এক্সপ্লানেশন শোনার অধিকার বা ইচ্ছে কোনোটাই আমার নেই।

—'শোনো, আমি একটু ওদিকটা দেখে আসি। তিস্তার খবর অনেকক্ষণ নেওয়া হয়নি। একটু ওর সাথে দেখা করে আসছি। ততক্ষণ তুমি প্রফেসরের খেয়াল রেখো।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়লাম।

বুড়ো বয়সে ভীমরতি! চুল পাকার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিটাও পাকে—এমনই সাধারণের ধারণা! কিন্তু শরীরের ক্ষয় হওয়ার সাথে সাথে মস্তিষ্কের ধূসর বস্তুও যে ফ্যাকাশে হয়ে যেতে থাকে তার নিদর্শন অনেকেই আছেন। তার মধ্যে আমার বাবাই বোধহয় প্রধানতম। লোকটার রূপ ছিল না, গুণ ছিল না—থাকার মধ্যে ছিল খুব স্নেহময় একটা মন, আর অঢেল পয়সা।

বিজনেসম্যান আর বাবা হিসেবে তিনি সফল ছিলেন। আর সব দিক দিয়েই ব্যর্থ। প্রেমিক হিসাবে ব্যর্থ, তরুণী ভার্যার বৃদ্ধ স্বামী হিসাবে ব্যর্থ, পুরুষ হিসাবে ব্যর্থ, এমনকি বর্বর হিসাবেও ব্যর্থ।

প্রফেসর রুদ্রর পিছনের জানলায় একফালি আকাশ ধরা পড়েছিল। সিগ্রেটের ধোঁয়া আমার ঠোঁট ছুঁয়ে সেদিকেই উড়ে যাচ্ছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে প্যাঁচ কষতে কষতে হাওয়ার সাথে মিশে যাচ্ছে।

বুড়ো উজবুক। বুড়ো বয়েসে সুন্দরী মেয়ে দেখে টপকে গেলে। আর সেই ভুলের মাশুল গুনতে হচ্ছে আমায়। যদি সেদিন আবেগে না পড়ে গরিবের সুন্দরী মেয়ের হরিণ চোখ থেকে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের লোভটা সরিয়ে রাখতে পারতে তা হলে আজ আমি কত ভালো থাকতে পারতাম। তুমি তো দিব্যি পটল তুলে নন্দনকাননে বসে জ্ঞানের কমলালেবু খাচ্ছ। আর আমার জন্য বরাদ্দ নিবিদ্ধ আপেল! যদি সেদিন ওই চরম ভুলটা না করতে তা হলে হয়তো রাতবিরেতে ওই কালোচাদর আমায় বিরক্ত করত না। আমি একটু ভালো থাকতাম...সুস্থ জীবনযাপন করতাম।...

প্রফেসর রুদ্র এতক্ষণ আমার জামার বোতামটার দিকে তাকিয়েছিলেন। আচমকা তার কপালে বলিরেখাগুলো আরো একটু স্পষ্ট হল। অ্যাডাম্‌স অ্যাপলটা কেঁপে উঠল। গালের পেশি নড়ে নড়ে উঠছে। শরীরটা যেন ঝড়ের উদ্দাম হাওয়ার বিপরীতে লড়াই করতে করতে হেরে যাচ্ছে।

—'জামশেদ...জামশেদ...জামশেদ...।'

বুঝলাম আবার সেই এক প্রসঙ্গ শুরু হবে। যে প্রসঙ্গটাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পাই। সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি। কাউকে বলতে পারি না। কাউকে বলতে নেই। কিন্তু যখন বুড়ো লোকটা ওই কথাগুলো বলে তখন মনে হয় গলা টিপে ওকে খুন করি। অসহ্য! অসহ্য ওর ওই শব্দগুলো! আমি প্রকাশ করি না—কিন্তু আমার মধ্যে তখন একটা দানব জেগে উঠে দাঁতে দাঁত পিষতে থাকে। হাতের কাছে পেলে যেন লোকটার ঘাড়ই মটকে দেবে।

—'জামশেদ...জামশেদ...বেটা।'

কান্নাটা এতক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চলছিল। এবার হেঁচকি তুলতে তুলতে আরো জোরদার হয়ে উঠেছে। আমি শিরদাঁড়া টানটান করে বসে আছি পরের শব্দগুলোর অপেক্ষায়।

—'জামশেদ...বেটা...জামশেদ।'

হাউ হাউ করে কেঁদে চলেছেন প্রফেসর রুদ্র। থরথর করে কাঁপছেন। ছোটো ছোটো হিক্কা উঠছে। চোখের জল, নাকের কফ, মুখের লালা সব মিলেমিশে এক হয়ে পড়ছে তার জড়ো করা হাতের পাতায়। সেখান থেকে মেঝেতে।

—'জামশেদ..বেটা...তোর বুড়া আব্বার সাথে এমন বেইমানি করলি বেটা! জামশেদ...তুই আমার ঔলাদ...তোর বাপ ...টা...। তাকে জঞ্জীরে জকর-কর অ্যায়সে ফেলে রেখেছিস! তুই এমন বেটা রে! আমি তোর আব্বা...।'

তাতে কী! বাপ হয়েছ তো কি মাথা কিনে নিয়েছ! জন্ম দিয়ে কোন্ উপকারটা করেছ আমার! এমনি এমনি তো টেনে আনোনি। সন্তান ভোগের ফসল! পিট্যুইটারিকে শান্তি দেওয়ার জন্য এক নারীর সাথে মিলিত হওয়ার আনন্দের ফল! তাতে তোমার কপালে হয়তো সুখ জুটেছিল! কিন্তু আমি কী পেয়েছি? জন্মের সাথে সাথেই কপালে তিনটে রেখা পড়ে গেছে। দুর্ভাগ্যের, হিংসার আর যৌনতার রেখা। সেই রেখা তিনটের ভার বইতে বইতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে—এরপরও কী আশা করো আমার কাছে!

—'তোকে বচপন থেকে ইতনা বড়া করে তুললাম—তার এই সিলা দিলি! তোর কোন্ শওখ আমি পুরা করিনি! যখন যা মেঙ্গেছিস—দিয়েছি। নিজের আরাম ছোড় কর তোর শওখ মিটিয়েছি। তার এই সবক...বেটা, জামশেদ...।

—'করেছ! অনেক কিছুই করেছ! কিন্তু সবাই তো তা-ই করে। তার চেয়ে বেশি কী করেছ? যেটুকু করেছ তা কি শুধু আমার জন্য! নাঃ। তোমার স্বার্থও ছিল। যে সন্তানকে আজ হাতে ধরে হাঁটতে শেখাচ্ছ সে-ই আগামী দিনে তোমায় ঘাড়ে করে বৈতরণী পার করবে—সেটাই কি তোমার চিন্তা ছিল না? যার কচি হাতে তারাবাতি, রংমশাল ধরিয়ে দিচ্ছ, সেই তোমার বৃদ্ধ বয়সের জীবন আলো করবে, আজ যাকে দামি সাইকেল কিনে দেবে সে-ই তোমার কালকের হুইলচেয়ার—এই তো ছকে বাঁধা ক্যালকুলেশন। গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি। এর বাইরে গেলেই তোমার স্বার্থে ঘা লাগে। তাই বলো বিশ্বাসঘাতক। তাই বলো বেইমান! স্বার্থপর—তোমরা সবাই স্বার্থপর!'

—'যব তু ছোটা ছিলি...তোকে বুকে আগালতাম...আজ হাট্টাকাট্টা জওয়ান হয়েছিস...বড়া হয়েছিস...তাই বাপকে লাথ মারছিস..দৌলতের জন্য।'

—লাথি মেরেছি! পারলে তোমায় আমি খুন করি! বুড়ো বজ্জাত! বাপ

হয়েছ বলে সারাজীবনের দাসখৎ লিখে দিতে হবে না কি! অনেকদিন তোমার কথায় ওঠবস করেছি। ছেলেকে বুড়ো আঙুল ধরিয়ে দিয়ে এত বড়ো প্রপার্টির একেশ্বর হয়ে বসে রয়েছ। চুপ করে মাথা নীচু করে থেকেছি—টুঁ শব্দটিও করিনি। আমায় সাইডে রেখে দুনিয়ার সব ঐশ্বর্য নিজে ভোগ করেছ! বুড়ো হয়ে মরার সময় হল, তবু গদি ছাড়তে চাইছ না—আমার ভোগের পথে উন্নতির পথে কাঁটা হয়ে বসে আছ। ঘাটের মড়া—আর কত সহ্য করব? তুমি তোমার স্বার্থ দেখবে, আর আমি দেখব না? আজীবন তোমার মঙ্গলের হাঁড়িকাঠে আমায় মাথা দিয়ে থাকতে হবে! মামদোবাজি!

—'জামশেদ!...জামশেদ! ...তোর কলিজায় কি রহম নেই! প্যায়ার নেই বেটা!...হা-রে! এমন বেটা আমি পয়দা করেছিলাম! আমার ঔলাদ আমার পিছে তলওয়ার নিয়ে আসছে! এ কার পাপে হল খুদা! ইয়া খুদা!'...

পাপ! পাপ তো আমার রক্তে! তুমি নিজেই আমার রক্তে বিষ মিশিয়েছ। তোমারই বিষাক্ত রক্ত আমার শিরায় বইছে, ভুলে গেলে! নিজে কোনোদিন ভালোবাসা, মমতা, বিশ্বাস এই শব্দগুলোর মূল্যই বোঝনি। বিশ্বাসঘাতকতার বীজ তোমার রক্তে। উত্তরাধিকার সূত্রে আমিও তাই পেয়েছি। তোমায় যারা বিশ্বাস করেছে, তাদের পেছনে ছুরি মেরেছ। আমিও তাই করেছি। বাপ কা বেটা, সিপাহি কা ঘোড়া—কুছ নেহি তো থোড়া থোড়া। অন্যায় কী করেছি?

—'জামশেদ...বেইমান...জামশেদ...'

ওঃ, আর সহ্য হচ্ছে না। এইবার ওকে থামানো দরকার। মস্তিষ্কের উষ্ণতা হু হু করে ক্রমশই বাড়ছে। এরপর যাচ্ছেতাই কিছু একটা করে বসব। খুনও করে ফেলতে পারি। তার আগেই এই অসহ্য প্রসঙ্গের উপর জল ঢালা দরকার।

—'জামশেদ...জামশেদ...।'

—'চোপ।'

—'জামশেদ...।'

দাঁতে দাঁত চেপে বললাম—'চোপ বুড্ঢা...।'

প্রফেসর রুদ্র জলভরা বড়ো বড়ো চোখ নিয়ে অগাধ বিস্ময়ে তাকালেন। তার বিলাপ বন্ধ হয়ে গেল। এখন নাক টানতে টানতে ফোঁপাচ্ছেন, আর অবাক হয়ে আমায় দেখছেন।

—'আমি মাংস খাব না। আমার জন্য একটা ভেজ বলে দে।'

দুপুরে খাওয়ার টেবিলে বসে কাঁচুমাচু মুখে জানাল অভিজিৎ। চিরকালই সে খাওয়ার টেবিলে লেটলতিফ। কেন তা বলতে পারব না। প্রফেসর রুদ্রর পিছনে তাকে কোনো কসরৎ করতে হয় না। অর্ক বা দাসবাবুর মতো সংসারীও নয় যে বউ-বাচ্চাকে সামলাতে সামলাতেই সময় কেটে যাবে। তা সত্ত্বেও খাবার টেবিলে সে সবার পরেই এল।

—'সে কী!' অর্ক অবাক হয়ে বলল—'তোর আবার মাংসে কবে অরুচি হল? কালকেও তো খেলি!'

—'খেয়েছিলাম', তার মুখ চুপসে গেছে—'আজ খাব না। প্রবলেম আছে।'

—'কেন? হলুদ বিপ্লব?'

—'ঠিক তার উলটোটা।' সে বলল—'আমার হাগু এঁটে গেছে।'

—'সে কী রে!' তিস্তা খিলখিল করে হেসে উঠেছে—'কী করে হল?'

—'হবে আবার কী করে? মানুষের কনস্টিপেশন কেন হয়?' একেই ডাবল ডোজে বিরিয়ানি, মাটন চাপের মতো তেলেঝোলে রীচ জিনিস খেয়ে যাচ্ছি। তার উপর রাত্রে ঠিকমতো ঘুম হচ্ছে না।'

—'কেন?'

—'আ-রে, আমাদের খাটগুলো দেখেছিস? পুরোটাই গোল। কোন্‌দিকে মাথা দেব আর কোন্‌দিকে পা বুঝেই উঠতে পারি না। মধ্যরাত অবধি ভাবনাচিন্তা করে শেষপর্যন্ত টস করে কনফিউশন ভাগাতে হয়। তার উপর ওই বুড়োটা সারারাত জ্বালিয়ে খাচ্ছে। ঘুমের মধ্যেও বড়বড় করে বকে যায়। 'জামশেদে'র চোটে ঘুম চৌপাট। পেটের মাল এমন জামের আঁটি হয়ে গেছে যে মাল বের করতেই পাছুলি বেচারার 'স্বেদ' ছুটে যাচ্ছে।'

তিস্তা হাসতে হাসতেই অর্কর গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ল। অর্ক যেন একটু অপ্রস্তুত। আলগোছে বউয়ের পিঠের উপর হাত রেখে সে-ও হাসল। গালের পেশি প্রসারিত। যথারীতি সামনের দাঁত দুটো ঠোঁটের নীচ দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে। চোখ দুটো প্রায় বুজেই গেছে! কিন্তু কী যেন একটা হয়নি। কী হয়নি তা জানি না।

প্রফেসর মুখার্জি হাসতে হাসতেই ন্যাপকিনটা কোলের উপর টেনে নিলেন। কনকনে ঠান্ডা জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে বললেন—'যদি বিশেষ

অসুবিধা হয়ে থাকে অভিজিৎ, তা হলে একটা "ডালকোলাক্স" বা কয়েক চামচ "ক্রিমাফিন"ও খেয়ে নিতে পারো। ওষুধের বাক্সটা আমার কাছেই আছে। চেয়ে নিয়ো।'

—'আর তাতেও যদি না হয়...।' দাসবাবু পছন্দের সাবজেক্ট পেয়ে গেছেন। প্রফেসর মুখার্জিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—'তা হলে গ্লিসারিন সাবোজিটার দিতে হবে। চিন্তা কোরো না। আমার কাছে আছে। টুনির মায়ের তো আবার পাইল্‌স...।'

কথাটা বলতে বলতেই টুনির মায়ের জ্বলন্ত দৃষ্টির ছ্যাঁকা খেয়ে থেমে গেলেন তিনি। মুখের কথাটা গপ করে গিলে ফেলে মিনমিন করে মেয়েকে বললেন—

—'টুনি, জল খেয়েছ?'

টুনি মাথা নাড়ল। অন্যান্য দিনের তুলনায় সে আজ একটু বেশিই চুপচাপ। পীতাভ মোড়কে মুখ ঢেকে বসে আছে। বিষণ্ণ ছোট্ট পরির মতো।

কোনোদিন এই ছোট্ট মানুষটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখিনি। প্রায় গোড়ালির বয়সি মেয়েটাকে দেখতে কেমন—এ কৌতূহল মনেও আসেনি। আজ হঠাৎই কেমন করে যেন চোখে পড়ে গেল। তিস্তার পাশেই হাত গুটিয়ে বসে আছে। ঝকঝকে পরিপাটি চপল ঝরনার পাশে বরফে জমে যাওয়া স্তব্ধগম্ভীর ছোট্ট ঝোরা। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। মুখের চামড়া রুক্ষ। ঠোঁটদুটো ফেটে গেছে। মাঝেমধ্যেই জিভ দিয়ে ফেটে যাওয়া টক-নোনতা অংশ চেটে চেটে নিচ্ছে।

বন্দনা মাথা নীচু করে কী যেন ভাবছিল। এবার মুখ তুলে তাকাতেই সোজাসুজি চোখে চোখ পড়েছে। অস্বস্তিতে পড়ে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। ওই সামান্য একটু চাউনির অনেক ভুল অর্থ হতে পারে। এমনিতেই যথেষ্ট ছড়িয়েছি। আর নয়। ও আমার কাছে কিছু আশা করুক তা চাই না।

—'আমি বলি কী...।' অর্ক ওদিকে অভিজিৎকে নিয়ে পড়েছে—'অর্ডারটা তো দেওয়াই হয়ে গেছে। আবার নতুন করে দিতে গেলে প্রবলেম হবে। তোকে অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হবে। তার চেয়ে আজকে খেয়ে নে। রাতে শোওয়ার আগে বেশি করে ওষুধ খেয়ে নিস। কাল থেকে আলাদা করে অর্ডার দেব।'

—'ও-কে, মাংসটা কীসের? চিকেন?'

অর্ক ভয়ে ভয়ে বলল—'মাটন।'

—'মাটন! অভিজিৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে—'রেডমিট! কাল ফেটে যাব মাইরি! সিম্পলি মরে যাব! মাটন কেন দিলি! ওঃ গড!'

অভিজিতের ডাকাডাকিতে গড এলেন না। ট্রে হাতে বয় এল।

গলার কাছটায় একটা জমাট ব্যথা। ঠান্ডা লেগেছে বোধহয়। খাবার গিলতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছে। পাঁঠার মাংস আমার অন্যতম ফেভারিট ডিশ। ঝালঝাল মাটন কষা দেখলেই জিভে জল চলে আসে। কিন্তু আজ তা-ও ভালো লাগছিল না। ঢোঁক গিলতেই কটকট করে ব্যথা লাগছে।

তবু আস্তে আস্তে চিবিয়ে যতটা সম্ভব খেলাম। সকালের বমিবমি ভাবটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। মাঝেমধ্যে তো ভয়ই হচ্ছিল যে প্রফেসরের গায়েই আবার সব উগরে না দিই! মাংসের ঝোলের উগ্র পেঁয়াজ, রসুনের গন্ধে গা গোলাচ্ছে। তবু জোর করে যতটা পারি খেয়ে নিলাম।

—'সম্রাট, তুমি খাচ্ছ না।' প্রফেসর বললেন—'সবই তো পড়ে রইল! কী ব্যাপার? ভালো লাগছে না? অন্যকিছু দিতে বলব?'

—'না...না...ঠিক আছে।'

—'একটু স্যালাড নেবে?'

—'নো...নো...ইট্‌স ওকে প্রফ।'

প্রফেসর কি আমায় খোকা পেয়েছেন যে ঝালের চোটে খেতে পারব না! জোরে হেসে উঠতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই চিড়িক করে একটা ব্যথা। বমিটা হড়াৎ করে একেবারে গলায়।

—'এক্সকিউজ মি...।' ন্যাপকিনটা মুখে চেপে ধরে টেবিল ছেড়ে টয়লেটের দিকে দৌড়েছি। সবার সামনে করে ফেললে কেলেঙ্কারি হবে। ওরা দিব্যি তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। ওদের তৃপ্তির খাওয়া কেন নষ্ট করি।

—'বাটি...সম্রাট!'

নাভির মাঝখান দিয়ে প্রচণ্ড একটা চাপ এসে ধাক্কা মারছিল গলায়। বাথরুমের দরজা খুলতেই ফিনাইলের ঝাঁঝালো বাষ্প। বেসিনের উপর উলটে পড়তেই হড়হড় করে সব বেরিয়ে গেল। এক ঝাঁক ফেনা ফেনা তেতো জল। পেটের চাপটা গলা দিয়ে নেমে যাচ্ছে। হালকা হয়ে যাচ্ছে।

বমি হয়ে যাওয়ার পরে আস্তে আস্তে ওখানেই বসে পড়েছি। হাত পা কাঁপছে। মাথা ঝিমঝিম করছিল। কান, মাথা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে গরম

হলকা। ভিতরে ভিতরে ঘামছিলাম। বমিটা হয়ে যেতে খানিকটা শান্তি পেলাম। পেটের মোচড়টাও নেই। অনেকটাই হালকা লাগছে। বোধহয় পাকস্থলীতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। একদম ফাঁকা।

চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলাম। বাইরে উদ্বিগ্ন মুখে প্রফেসর মুখার্জি দাঁড়িয়েছিলেন। ছিল অর্কও। ওরা খাওয়া ছেড়ে উঠে এসেছে।

—'কী হয়েছে তোর?' অর্ক এগিয়ে এসে বলল—'হঠাৎ খাওয়ার টেবিল ছেড়ে টয়লেটের দিকে দৌড়লি?'

—'আমি ঠিক আছি।' মুখে রুমালটাও আরো একবার বুলিয়ে নিয়ছি—'তোরা আবার উঠে আসতে গেলি কেন? আমি তো যাচ্ছিলাম।'

—'তোর মুখ চোখ কিন্তু মোটেই ঠিক লাগছে না। তুই সত্যিই ঠিক আছিস তো সম?'

—'ইয়েস বস।'

—'কী জানি...? অর্ক দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল—'তোর যা স্বভাব। কিছু চেপে যাচ্ছিস না তো!'

—'আরে না'। আমি ওর কাঁধে হাত রাখি—'কাল রাতে প্রচুর মাল টেনেছি। তারই সাইড এফেক্ট হচ্ছে। এমন হয়েই থাকে। ভাবিস না।'

—'হ্যাঃ, অমন হয়েই থাকে অর্ক। ভেবো না। আজ রাতে আরো টানলে ঠিক হয়ে যাবে।'

এটা নেহাতই প্রফেসরের রাগের কথা। মুখে যাই বলুন না কেন ভিতরে ভিতরে যে দুশ্চিন্তা করে চলেছেন তা একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝবে। থমথমে মুখে গটগট করে আবার খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসে পড়লেন। তার রাগ দেখে মনে মনে একটা তীব্র আয়রনি অনুভব না করে পারলাম না। কেন যে রাগ করেন এই ভদ্রলোক? ওর রাগে আমার কী যায় আসে! যারা সম্পর্কে আমার কেউ কেউ হয়ে থাকেন তাদের রাগ অভিমানের পরোয়াই কোনোদিন করলাম না, তো উনি কোথাকার কে?

ধীরেসুস্থে চেয়ারে জমিয়ে বসে সিগ্রেট ধরালাম। যা খেয়েছিলাম তার সবটাই বেরিয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার খেতে ইচ্ছেও করছে না। তার চেয়ে আমার ধোঁয়াই ভালো।

—'কী হয়েছিল সম্রাট?' দাসবাবু খাওয়া শেষ করে প্লেটটা একপাশে

সরিয়ে বললেন—

—'হঠাৎ উঠে গেলে?'

—'তোর আবার লুজ মোশন হল না তো?'

অর্কও সত্যি। সবাইকেই বোধহয় ও নিজের মতো ভাবে। তিস্তা মাথা নীচু করে বাছিল। অর্কর কথা শুনে মুখ তুলে তাকিয়েছে—'উফ্‌ফ্‌, তোমাদের কি এই টপিক ছাড়া আর কোনো কথা নেই? তখন থেকে খালি এই চর্চাই চলছে। শান্তিতে খেতেও পারছি না।'

—'সত্যিই তো!' প্রফেসর মুখার্জি হাসছেন—'তোমাদের নাহয় ঘেন্না পিত্তি নেই। তাই বলে ওদেরও থাকবে না একথা ভাবাই অন্যায়। তার চেয়ে প্রসঙ্গটাই পালটাও বাপু।'

—'আচ্ছা সম্রাট', মিসেস দাস অনেকদিন ধরেই বোধহয় প্রশ্নটা করতে চাইছিলেন। আজ সুযোগ পেয়ে বললেন—'তুমি কী করো?'

বমি করে ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। চোখ বড়ো বড়ো করে, ভুরু কুঁচকে মাথার ঝিমঝিমে ভাবটা কাটাতে চাইছিলাম। প্রশ্ন শুনে বেমালুম ব্যোম্‌কে গেলাম। সারাজীবনে এই প্রশ্নটা আমায় কখনো শুনতে হয়নি। তাই কিছুক্ষণের জন্য উত্তর দেওয়ার ক্ষমতাই হারিয়ে ফেললাম।

—'না...মানে। অর্ক আর অভিজিৎ তো বড়ো বড়ো চাকরি করে বলে জানি। তুমি চাকরি করো না। তবে তুমি কী করো?'

—'আমি বিজনেস করি।'

—'বিজনেস তো করো জানি। কিন্তু কী করো?'

এমন প্রশ্ন কেউ কখনো শুনেছে! বললাম 'বিজনেস করি'—তারপর ও জানতে চাইছেন কী করি! ভদ্রমহিলা কি মাথামোটা! না অতিচালাক। কী উত্তর দেব এর! অসহায়ের মতো প্রফেসর মুখার্জির দিকে তাকাই। উনিও বিব্রত! তাড়াতাড়ি বললেন—এভাবে বললে সম্রাট বুঝবে না মিসেস দাস। বরং জিজ্ঞাসা করুন 'কীসের বিজনেস করে?'

—'ও...হ্যাঁ...তাই।'

ভাবছিলাম বলে দিই—'আজ্ঞে, আলুপটলের', কিন্তু চেপে গিয়ে বললাম—'কম্প্যুটার।'

—'কম্প্যুটার বানাও? না সারাও?'

আবার চুপ করে যেতে হল। এই প্রশ্নেরও কোনো জবাব নেই।

বাধ্য হয়েই এবার অর্ক মুখ খুলেছে—'আপনি ইনার আই কম্প্যুটারসের নাম শুনেছেন?'

—'ও-মা, শুনব না কেন? ওদের কম্প্যুটারই তো এখন সব জায়গায়। এই তো, টুনির পিসতুতো দাদা কয়েকদিন আগেই একটা কিনল। ও-ই বলছিল যে এই কম্প্যুটারটাই এখন বেশি কাটছে। ওরা ওটাতেই ই-মেল করে।'

—'বেশ, আপনাদের টিভিতে 'বুম' চ্যানেলটা আসে?'

—'বাংলা কার্টুনের চ্যানেলটা?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'আসে, কিন্তু...।'

—'নাইন্টি সিক্স পয়েন্ট ফোর স্পাইস এফ এমে রান্না শিখেছেন কোনোদিন?'

—'হ্যাঁ...আমি তো সবসময়ই...।'

—'তাহলেই হবে। এবার ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন—এই আলাদা তিনটে প্রোডাক্টই আপনাদের জন্য লঞ্চ করেছে একটাই কোম্পানি। 'কিংস গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিস'। যাদের আসল বিজনেস কোলিয়াড়ির। আর সেই 'কিংস'-এর একচ্ছত্র সম্রাট এই মুহূর্তে আপনার সামনেই বসে আছে। কোলিয়াড়ির বিজনেসটা ওর বাবার ছিল। বাদবাকি উইংগুলো ও নিজেই বাড়িয়েছে। আর প্রত্যেকটাতেই সাকসেসফুল।'

—'ওঃ।'

ভয় হল ভদ্রমহিলা এখনই না ফিট হয়ে পড়েন। কোনোমতে বললেন—'কিন্তু...কিন্তু...।'

—'আপনি বোধহয় জানতে চাইছেন যে তাহলে ও আমাদের সাথে কী করছে! ওর তো তাজ প্যালেস, পার্ক বা হায়াতের মতো জায়গায় থাকা উচিত। তাই তো?' অর্ক আমার কাঁধের উপর হাত রাখে—'বন্ধুদের জন্য এইটুকু স্যাক্রিফাইস আমাদের সম্রাট বাবাজি করতে পারেন। তাই বিজনেস ম্যাগনেটের তকমাটা কলকাতাতেই ছেড়ে এসেছে। এই পুরো ট্যুরটাতেই ওর মোবাইলগুলো সব স্যুইচড অফ, ল্যাপটপ বন্ধ, নো বিজনেস ডিসকাশন, নো অ্যাপয়েন্টমেন্টস, নো অডিট, মিটিং, কনফারেন্স। ওনলি ফুর্তি উইথ ফ্রেন্ডস। আপনি হায়দরাবাদে যত কথা ওর সাথে বলতে পারবেন কলকাতায় গেলে শতকরা এক ভাগও পারবেন না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার জন্যই হেঁটে হেঁটে

মরতে হবে। অনেক ঝামেলা করে যদিও বা পেলেন তা-ও পাঁচ থেকে দশ মিনিটের বেশি নয়।'

অস্বস্তিতে পড়লাম। আমার কোম্পানির প্রোডাক্টগুলো যত জনপ্রিয় আমি ততটাই অন্ধকারে থাকতে ভালোবাসি। মিডিয়ার সামনেও আসি না। লোকে আমায় যথ কম চেনে তত ভালো।

—'এত বড়ো বিজনেস তুমি একা সামলাও? তা-ও এত অল্প বয়সে! অসুবিধে হয় না?' মিসেস দাস বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে বললেন—'বিয়েও তো করোনি!'

—'বিয়ে করলে মানুষের ব্যবসায়িক বুদ্ধি বাড়ে বুঝি?' অভিজিৎ ফোড়ন কাটল—'আগে বলবেন তো!'

—'কেন? তুই কি বিজনেসে নামার কথা ভাবছিস?'

—'আরে আমার জন্য নয়, তোর জন্য বলছি। অ্যাকর্ডিং টু মিসেস দাস, আমাদের মধ্যে একমাত্র তুই-ই ব্যবসা করার উপযুক্ত। বিয়ে-থা করে বুড়ো হয়ে গেছিস। এখন কোমর বেঁধে নেমে পড়। স্ত্রী ভাগ্যে ধন জুটে গেলেও যেতে পারে। ফালতু ফালতু চাকরি করে ল্যাদ খাওয়ার দরকার পড়ে না। আর হ্যাঁ...আমায় তোর প্রাইভেট সেক্রেটারি করতে ভুলিস না যেন।'

—'ক্ষ্যামা দে বাপ।' অর্ক দুহাত জোড় করে বলল—'ওসব করার জন্য আলাদা একটা মগজ থাকা দরকার। ও আমার কম্মো নয়। তা ছাড়া তোরাও তো আমারই সমবয়সি। আমি বুড়ো হলে তোরাও তো বুড়ো হয়েছিস।'

—'আমিও বুড়ো, তবে আইবুড়ো। বুদ্ধিটা এখনো ইঁদুরসখানি কাঁচা রয়ে গেছে। তাই বলছি...।'

—'ভুল লোককে বলছিস।' তিস্তা কাঁটা-চামচ উলটে রেখে বলে—'অর্ক করবে বিজনেস! জানিস, দিন পনেরো আগে ড্রয়িং রুমের জন্য একটা ঝাড়বাতি কিনতে গিয়েছিলাম। দোকানদারটা ওর চোখের সামনে আমাকে যাচ্ছেতাইরকমের ঠকিয়ে দিল। অথচ ও একদম সাইলেন্ট। একটা কথাও বলল না লোকটাকে।'

—'কী বলব?' অর্ক হেসে বলল—'আমি লোকটার উপর ব্যাপক ইমপ্রেস্‌ড হয়ে গিয়েছিলাম। যে লোক তোমাকে ঠকাতে পারে সে আর যাই হোক আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। তাই শ্রদ্ধাবশতই কিছু বলিনি।'

কথাটা ঠাট্টাই! কিন্তু তিস্তার মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল।

এত কথার কচকচি ভালো লাগছিল না। এই মুহূর্তে একটা নরম বিছানা আর বালিশ পেলে একটু ঘুমিয়ে নিতাম। কলকাতায় থাকলে এতক্ষণে হয়তো এক কাপ কড়া কফি খেয়ে বিজনেস মিটিঙে ছুটতে হত। এখানে একেবারে নিশ্চিন্ত অবসর। এত অবসরও ভালো লাগে না। মাঝেমধ্যে একটু ব্যস্ততারও প্রয়োজন। অনেক কিছু ভুলে থাকার জন্য কম্পিউটার, মোবাইল, মিটিং-গুলোরও দরকার আছে।

—'তার চেয়ে বরং সম্রাটের কাছ থেকে বিজনেসের ঘোতঘাত একটু শিখে নেওয়া যাক, কী বলো?'

মাই গড! শেষ পর্যন্ত প্রোফেসর মুখার্জি আমাকেই পরামর্শদাতার আসনটা দিলেন! বলির পাঁঠা আর কাউকে পাওয়া গেল না!

—'এভাবে হয় না। শিখতে অন্তত তিন বছর লাগবে।'

—'তিন বছর?'

—'আমার তাই লেগেছিল। এনিওয়ে...আই হ্যাভ টু লিভ নাউ।' চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ি। ভদ্রতার দোহাই দিয়েও আর বসে থাকা যাচ্ছে না। চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। গা ম্যাজম্যাজ করছে।

—'সম্রাট।' মিসেস দাসও উঠে পড়েছেন—'তোমার সাথে আমার কয়েকটা জরুরি কথা ছিল।'

—'বলুন।'

—'চলো। যেতে যেতে বলছি।'

দুজনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। হোটেলটায় লিফ্‌ট বিলক্ষণ আছে। কিন্তু ডাইনিং হল থেকে আমাদের ঘর মাত্র একটা ফ্লোর উপরে। তাই লিফ্‌টের জন্য অপেক্ষা করাটাই বোকামি।

তবে মিসেস দাসের পক্ষে বোধহয় নয়। পাহাড়প্রমাণ বপু নিয়ে সিঁড়ি ভাঙা সত্যিই কষ্টকর। গোটা আষ্টেক সিঁড়ি ভাঙতে না ভাঙতেই এমন হাঁফাতে লাগলেন যে বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হল।

—'খুব বেশি কষ্ট হলে আমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠতে পারেন।'

—'হ্যাঁ...বাবা। বড্ড কষ্ট হচ্ছে।'

হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত ঘাড়ে করে নিয়ে আসার বাহাদুরিটাই লোকে দেখেছিল। কিন্তু তার কতটা কষ্ট হয়েছিল, পরের দিন ঘাড়ে, পিঠে ব্যথা হয়েছিল কিনা সে খবর কেউ রাখেনি। লোকটার জন্য আমার সহানুভূতি

রইল।

কোনোমতে কয়েকমনি লাশটাকে ঘরের সামনে টেনে এনে হাঁফ ছাড়লাম। বাপ রে বাপ! এমন বউ নিয়ে দাসবাবু ঘর করেন কী করে? ওই তো রোগাপটকা কেঁটেখাটো মানুষ!

—'বাবা সম্রাট, তোমার সাথে একটা কথা ছিল। যদি কিছু মনে না করো।'

—'বলুন'।

—'তোমার তো এতবড়ো বিজনেস। প্রচুর লোক সেখানে চাকরি করে।' মিসেস দাস একটু থেমে কুণ্ঠিত স্বরে বললেন—'আমার বড়ো ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারো বাবা? খুব উপকার হয় তা হলে। ছেলেটা বেকার হয়ে ঘরে বসে আছে। কিছু করে না।'

—'ঠিক আছে।' একটু চুপ করে থেকে বললাম—'পাঠিয়ে দেবেন আমার অফিসে। অর্ক বা অভিজিতের কাছে অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাবেন।'

—'কিন্তু ওর কোয়ালিফিকেশন তো তুমি...।'

—'কোয়ালিফিকেশনে কী লাভ? নিতে তো হবেই, নয়তো আপনি কি আমায় জ্বালাতে ছাড়বেন?'

নাঃ...কথাটা মুখের উপর বলিনি। মনে মনে ভেবেছিলাম মাত্র। আমি দুর্বিনীত হলেও এইটুকু ভদ্রতাজ্ঞান আছে যে এই কথাটা মুখের উপর বলা যায় না। অতএব ভদ্র হেসে বললাম—'আপনার কথাই যথেষ্ট। পাঠিয়ে দেবেন। কিছু একটা হয়ে যাবে।'

—'থ্যাঙ্কস।'

চমকে উঠে পেছনে তাকাই। বন্দনা কখন যেন ডাইনিং হল থেকে উপরে উঠে এসেছে। একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

—'থ্যাঙ্ক ইউ সম্রাটদা।'

আমি মুখ ঘুরিয়ে মিসেস দাসের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলাম। তার বেশি কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বিছানার উপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়েছি। মাথার ভিতরটা ঘটঘটে গরম। আঙুল চালিয়ে দেখলাম। চটচট করছে। একটু অস্বস্তিকর তেলতেলে ভাব। বেশ কিছুদিন শ্যাম্পু করা হয়নি। তাই হয়তো এমন ভারী হয়ে আছে।

মাথার উপর গোলাপি ছাত। দু পাশের দেওয়ালে গোলাপি গাঢ়। আর দু পাশে ফিকে। জানলা দিয়ে সবুজ আর নীল উঁকি মারছে। এক কোণে রট আয়রনের ফুলদানি স্ট্যান্ডে কমলা আর হলুদ রঙের ফুল। আমার অবশ্য এর কোনোটাই পছন্দ নয়। একটু অফবিট রং-ই ভালো লাগে। যেমন ধূসর কিংবা বাদামি। হালকা মব, আগুন রং আর স্লেট রং-ও পছন্দের তালিকায় পড়ে। শুকনো পাতার পিঠে পুড়ে যাওয়া কালচে ছাই রংটাও খুব প্রিয়। কত খুঁজেছি ওই রংটা। কিন্তু কোথাও পাইনি। পৃথিবীর বেশিরভাগ রং-ই বোধহয় খুঁজে পাওয়া যায় না।

যেমন মৃত্যু। সবাই বলে মৃত্যুর রং নীল। তীব্র নীল। অথবা সামান্য বেগুনিঘেঁষা নীলও হতে পারে। আমার বাবার মৃত্যু কিন্তু নীল রঙের ছিল না। ফ্যাকাশে সাদা ছিল। খানিকটা মোমবাতির মতো। গোটা চেহারাটাই ছিল মাদাম তুষোর পুতুল। উদাসীন একখানা জাপানি মুখোশ পরে বাবা কাচের গাড়ি করে চলে গেলেন। আর ফিরলেন না। তুলতুলে আঙুলগুলো আর মাথার চুলে বিলি কাটল না। বুকের উপর হাত রেখে কেউ বলল না—'কোথায় লেগেছে বাবা?'

সেই রংটাও আর কোথাও দেখতে পেলাম না। ঠান্ডা ঠান্ডা নীলচে সাদা। সে সাদা প্রশান্তি, বৈরাগ্য, যন্ত্রণার ত্রিবেণী সঙ্গম। গ্যাসের বার্নারে মাঝেমধ্যে তার সামন্য আভাস দপ করে ফুটে উঠতে দেখেছি। কিন্তু পুরোটা নয়। রোটাংপাসের বরফের কুচিতেও সে রং ছিল না। বরং কাঞ্চনজঙ্ঘার নীলচে সাদা শিরায় তার ছোঁয়া পেয়েছি। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তার বেশি নয়।

চোখদুটো ভারী হয়ে আসছিল। টানটান মস্তিষ্কও আস্তে আস্তে হাঁফ ছাড়ছে। কিন্তু তবু আরো কিছুক্ষণ জেগে থাকতে চাইছিলাম। আরো কিছুক্ষণ চোখের সামনে এই গোলাপি ছাত লেগে থাকুক। রঙিন জগতের সব রংটুকু শুষে নিয়ে আমি চোখ বুজতে চাই। অন্ধকারের বুকে ফুটুক লক্ষ লক্ষ আলোর বিন্দু। আমি দেখতে চাই কখন সেই আলো নিভে যায়। কখন সেই 'ভিবজিওরে'র উপর এসে পড়ে কালোর তুলি। কখন গুটিগুটি পায়ে এসে পড়ে অন্ধকার।...

প্রায় কাদা হয়ে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। এবার আর কোনো স্বপ্ন দেখিনি। কোনো ছায়া বা কোনো মূর্তি এসে বিরক্ত করেনি। সুস্থ একটা ঘুম। যে আধখানা স্বপ্ন এর আগে দেখেছিলাম তার বাকিটা দেখার জন্য কৌতূহল ছিল।

কিন্তু সে স্বপ্ন আর এল না। কোলবালিশটাকে বুকের কাছে চেপে ধরে প্রস্তুতও হয়েছিলাম। তবু এল না।

কতক্ষণ বেহুঁশের মতো ঘুমিয়েছি জানি না। এর মধ্যে ঘরে কেউ ঢুকেছে বা বেরিয়েছে কিনা তাও বলতে পারব না। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন চোখের পাতা খুলল তখন একটা জিনিসই বুঝতে পারলাম। ভয়াবহ খিদে! পেটের ভিতরটা চিনচিন করছে। উথাল পাথাল করছে।

কিন্তু এখন খিদে পেয়ে লাভ! খাবার পেতে হলে নীচে ডাইনিং হলে যেতে হবে। অথবা কোনো রেস্টোর‍্যান্টে। হোটেলটার আশেপাশে অনেক রেস্টোর‍্যান্ট-ই আছে। সেখান খাবারও নিশ্চয়ই আছে। গেরো একটাই। বিছানা ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করছে না। অনেকদিন এমন আলসেমি করার সুযোগ মেলেনি। আজ সুযোগ পেতেই আলস্য চেপে ধরেছে। তার সাথে খিদেটাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েছে আমাকে জব্দ করার জন্য।

পেটে বালিশটা চেপে ধরে কাত হলাম। ধ্যুৎ...নিকুচি করেছে খিদের। এর চেয়েও কতবড়ো জ্বালা বেমালুম চেপে গিয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিলাম। পেটের জ্বালা তো তার কাছে নস্যি।

পাশ ফিরতেই চোখে পড়ল সেন্টার টেবিলের উপরে কে যেন থালাচাপা দিয়ে কী একটা সাজিয়ে রেখেছে। ভালো করে দেখলে থালার নীচে অন্তত গোটা দুয়েক স্যান্ডউইচের ছুঁচলো অংশ চোখে পড়ে। তার পাশে একটা স্যুপের বাটি। সম্ভবত সেটাও ভরা। এক গ্লাস টলটলে জল—সবই আমার হাত বাড়ানো দূরত্বে।

ওঃ প্রোফেসর! তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না!

লোকটার একটু ধাক্কা খাওয়া দরকার। জোরদার ধাক্কা না খেলে ও শুধরোবে না। আজ একটু এগিয়েছে। কাল ঢুকে পড়বে অন্দরমহলে। অসহ্য কৌতূহল নিয়ে এত কাছে সরে আসছে যে, যে-কোনোদিন ওর বাড়ির তাকে রাখা ইতিহাস বইগুলোর মতোই আমিও সহজপাঠ্য হয়ে যাব। তার আগেই ওকে থামানো দরকার। ইমিডিয়েটলি।

গ্লাসের তলায় পড়ে থাকা তরলটুকু গলা জ্বালাতে জ্বালাত প্রাসনালী বেয়ে নেমে যাচ্ছে। জলটলের ধার ধারি না। একদম নির্জলা মদ ছাড়া নেশাও হয় না। প্রথম প্রথম সোডাওয়াটার মিলিয়ে খেতাম। এখন এমনিই চলে।

গ্লাসটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। বোতল থেকে খানিকটা মদ ঢেলে নিলাম।

কালচে তরল ঘষা কাচের তলানি ঢেকে দিয়েছে। নির্ভেজাল নেশা! কোনো আবেগ নেই, মায়া মমতা নেই। কী ভেবেছে? ভেবেছে কী আমায়? সাধুপুরুষ! দুঃখী দেবদাস! না ব্যর্থ কবি! একেবারে সহানুভূতির ঝুলি নিয়ে এসে হাজির! ভালোবাসার চোটে সত্যিটা কারো চোখেই পড়ে না। ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, প্রেম—এ সব আমার জন্য নয়। আমি ভগবান নই। কোনো মুনি, ঋষিও নই। আমি একটা ইতর! একটা খুনি! দাম্ভিক, উদ্ধত, দুর্বিনীত। সমব্যথী মানুষের বুকে ছুরি বসাতে ভালোবাসি। আমায় যারা ভালোবাসে তাদের ভালোবাসার বদলে ঘৃণা দিয়েছি। যখন ছাতিফাটা তৃষ্ণায় কেউ জল দিতে এগিয়ে এসেছে তখন প্রত্যাখ্যান করে চেঁচিয়ে উঠেছি—'চাই না...চাই না...চাই না...।'

তবু এদের শিক্ষা হয় না। যে ক্ষতটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কাঁচা করে রেখেছি সেই ক্ষতের উপরই এরা মলম দিতে আসে। আরো তো কত লোক আছে, যারা সামান্য কেটে গেলেই নাকে কান্না কাঁদে। তাদের কাছে যা না বাপু। আমার কাছেই কেন? অঢেল টাকা, স্ট্যাটাস, গ্ল্যামার আছে তাই বুঝি এত দুঃখ! যাঃ...যাঃ...ভাগ!

আট পেগ পেটে চালান করার পরই মনে হল এবার একটু ঠান্ডা প্রয়োজন। তাজা হাওয়া। ঘরটা গুমোট হয়ে আসছে। এখন একটু টটকা বাতাস ফুসফুসে ভরতে পারলে মন্দ হয় না।

একহাতে বোতল আরেক হাতে গ্লাস নিয়ে ছাতের দিকে পা বাড়ালাম। এখন আমি একা থাকতে চাই। ভরপুর মাল খেয়ে ছাতে শুয়ে থাকব। আকাশটা আজ দিব্যি পরিষ্কার। অনেক তারাও উঠেছে। বিরাট জলের ট্যাঙ্কটার উপর চিত হয়ে শুয়ে তারা গুনব। আর সব উচ্ছন্নে যাক।

ছাতে উঠতেই ফুরফুরে হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। খ্যাপার মতো গায়ে এসে ঝাপটা মারছে। হু হু করে মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। হাওয়ার সাথে সাথেই বোধহয় উড়তে উড়তে একটা মেয়ে নেমে এল। ওর দুই কাঁধে কি দুটো ডানা ছিল? লক্ষ করিনি তো। ছাতের ও প্রান্ত থেকে বোধহয় ডানা দুটো গুটিয়ে নিয়ে মৃদু পায়ে এসে দাঁড়াল। অন্ধকার মাখা জলজ্যান্ত অপ্রকাশিত কবিতা। সূর্যের প্রথম রশ্মিটাও ওর গায়ে পড়েনি। গলায় বকুলের কুঁড়ি। স্তনবৃন্ত শিশির বিন্দুতে ঢাকা।

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অন্ধকার মাখা নারীমূর্তি ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। তার গায়ে প্রথম বৃষ্টিপাতে ভেজা ঘাসের সুগন্ধ। স্খলিত স্বরে বললাম—'তুমি...তুমি কে?'

পরি বলল—'আমি, সম্রাটদা।'

—'ওঃ, তুমি! তুমি কী করছ এখানে?'

—পরি আবার বলল—'তোমার জন্য বসে আছি।'

—'আমার জন্য! আমার জন্য কেন?'

—'তুমি আসবে বলে।'

—'কোথায়?'

—'এইখানে। তুমি তো এখানে রোজই আসো। তাই না?'

আসি। ওই আকাশের ওই প্রান্তে আরো একটা আকাশ আছে। তার পেছনে আরো একটা। ওই আকাশগুলোর কোনোটাতে সেই বুড়ো লুকিয়ে আছে! তাকে খুঁজতেই আসি। কোন্‌টাতে আছে এখনো ঠিক জানি না। তবে খুঁজে নেব।

—'কিছু বলবে?'

—'বলতে তো আসিনি। শুনতে এসেছি।'

—'কী শুনবে?'

—'আমার প্রশ্নের উত্তর।'

—'কোন্ প্রশ্ন?'

পরি চুপ করে গেল। অন্ধকারে তাকে দেখা যায় না। তা-ও বুঝতে পারি দিগন্তের শেষে মিলিয়ে যাওয়া আভার শেষবিন্দু মুখে মেখে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—'তোমার অন্য দাদারা উত্তরটা তোমায় জানায়নি?'

—'জানিয়েছে।'

—'ব্যস...তাহলে তো চ্যাপ্টার ক্লোজড!' আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম। একটা নরম হাত এসে কবজি চেপে ধরেছে—'দাঁড়াও!'

—'বলো।'

—'আমি তোমার মুখে কথাটা শুনতে চাই।'

—'কী শুনতে চাও?'

—'তুমি আমায় ভালোবাসো না।'

—'বাসি না...বাসি না...হয়েছে?'

—'দাঁড়াও, কোথাও যাবে না তুমি।'

—'আর কিছু বলবে?'

—'তুমি মিথ্যে বলছ।'

—'আমার বলার কথা বললাম, বিশ্বাস করা বা না করা তোমার ব্যাপার!'

—'আমি বিশ্বাস করি না।'

আমি জোরে হেসে উঠলাম। কী অদ্ভুত বিশ্বাস পাগলির! বেচারা! আমাকে এখনো চেনেনি। তাই ওরও একটু ধাক্কা খাওয়া দরকার। জোরদার ধাক্কা।

—'এসো...এদিকে এসো...।'

ওর পিঠে হাত রেখে ট্যাঙ্কের কাছে নিয়ে গেলাম। কচি পিঠ। তিস্তার মতো মসৃণ নয়। হাড়ের আধিক্যই বেশি। তবু কোমল, নরম।

ছাতের অন্যান্য দিকের তুলনায় এদিকটায় অন্ধকারটা একটু বেশিই জমাট। ট্যাঙ্কের বিশাল বপুটা অনেকটাই আড়াল করেছে। এখানে চুপ করে বসে থাকলে সহজে দেখা যায় না।

—'দাঁড়াও এখানে।'

ওকে ট্যাঙ্কের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। আমার ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ওর মুখ ছুঁয়ে যাচ্ছে। আমি জানি ও চোখ বুজে আছে। হৃৎস্পন্দন আগের থেকেও দ্রুতগতিতে চলছে।

—'একটা কথা বলব?'

—'বলো।' পরি ফিসফিস করে বলল।

—'তুমি দেখতে একটুও সুন্দর নও। এখানে আলো থাকলে কী হত জানি না। কিন্তু অন্ধকারে তোমায় বেশ ভালোই লাগছে। তুমি আমায় ভালোবাসো না?'

পরি নিশ্চুপ।

—'বাসো না?'

—'বাসি।'

—'তা হলে আমি যা চাই দেবে?'

পরি স্থির।

—'কী হল? যা চাইব দেবে?'

—'দেব।'

—'তোমার বুক দুটো বেশ ভারী। ডাঁসা পেয়ারার মতো। দেখলেই লোভ লাগে। আমি তোমার বুকে হাত রাখতে চাই। দেবে?' আমি ওর কানে ঠোঁট ছুঁইয়ে বললাম—'জামাটা খুলে তোমায় একটু চটকাতে চাই। দেবে?'

পরি শক্ত কাঠ হয়ে গেছে। এক সেকেন্ডের জন্য মনে হল, বোধহয় ও মরে গেছে। একবার জোরে শ্বাস টানল। তারপরই পাথরের মতো শক্ত, স্থির।

—'তোমার আপত্তি নেই। ফাইন।'

—'আমি আস্তে আস্তে ওর সালোয়ার কামিজের সামনের বোতামগুলো খুলে দিয়েছি। যতখানি ফাঁক হয়েছে তার মধ্যে দিয়েই হাতটা ঢুকে গেল। বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। নিঃশ্বাসের তালে তালে উঠছে নামছে। জামার ভিতরে দুটো পৃথিবী পাশাপাশি স্তম্ভিত। পেলব! হাতের মুঠোর মধ্যে এক্ষুনি গলে যাবে।

—'জামা খোলো।'

কামিজটা খুলে হাতে চলে এল। মেয়ে কাঁপছে। হয়তো কাঁদছেও। কাঁদুক। প্রথম প্রথম এমনই কাঁদে বটে। তারপর অভ্যস্ত হয়ে যায়। ধরাবাঁধা রুটিনে পড়ে যায়।

সামনে পরির খোলা স্তন। উলটোনো রুপোর বাটি। সালোয়ারের দড়িতে হাত পড়ল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই প্রকট হল উরুসন্ধি। একদম ভার্জিন। কোমরের বাঁকে বাঁকে অন্ধকারের চাদর। মদের বোতল থেকে অনেকটা ঢেলে দিই ওর বৃন্তে। তারপর চুষে চুষে খেতে থাকি। কুমারী মেয়েদের স্তনের একটা অদ্ভুত স্বাদ আছে। একটা চটচটে সান্দ্র রসের স্বাদ পাচ্ছিলাম মদের সাথে। বাঃ! বেশ নতুনত্ব আছে তো! আমি চুষে চুষে সবটুকু স্বাদই গ্রহণ করলাম। ওর স্তনগোলকের পাশে, বুকের খাঁজে একফোঁটা দু ফোঁটা তরল লেগেছিল। জিভ দিয়ে চেটে চেটে পরিষ্কার করেছি।

বন্দনার স্তনবৃন্ত উদগ্র হয়ে উঠেছে। এখন টানটান! বোধহয় কামড় চায়। থিরথির করে কাঁপছে অনাঘ্রাত চাঁপা ফুলের স্তূপ!

—'হাত দুটো টানটান করো।'

ও হাত দুটো মাথার উপর তুলে নিতেই বুক দুটো আরো স্ফীত হয়ে উঠল। এখন হাতের কাছে চেরি বা স্ট্রবেরি থাকলে খুব ভালো হত। ওর বৃন্তের উপরে রেখে আলতো আলতো করে কামড়ে কামড়ে খেতাম।

—'বগল শেভ করো না কেন? উঁ।' আমি জিভ দিয়ে ওর বগল চাটতে

চাটতে বললাম—'মেয়েদের হেয়ারি পুসি আমার খুব ভালো লাগে। বাট হেয়ারি আন্ডার আর্ম নয়। তোমার এখানে চুল আছে দেখতেই পাচ্ছি। নীচে আছে ডি-য়া-র?'

বলতে বলতেই আমার হাত চলে গেছে ওর নিম্নাঙ্গে। চুল আছে মানে! গোপনাঙ্গ ঘিরে একেবারে পশমের গালিচা! কী উষ্ণ! আঃ! কবিরা সবসময়ই 'কুঞ্চবরণ-কন্যার মেঘবরণ চুল' নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিন্তু কন্যার যৌনাঙ্গে যে এমন কমল পেলব মখমলের গালিচা ওত পেতে আছে তার বর্ণনা কেউ করেননি। অন্যায়...ভীষণ অন্যায়!

ওর যৌনরসের স্বাদ নিতে নিতে মনে হল—এই স্বাদটা একদম আলাদা। গন্ধটাও!

—'কখনো নিজেকে টেস্ট করেছ? এই নাও।'

আমি সেই চটচটে রস আঙুলে করে ওর ঠোঁটে মাখিয়ে দিয়েছি। ঘেন্নায় বন্দনা কুঁকড়ে গেছে। তা সত্ত্বেও জোর করে তার মুখে আঙুলটা ঢুকিয়ে দিলাম।

—'চোষো। দ্যাখো তোমার স্বাদ কেমন?'

প্রচণ্ড বিবমিষাকে মেয়েটা কোনোভাবে চাপল। ওর শরীরটা ক্রমাগতই কেঁপে উঠছে। কাঁপছে ওর তলপেটের মেদ। কাঁপছে সুগোল উরুর পেশি।

উরু থেকে চুমু খেতে খেতে উপরে উঠলাম। জানু, জঙ্ঘার পেশি শিউরে উঠল। ও ভিজছে। নাভির চারপাশটা থরথরিয়ে উঠছে। তলপেট। তলপেট থেকে কোমর, কোমর বেয়ে...।

—'একটু চুমু খেতে পারি?'

কোনো উত্তর নেই। ঠান্ডা, অসাড় ঠোঁটদুটো মুখের মধ্যে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ছেড়ে দিলাম। ভালো লাগল না। মেয়ের বিষদাঁত এখনো গজায়নি। একদম মিয়োনো মুড়ির মতো। এরা বিছানা গরম করতে জানে না। শুয়ে সুখ নেই।

তবু আমি ওকে খুঁড়ছিলাম। মাথাটা আবার ওর বুকের কাছে নেমে এল। যে মুকুলে এখনো মৌমাছি বসেনি তার আনকোরা স্বাদ। কুমারী শরীরের একটা নতুন স্বাদ আছে। আমি সেই স্বাদে অভ্যস্তও। কিন্তু দুটো সুবর্ণগোলক চুষতে চুষতে বুঝলাম কোথাও কিছু একটা ঠিকঠাক ঘটছে না। জিভটা যেন মুখের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। জড়িয়ে যাচ্ছে। অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

কেন এমন হচ্ছে? এরকম তো আগে কখনো হয়নি। মেয়েদের বুক ঘেঁটে আমি অভ্যস্ত। যে অঙ্গটার উপর আমার সবচেয়ে বেশি লোভ সে দুটো চোখের সামনে উন্মুক্ত। অথচ এ দুটো নিয়ে কি করতে হয় সেটাই যেন মাথা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি এখনো কৈশোরের সীমায় পড়ে আছি। নারী শরীর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এখনো কৌমার্য ভঙ্গ হয়নি।

কিন্তু এ আমার ভুল! এই বুক দুটোর আলাদা কোনো মাহাত্ম্য নেই। এ-ও মাংস। এ-ও মাংসেই গড়া! একেও হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। অন্যান্য মানবীদের সাথে এর কোনো পার্থক্য নেই। এটা অসাধারণ কিছু নয়! সম্পূর্ণ এক...কাম অন...কাম অন সম্রাট...ছিন্নভিন্ন করো এই বুক...! কাম অন...ইউ ব্রুট...এ কাজ তুমি আগেও অনেকবার করেছ! জেগে ওঠো! ভিতরের দস্যুটাকে জাগাও...হাঁ করে কী দেখছ! ওয়েক আপ...ওয়েক আপ...।

—'এসো।'

মেয়েটাকে চিত করে মেঝের উপরেই শুইয়ে দিই। এতক্ষণ হয়তো অতিকষ্টে চেপে ছিল। এবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল 'না...না...সম্রাটদা... ছেড়ে দাও।'

আমি নিজের শরীর দিয়ে ওর শরীর ঢেকে দিয়েছি—'কেন? তুমি আমায় চাও না?'

—'চাই...চাই...। কিন্তু...এভাবে...এভাবে নয়।'

হেসে ফেললাম—'তা হলে কীভাবে চাও? সাবিত্রী সত্যবানের মতো প্লেটোনিক প্রেম? ওসব ভালোবাসা-টাসা পোষায় না গুরু। আমি সেক্স বুঝি। সাফ সাফ বলো সেক্স করতে চাও, কি চাও না।'

—'চাই না...ছেড়ে দাও!' দু হাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদছে সে—'ছেড়ে দাও...।' আমি ওর শরীর থেকে নেমে এলাম। জামাকাপড়গুলো আশেপাশেই পড়ে ছিল। ওর মুখের উপর ছুড়ে দিয়ে বললাম—'গেট লস্ট।'

পরি বোধহয় বোঝেনি সে এত সহজে ছাড়া পেয়ে যাবে। কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থেকে তারপরই ধড়মড় করে উঠে বসল। প্রচণ্ড বমি ওর ছাতি ফাটিয়ে উঠে আসছে। কোনোমতে সেটাকে গিলতে গিলতে বিকৃত স্বরে বলল—'ছিঃ!' ...আমি তোমায় ভালোবেসেছিলাম...কিন্তু তুমি একটা...তুমি একটা...জ্-জা-নো-য়া-র্... ছিঃ...ছিঃ।' কান্নায় ভেঙে পড়ে পড়ি কি মরি করে পালিয়ে গেল সে।

বুকের ভিতরটা চিড়বিড় করে জ্বলছে। বোতলটা গলায় ঢেলে দিলাম। এতদিন শুধু বর্বর, রাক্ষস, পিশাচ শুনে শুনে কান পচে গিয়েছিল। আজ আরো একটা উপাধি জুড়ল। জানোয়ার!...জানোয়ার!...জানোয়ার! আমি একটা ছিঃ! একটা আস্ত ছিঃ...ছিঃ...ছিঃ!

—'কাকু, তোমার নাম কী গো?'

ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়ে—খুব বেশি হলে তিন-চার বছর বয়স হবে। দু পাশে দুটো শিং-এর মতো ছোট্ট বুঁটি। আমাদের ঘরের উলটোদিকে ছশো দুই নম্বর রুমে এসেছে। একটা ববিপ্রিন্টের জামা পরে করিডোরে গুট গুট করে হাঁটছিল। আমায় দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কাকু তোমার নাম কী?'

আজ সকালে আমাদের বেরোনোর কথা ছিল। মেয়েদের মার্কেটিং আগেই হয়ে গিয়েছে। ওদের কেনাকাটা বলতে তো সাজগোজের জিনিসপত্র। ছেলেদের অত ফ্যাশনের ঘটা নেই। কিন্তু তাই বলে তাদের কেনাকাটার শখ থাকবে না একথা ভাবাই অন্যায়। তাই সর্বসম্মতিক্রমে আজকের দিনটাই আমাদের মার্কেটিং করার দিন বলে ধার্য হয়েছে। সকালবেলাই স্নান-টান সেরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে হুড়মুড় করে লিফ্‌টের দিকে দৌড়াচ্ছি। একেই আমি লেট রাইজার। আটটার আগে ঘুম ভাঙতেই চায় না। তার উপর প্রফেসর মুখার্জিও সকাল থেকেই কৌশিক রুদ্রর কাছে। বিছানা থেকে টেনে তোলার কেউ ছিল না। ফলতই আমি লেট। অর্কর দাঁত খিঁচুনি খেতে হবে ভেবে ভয়ে প্রায় কাঠ হয়ে লিফ্‌টের বোতামটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাব, এমন সময় পুঁচকি মেয়েটা কোত্থেকে এসে দুম করে প্রশ্ন করে বসল।

ফর্সা রং। টোপা টোপা গাল। রীতিমতো একটু থুঁথুমুচু। মাথাটাকে অনেক কসরৎ করে ওর সমান উচ্চতায় এনে বললাম—'আমার নাম নেই। তোমার নাম কী?'

ফোকলা মুখে একগাল হেসে কিছু একটা বলল। মুখে একটা ললিপপ গোঁজায় আর সামনের দাঁত দুটো না থাকার ফলে শব্দগুলো এলিয়ে গিয়ে ফসফস করে হাওয়ার সাথে মিলিয়ে যাচ্ছিল। বার তিনেক শোনার পর বুঝলাম ওর নাম—আনন্দী মজুমদার।

আনন্দী!—বেশ নাম! চেহারা থেকেও তো আনন্দ ঝরে ঝরে পড়ছে।

—'আনন্দী, কোন্ ক্লাসে পড়ো তুমি?'

—'কেজি টু।'

—'তোমার সামনের দাঁতগুলো কি ইঁদুরে নিয়ে গেছে?'

—'হুঁ।' মুখ থেকে ললিপপটা বের করে সে বলল—'বাকিগুলোও নিয়ে যাবে বলেছে।'

—'সেকী! কে বলল?'

—'বাবা।'

—'কেন নিয়ে যাবে?'

—আমি দুষ্টু করি তো তাই।'

অনেকদিন পর খোলা হেসে উঠলাম। কী সুন্দর মিষ্টি কথা বলে মেয়েটা! দেখতেও যেন ডলপুতুল।

—'আচ্ছা।' আমি ওকে কোলে তুলে নিয়ে বললাম—'এরপর ইঁদুর তোমার দাঁত নিতে এলে বোলো, কেমন?'

—'তুমি কী করবে?'

—'আমি ইঁদুরের সাথে বক্সিং করব।'

—'তুমি বক্সিং করো বুঝি?'

—হ্যাঁ...সোনা।'

—'কই দেখি'। সে তার নরম কচি হাত দুটো দিয়ে আমার বাইসেপ্‌স টিপে টিপে দেখছে। টিপেটুপে কী বুঝল কে জানে। সম্ভবত তার ধারণা হল যে আমি বীর পালোয়ান ভীম সিং। গলা জড়িয়ে ধরে বলল—'কাকু, তুমি কি উড়োর সাথে বক্সিং করতে পারো?'

—'উড়ো! উড়ো কী?'

—'উড়ো জানো না। হা-য়-ক-পা-ল। সে কপালে হাত ঠুকে বলল—তুমি কিচ্ছু জানো না। একদম বোকা।'

—'জানি না। জানব কী করে? আমি তো আর তোমার মতো লেখাপড়া করিনি।'

—'লেখাপড়া করোনি! তা হলে কি তুমি গোরু চরাও?'

বিষম খেতে খেতে বেঁচে গেলাম। গোরু আবার এর মধ্যে কোত্থেকে এল!

—'আমার মা বলে, পড়াশুনো না করলে মাঠে গিয়ে গোরু চড়াতে হয়। তুমি কি গোরু চরাও?'

—'হ্যাঁ, কিন্তু উড়োটা কী বললে না তো?'

—'ওই যে গো—আকাশে উড়ে বেড়ায়। বিরাট বড়ো। গোঁ গোঁ করে চিৎকার করে। আর দুষ্টু ছেলেমেয়ে দেখলে ধরে নিয়ে যায়।'

বুঝলাম—এরোপ্লেনের কথা হচ্ছে। দুষ্টু বাচ্চাকে ভয় দেখানোর জন্য বাবা মায়ের অসাধারণ কল্পনা ওতে সেটাই উড়ো হয়েছে। শিশুর সরল মনও তাকে ধ্রুবসত্য বলে মেনে নিয়েছে।

—'কিন্তু তুমি এখানে কী করছ? বাবা-মা কোথায়?'

—'বাবা বাথরুমে চান করছে।' সে চোখ পিটপিট করে ঠোঁটে আঙুল ঘষতে ঘষতে বলল—'আর মা লিপিস্টিক লাগাচ্ছে। এমনি এমনি করে।'

—'চলো, তোমায় ঘরে পৌঁছে দিই।'

একেই শুনশান করিডোর। ধাপে ধাপে সিঁড়ি। তার মধ্যে লিফ্‌টটা যখন-তখন উঠছে নামছে। কত শত উটকো লোকের আনাগোনা। তার মধ্যে পুঁচকিটা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অচেনা, অজানা জায়গা। কিছু একটা হয়ে যেতেই পারে। মেয়েটার বাবা-মা-ই বা কী? বাচ্চাটা কোথায় গেল সেদিকে তাদের খেয়ালও নেই! একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেলে দায় কে নেবে?

ছ'শো দুই নম্বর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। বার দুয়েক টোকা মারার পর এক সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক দরজা খুললেন। সম্ভবত মেয়ের বাবা। ফর্সা রং, মেয়ের মতোই আহ্লাদী, আহ্লাদী ফুলো ফুলো গালের মানুষ। দরজায় অচেনা লোক দেখে চমকে গেলেন—'আপনি?'

—'আপনার মেয়ে...', আমি মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে ভদ্রলোকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলাম—'করিডোরে একা একা হেঁটে বেড়াচ্ছিল।'

—'একা একা!' মেয়ের বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—'সে কী!'

—'নিন।'

তিনি মেয়ের হাত ধরে সরে দাঁড়িয়েছেন—'থ্যাঙ্ক ইউ...থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। বাইরে কেন? আসুন, ভিতরে আসুন প্লিজ।'

—'নো থ্যাঙ্কস। ভারী মিষ্টি মেয়ে আপনার। খুব আলাপি। খেয়াল রাখবেন।'

—'তা তো নিশ্চয়ই।' ভদ্রলোক অপ্রস্তুত—'আসলে এত দুষ্টু যে সামলানো যায় না। দরজা খোলা পেয়ে কখন যে বেরিয়ে গেছে।'

—'বাবা...বাবা জানো? কাকুটা না কিচ্ছু পড়াশুনো করেনি। মাঠেঘাটে

গোরু চরিয়ে বেড়ায়।' আনন্দী ছোটো ছোটো হাত দিয়ে বাবার পাজামা টেনে ধরে বলল—'উড়ো কাকে বলে তা-ও জানে না।'

হেসে উঠলাম। ওর বাবা আরো অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন—'ছিঃ...অমন বলতে আছে মা! লোকে শুনলে খারাপ বলবে যে!'

—'আমি কী করলাম! মা-ই তো...।'

—'আচ্ছা...আচ্ছা...। বিপদ দেখে বাবা প্রসঙ্গটা ওখানেই চাপা দিয়ে দিয়েছেন—'তুমি ভিতরে যাও...দেখো তো মা কী করছে?'

—'আচ্ছা।' পুঁচকু মাথা নেড়ে চলে গেল।

আমিও ফিরে এলাম। শুকনো ভদ্রতার কথা শোনার ইচ্ছে ছিল না। এমনিতেই অর্ক ভয়ানক পাংচুয়াল। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় সে নীচে নেমে গেছে। এখন সাড়ে ন'টা বাজে। এই আধঘণ্টা হোটেলের রিসেপশনে বসে সে আর যাই হোক, আমার সুখ্যাতি করছে না। শুধু নীচে যাওয়ার অপেক্ষা। হাতের কাছে পেলেই নির্ঘাত তেড়ে খিস্তি দেবে।

কয়েক মিনিট লিফ্‌টের সামনে দাঁড়িয়ে অধৈর্য আঙুলে বোতাম টেপাটেপির পর অবশেষে গড়িমসি করতে করতে তিনি এলেন। পেটভর্তি লোক। হুসহাস করে তারা বেরিয়ে যাওয়ার পর গুটি গুটি পায়ে ঢুকে পড়লাম। লিফ্‌টের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

—'এতক্ষণে তোর সময় হল?' অর্কর সামনে যেতে না যেতেই পেল্লায় একখানা ধমক।

—'আমরা আধঘণ্টা ধরে এখানে হাত গুটিয়ে বসে আছি। বসে থেকে থেকে পায়ে দুব্বো গজিয়ে গেল, আর তুই এখন আসছিস।'

—সরি ভাই, দেরি হয়ে গেল।'

সরি বলে দেওয়ার পর আর রাগ করে থাকা যায় না। অর্ক একটু শান্ত হয়ে বলল—'চ, শিবাকুমারণ গাড়িতে বসে আমাদের জন্য ওয়েট করছে।'

—'চ'।

অভিজিৎ কচর কচর করে একটা চুয়িংগাম চিবোচ্ছিল। 'থুঃ' করে সেটাকে ফেলে দিয়ে বলে—'আমাদের প্রোগ্রামটা এখনো জানাসনি কিন্তু। আমরা কি শুধুই শপিং করব?'

—'নাঃ। ঘুরব, বেড়াব, রেস্টোর‍্যান্টে লাঞ্চ করব, শপিং করব। তারপর রাতে হোটেলে ফিরব।'

—'তার মানে আবার সেই বিরিয়ানি, নয়তো কাবাব-তন্দুর।' অভিজিৎ করুণ মুখে বলল—'আমার কথা একটু মনে রাখিস বাবা।'

—'কেন? আজ সকালের মালও এঁটে ছিল?'

—'নাঃ...আজ ছিপি খুলেছে। কিন্তু সাবধানের মার নেই।'

—'ঠিক আছে। তুই ধোসা খাবি। এখন চল, বেচারা শিবাকুমারণ বোধহয় ঘুমিয়েই পড়ল।'

—'চ।'

অর্ক যাই বলুক না কেন, দেখা গেল শিবাকুমারণের ধৈর্য তার অনুমানের চেয়ে অনেক বেশি। সে আদৌ ঘুমিয়ে পড়েনি। বরং গাড়ির সাউন্ড সিস্টেমে গান চালিয়ে তালে তালে পা নাচাচ্ছিল। আমাদের দেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'আরে, আপনাদের এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল!

অর্ক তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে গাড়ির মাঝখানের দরজা খুলে উঠে বসেছে। অভিজিৎ পেছনে। আর আমি সামনে। অনেকদিন পর শুধু তিনজনে একসাথে বেরোচ্ছি। শেষবার গিয়েছিলাম দার্জিলিং। তা-ও প্রায় বছর আষ্টেক আগে। তখনো জীবনটা এত ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। অর্ক আর অভিজিৎ ছোটোখাটো চাকরি করে। আমি বাবার ব্যবসার হাল ধরলেও তখন শুধু কোলিয়াড়ির বিজনেসটা ছাড়া আর কোনো উইং ছিল না। মাথার উপরে অভিভাবক হিসাবে কাকা ছিল। তাই কাজের চাপটাও এখনকার মতো দুর্বিষহ হয়ে ওঠেনি।

তারপরে কেটে গিয়েছে দীর্ঘ আটটা বছর। দায়িত্ব বেড়েছে। টাকার নেশা পেয়ে বসেছে। একের পর এক প্রোজেক্ট বানিয়েছি। সাফল্যের পর সাফল্য। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের স্তূপে হৃদয়বৃত্তিগুলো চাপা পড়ে গেছে। তবু আজও মনে পড়ে সেই দার্জিলিং ভ্রমণের কথা। কী সবুজ ছিল সেদিনের দার্জিলিং! কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনালি রঙের গনগনে রক্তিমাভায় যে অপার্থিব সৌন্দর্য দেখেছিলাম তা আর কখনো পাইনি। আবেগঘন প্রত্যেকটা সন্ধ্যা, যৌবনোচ্ছল সকালগুলো জীবনে এনে দিয়েছিল একরাশ তাজা অক্সিজেন।

সেই অক্সিজেনের লোভেই বোধহয় অর্কর বেড়াতে আসার প্রস্তাবে ঘাড় নেড়েছিলাম। ওর আগ্রহ, আন্তরিকতা আমায় নাড়া দিয়েছিল। তাই সব ছেড়েছুড়ে চলে আসতে রাজি হয়ে গিয়েছি। মাঝখানের আট বছরের কথা মনেই রাখিনি। অথচ এখন সেই আট বছরের পার্থক্যটাই বড়ো হয়ে ধরা

দিচ্ছে। এই আটবছরে আমি অনেক পালটেছি। অর্ক পালটেছে। অভিজিৎও পালটেছে। আগে তিনজনে একই সিটে বসতাম। আজ আমি সামনে, অর্ক মা' 'নে, অভি পিছনে। আট বছর আগের 'অর্ধাভিসম' গল্পে মশগুল থাকত। এখন আমাদের মধ্যে নীরবতা জমে থাকে। অভি আর আমার প্রত্যক্ষ সংলাপ প্রায় নেই বললেই চলে। অর্ক আমাদের মধ্যে সংলাপ সূত্র বজায় রাখার চেষ্টা করলেও তা একরকম জোর করেই চাপিয়ে দেওয়া।

অর্কও বোধহয় আমার মতোই নস্টালজিক হয়ে পড়েছে। সজোরে নিঃশ্বাস টেনে বলল—'কতদিন পরে আমরা আবার এরকম করে তিনজনে বেরোলাম বল তো!' অভিজিৎ আরেকটা চুয়িংগাম মুখে পুরে দিয়ে বলল—'আট বছর পরে। লাস্ট গিয়েছিলাম দার্জিলিং—নাইন্টিন নাইন্টি সেভেন, ৫ মার্চ।

—'তোর মনে আছে! অর্ক সোৎসাহে বলল—'দার্জিলিঙের সূর্যোদয়।'

—'মনে নেই আবার! প্রথমদিন কেমন উল্লু হয়েছিলাম বল তো।' অভিজিৎ পিছনের সিট থেকে ডিঙি মেরে অর্কর পাশে এসে বসেছে—'সূর্যটা সবে উঠবে উঠবে করছে। পূর্বদিক পুরো কুসুম-লাল। কাঞ্চনজঙ্ঘা অস্পষ্ট-ভাবে দেখা যাচ্ছে। সেদিকেই তিনজন হাঁ করে তাকিয়ে আছি। এমন সময় কোথা থেকে হতচ্ছাড়া কুয়াশা এসে সব ঢেকে দিল। কিচ্ছু দেখতে পাইনি!'

—'আর সম্রাটের সেই কাঞ্চী! কেমন করে তাকিয়ে থাকত! পেছনেই পড়ে গিয়েছিল।'

—'শুধু কাঞ্চী কেন? নৈনিতাল থেকে শুরু করে সিমলা, দার্জিলিং অবধি সম্রাটের হিস্ট্রি একই। অবশ্য তোরও হিস্ট্রি কিছু আলাদা নয়। দার্জিলিঙের হিল ডায়রিয়া কেমন লেগেছিল?'

অর্ক হো হো করে হেসে উঠল—'আর বলিসনি বাপ।'

সোনালি প্যাকেটে ধপধপে সাদা ইন্ডিয়া কিংস সারে সারে শুয়েছিল। একটা তুলে নিয়ে অভিজিতের দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়েছি। ও আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

—'বিড়ি খাবি?'

—'দে শালা, একটার সাথে আরেকটা ফ্রি।'

এটা আট বছর আগের সংলাপ। আজকের অভিজিৎ একটা সিগ্রেট তুলে নিয়ে বলল—'থ্যাঙ্কস।'

অর্ক একটা জোর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে—'আজও মনে হয় যেন কালকেরই ঘটনা। আট বছর আগে কেউ বলবে!'

অভিজিৎ মাথা ঝাঁকাল! নস্টালজিয়াকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বলল—'আমি বলব। কারণ এই আট বছরে তোর একটু ভুঁড়ি হয়েছে। গলায় একটা হাচ নেটওয়ার্ক ঝুলিয়েছিস। Wherever you go, network foloows. তাই তোকে আর একা পাওয়ার উপায় নেই। পেতি চাকরি ছেড়ে মালদার হয়েছিস। আশা করছি আগামী বছরেই আমাদের কাকু বানাবি।'

—'ভুঁড়ি তো তোরও হয়েছে। মালদার তুইও কিছু কম না। তার উপর রংটাও এসি রুমে থেকে থেকে একটু পদের হয়েছে। কিন্তু সম্রাট—আট বছরে তুই একটুও পালটাসনি। বরং গ্ল্যামারটা আরো বেড়েছে। চেহারাটা আরো মজবুত হয়েছে। কিন্তু সিগ্রেট, মদ বাড়িয়েছিস। ভেরি ব্যাড।' অর্ক সিটের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল—'মাত্রাটা কমা সম। নয়তো পরে বিপদে পড়বি।'

—'দেখি।'

শিবাকুমারণ এতক্ষণ ড্রাইভারকে কী যেন বোঝাচ্ছিল। এবার এদিকে মুখ ঘুরিয়েছে—'ওকে স্যার। আমরা এখন চার কামানের দিকে যাচ্ছি। ওখানে যা কেনার তা কিনে নেবেন। সেখান থেকে আমরা স্ট্রেট যাব বশিরবাগ। 'বাহার'-এর বিরিয়ানি খেতে।

—'বাহার' রেস্টোর‍্যান্টের বিরিয়ানির নাম আগেও শুনেছি। হায়দরাবাদ আসার পর থেকেই অভিজিৎ এই ইস্যুটা নিয়ে প্রচুর নাচানাচি করছিল। কিন্তু আজ যেন বিরিয়ানির নাম শুনে মুষড়ে পড়ল।

—'ভালো কথা।' অর্ক অভিজিতের হাত থেকে চুয়িংগামের ফয়েলটা নিয়ে বলল—'সম, তোকে একটা জব্বর খবর দিই। অভিজিতের মা ওর জন্য মেয়ে দেখতে শুরু করেছেন।'

—'তাই!'

অভিজিৎ বিষণ্ণ মুখে মাথা নাড়ল—'হ্যাঁঃ।'

—'সে কী! তুই অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করবি!'

কথাটা না বলে থাকতে পারলাম না। কলেজজীবন থেকেই অভিজিৎ ভীষণ স্বাধীনচেতা। মাঝেমধ্যেই অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ভার্সেস লাভ ম্যারেজের তর্কটা আমাদের মধ্যে উঠত। অভি চিরকালই লাভ ম্যারেজের পক্ষে। যাকে

চিনি না, জানি না, ভালোবাসি না, সেই উটকো একটা মেয়েকে গলায় ঝোলাব—এমন ধারণাকে সে ফুঁ দিয়েউড়িয়ে এসেছে। সেই অভি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করতে চলেছে!

—'কী করব বল তো। তোর মতো বাঁধানো কপাল নিয়ে তো আর জন্মাইনি। কলেজে দু তিন বছরে অনেক মেয়ের পেছনে তো হাওয়া দিলুম। অফিসেও গুলি মারতে ছাড়িনি। দেখলুম কেউই পাত্তা টাত্তা দিল না। অগত্যা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে বাধ্য খোকার মতো বাবা-মায়ের ঘাড়েই ছাদনাতলার দায়িত্বটা ছেড়ে দিয়েছি।' সে অন্যমনস্ক হয়ে সিগ্রেটে টোকা মেরে ছাইটুকু ঝেড়ে ফেলে বলে—'তা ছাড়া বিয়ে করতে হবে তাই করছি। বাবা-মা বাজার থেকে বেছে বেছে আলু, বেগুন, পটল কিনে এনেছেন। সেটাই আমায় টপাৎ করে গিলে খেতে হবে। দ্যাট্‌স অল।'

—'সেটা কতদূর এগোল। প্রসেসিংয়ের পথে?'

—'মেয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

—'হোয়াট!' অর্ক সোজা হয়ে বসে বলল—'ঠিক হয়ে গেছে মানে! এটা বলিসনি তো! কোন্‌টা ঠিক হল?'

—'ব্যারাকপুরেরটা।'

—'ওই কেমিস্ট্রি ডক্টরেট।' সে চোখ কপালে তুলে বলে—'ও তো বউ নয়, তোর দিদিমণি হবে। ভালো বলছি অভি, এখনো সময় আছে। বেঁকে বস।'

—'সময় নেই, পাকা কথা হয়ে গেছে।'

—'পাকা কথা হয়ে গেছে!' বিস্ময়ে অর্কর মুখ হাঁ হয়ে গেছে—'পাকা কথাও হয়ে গেল! বলিসনি তো!'

—'আশীর্বাদও কমপ্লিট!'

অর্ককে দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন চোখের সামনে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভেঙে পড়তে দেখেছে। কোনোমতে বলল—'আশীর্বাদ হয়েছে! আমরা জানতেও পারলাম না। প্রসঙ্গটা না তুললে জানতেও পারতাম না। তলে তলে এতদূর এগিয়ে গেছিস। একবার বললিও না!'

অভিজিৎ চোখ নীচু করে চুপ আছে।

—'বল, জবাব দে।'

অভিজিৎ তবু চুপ। মাথাটা হেঁট করে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে

আছে। যেন এই মুহূর্তে হাতের রেখাবিচারের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর নেই।

—'চুপ করে আছিস কেন? বল...কিছু বল।'

এবার সে মুখ তুলল—'কী বলব ভাই! এর পরের কথাটা বললে তো তুই আমায় মারবি।'

—'বল।'

—'সামনের ১০ তারিখে আমার বিয়ে।'

অর্ক বিস্ফারিত চোখে ওকে দেখছে। কথা নয়, পোখরানের পরমাণু বিস্ফোরণ। ওর মাথায় যেন কিছুই ঢোকেনি। চোখ আর ঠোঁট গোল হয়ে গেল। ও বিশ্বাসই করতে পারছে না যে সামনের মাসের ১০ তারিখ অভিজিৎ বিয়ে করতে চলেছে! আমাদের অভিজিৎ! সেই অভি!

—'শা—লা, গাড়ু!' অর্ক নিজেকে ভুলে গেল। ভুলে গেল ও কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডের হোমরাচোমরা অফিসার! ভুলে গেল ও বত্রিশ বছরের ভারিক্কি মানুষ।

—'ইয়ার্কি মারছিস তুই আমার সাথে!' সে অভিজিতের চুলের মুঠি ধরে সিটের উপর ফেলে দুমদুম করে ঘুঁষি মারতে মারতে বলে—'দশ তারিখ তোমার বিয়ে, আর তুমি এখন জানাচ্ছ। সারা হায়দরাবাদ চষে বেড়ানোর সময় একবারও মনে ছিল না যে এই খবরটা আমাদের জানানো দরকার। আর আজই বা বললে কেন? বিয়েটা করে ফেলেই তো বলতে পারতে। হারামি...বাঁদর.. শুয়োর...কুত্তা...।'

অভিজিৎ তার মুখের উপর এসে পড়া ঘুঁষিগুলোকে হাত দিয়ে আটকাতে আটকাতে আটবছর আগের মতোই চেঁচিয়ে উঠল—'বাঁচাও... বাঁচাও..কে আছ?'

আমারও ঠিক কী হল বুঝলাম না। বুকের ভিতর থেকে চব্বিশ বছরের সম্রাটের মতো কে যেন হেঁকে বলল—'শা ন্তি...শা—ন্তি...।'

আবার প্রফেসর মুখার্জির কথা

অমি কান পেতে রই ও আমার আপন হৃদয় গহন দ্বারে বারে বারে
কোন্ গোপনবাসীর কান্না হাসির গোপন কথা শুনিবারে—বারে বারে
ভ্রমর সেথা হয় বিবাগী
নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে
কোন রাতের পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে—বারে বারে।

গানের গলা আমার কোনোকালেই ছিল না। জন্মলগ্নেই দেবী সরস্বতী চোঁয়া ঢেঁকুর তুলেছিলেন। আর তারপর থেকেই মোষের বাচ্চার মতো চাঁচাছোলা একখানা কণ্ঠস্বর নিয়ে আজীবন বাথরুম সিঙ্গার হয়ে থেকে গেলাম। গান শুনতে ভালোবাসি। মাঝেমধ্যে গুনগুন করে একলাইন কি দু-লাইন গাই। ওই পর্যন্তই! এর বেশি এগোলেই 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'। তাই নিজের গায়ক সত্তাকে মানবজাতির কল্যাণার্থে পেটেই চেপে রেখেছিলাম।

কিন্তু আজ কেমন করে জানি না নিজের গান নিজের কানেই ভালো লেগে গেল। বেশ সুরে গাইছি তো! নিখুঁত সুরটা না হলেও পুরোপুরি অ-সুর নয়। আসল সুরের কাছাকাছিই পর্দাগুলো লাগছে। অর্থাৎ আমাকে একেবারে বেসুরো বলা যায় না। যতই গলা দিয়ে ঠ্যাং ভাঙা মেলোডি বেরোক না কেন—সে মেলোডিই। অন্তত মেলোডি বলে তাকে চেনা যায়।

কথাটা মনে হতেই চড়াৎ করে উৎসাহটা সপ্তমে চড়ে বসেছে। গলায় জোর এনে কথাগুলো সুরে বসিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলাম—'ভ্রমর সেথা হয় বিবাগী/নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে—এ—এ—এ।'

প্রফেসর রুদ্র এতক্ষণ বাঁধা হাত দুটোকে বুকের উপর জড়ো করে

আধখানা চোখ মেলে ঝিমোচ্ছিলেন। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর রোজই ছোট্ট একটা বিউটি স্লিপ দিয়ে নেন। একটু চোখ মটকে নেওয়া আর কি! কিন্তু আজ আর সেটা হল না। গানের গুঁতোয় ঘাবড়ে গিয়ে—'কৌন...কৌন...।' করতে করতে উঠে বসলেন।

ইশ্! দিলাম ঘুমটা ভাঙিয়ে! নিজের উপরই ভয়াবহ রাগ হল। কী দরকার ছিল গাড়োলের মতো তেড়েফুঁড়ে সুরসাধনা করার! লোকটা একটু শান্তিতে ঘুমোচ্ছিল। তার একেবারে দফারফা।

—'কেউ না...কেউ না...আপনি ঘুমোন।'

প্রফেসরের বোধহয় কথাটা বিশ্বাস হল না। বিস্মিত বড়ো বড়ো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'কৌন গানা গা রহা থা?'

—'কেউ নয়।'

—'কোই নহি! লেকিন হামনে সুনা...।'

ওকে শান্ত করার জন্য বললাম—'আমি...আমি গাইছিলাম।'

—'তু?'

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন প্রফেসর। কয়েক গাছি পাকা চুল কপালের উপর এসে পড়েছে। বেশ কয়েকবার শ্যাম্পু করার পর এখন বেশ ফুরফুরে। ঘুম-ভাঙা-চোখে সরল বিস্ময়। ছোট্ট একটা তাই তুলে বললেন—'তু গা রহা থা!'

চুল আর দাড়ি ছোটো করো সাইজ করে দেওয়ার পর লোকটার বয়েস যেন দশ বছর কমে গেছে। একসময় কী অদ্ভুত সুপুরুষই না ছিলেন! সুগঠিত চেহারাটা যখন করিডোর ধরে হেঁটে যেত তখন মনে হত হৃৎপিণ্ডটার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। বেছে বেছে আমাকেই পাকড়াও করে বলতেন—'বিদ্যুৎ আগের দিন কী কী বলেছিলাম?' বলেই প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে এসে সটান সামনের হাইবেঞ্চে—'বলো?'

আর বলো! তখন বুকের ভিতরটা হাঁপর! গলা শুকিয়ে কাঠ। সামনেই কৌশিক রুদ্র সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। চোখের সামনে পাঞ্জাবির ভিতর থেকে উঁকিঝুঁকি মারা রোমশবুক। চাপদাড়ি আর গোঁফের মাঝখানে সুস্পষ্ট ঠোঁট। ঘেমেনেয়ই এক্সা। বলব কী?

—'কী হল বিদ্যুৎ? ব—লো?'

—'হ্যাঁ...স্যার।' কথাটা বলেই মনে পড়ল—কী বলছি! কেন বলছি!

—'তু গা রহা থা?'

—'হ্যাঁ, আমি।'

—'কিঁউ?'

—'এমনিই।'

উজ্জ্বল দুটো চোখের তারায় প্রশ্ন এঁকে আমায় দেখছেন প্রফেসর। আমার সমকামী জীবনের প্রথম নিষিদ্ধ প্রেম! প্রফেসর রুদ্র। স্বপ্নের মধ্যে কতবার তাকে লক্ষ লক্ষ চুম্বনের মালা পরিয়েছি। পাঞ্জাবির তলায় শরীরটা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল শূন্যের চেয়েও কম। তবু মনে মনে এঁকে নিতে অসুবিধে হয়নি। আধো ঘুমঘোরে তার নাভিতে চুমু খেতে খেতে রেখে গিয়েছি অকপট স্বীকারোক্তি—'আমি তোমায় ভালোবাসি, তোমায় ভালোবাসি, তোমায় ভালোবাসি...।'

আজও আমি তোমায় চাই। নয়তো একটা চিঠি এমন করে আমায় এখানে টেনে আনত না। তুমি আমায় ভুলে যেতে পেরেছ। আমি পারিনি। আমার রক্তমাংসের ঈশ্বর! হারিয়ে গিয়েও প্রচণ্ড অস্তিত্ব নিয়ে বুকের ভিতরে লুকিয়ে বসেছিলে। অনেক রাত ঘুমোতে দাওনি। অনেকদিন বেসুরো করে দিয়েছ। তাই ছুটে এসেছি। কই, আর কেউ তো আসেনি। যাদের উপর তোমার দাবি ছিল— তারা সেই দাবি নস্যাৎ করে ভুলে গেছে। আমি পারিনি। কখনো পাওয়া যাবে না বলেই বোধহয় এমন কাঙালের মতো তোমায় চেয়েছি। আজও চাই।

—'ফিরসে গা সক্‌তা হ্যায়?' প্রফেসর আচ্ছন্ন স্বরেই বললেন—'ওহি ধুন ফিরসে দোহরা সক্‌তা হ্যায়?'

সর্বনাশ! কাকে দিয়েছেন রাজার পার্ট! উনি সাংস্কৃতিক বিষয়ে চিরকালই ভয়ানক খুঁতখুঁতে। সেই লোক আমার মতো দগ্ধ কোকিলাহারীকে গান গাইতে বলছেন! স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গ রুচিবোধটাও কি গেল!

—'উয়ো ধুন্ ফির্‌সে একবার দোহরানা।'

বাধ্য হয়েই আবার শুরু করতে হল—'*আমি কান পেতে রই ও আমার আপন হৃদয় গহন দ্বারে বারে বারে...।*' সুরের ধরতাইটা যে যাচ্ছেতাইরকমের হচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রেখাব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, সপ্তম—শুদ্ধ কোমল—মুড়ি মিছরির একদর। তা সত্ত্বও প্রফেসর চুপ করে মন দিয়ে শুনছেন। কথাগুলো বুঝতে পারছেন কি না কিংবা অনুভব

করতে পারছেন কি না তাও বোঝার উপায় নেই। মাথাটা বুকের উপর নেমে এল। চোখ বোজা। খুব শান্ত সমাহিত হয়ে যেন প্রত্যেকটা লাইনের মর্মার্থ উদ্ধার করার চেষ্টায় ডুবে আছেন।

অদ্ভুত ব্যাপার! এবার কিন্তু হারিয়ে যাওয়া লাইনগুলো মনে পড়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করেও বিস্মৃতির গুহায় লুকিয়ে থাকা যে শব্দগুলোকে টেনে আনতে পারিনি, তারা যেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ধরা দিল—*'কে সে মোর, কেই বা জানে, কিছু তার দেখি আভা কিছু পাই অনুমানে, কিছু তার বুঝি না বা।'*

প্রফেসর রুদ্র মেঝের উপরেই আস্তে আস্তে শুয়ে পড়েছেন। চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজে আছেন। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েননি। ডান হাতের তর্জনী গানের তালের সাথে সাথে তাল মেলাচ্ছে। একেবারে ঠিকঠাক ছন্দে উঠছে নামছে। পায়ের পাতা লয় ধরে রেখেছে। তার মানে সুর, ছন্দ, তাল, লয়ের সেন্সটা আজও হারায়নি। কথাগুলো বুঝছেন কি না জানি না, তবে সুরটা যে বুঝছেন তা স্পষ্ট।

কিন্তু ধরো, কথাগুলোও যদি প্রফেসর বুঝতে পেরে থাকেন! লক্ষ করে দেখেছি বাংলাটা উনি সব সময়ে বলেন না ঠিকই, কিন্তু চমৎকার বুঝতে পারেন। এ গান বোঝার মতো ইন্টেলেক্টও ওঁর ছিল। আজ যদি কোথাও তার এক শতাংশও থেকে থাকে তবে এ গানের অর্থ ওর কাছে জলভাত। ধরো যদি তাই হত!

—'মাঝে মাঝে তার বারতা আমার ভাষায় পায় কি কথা রে/ও সে আমায় জানি পাঠায় বাণী গানের তানে লুকিয়ে তারে বারে বারে...।'

সুর সাধারণত নাভিমূল থেকে উঠে আসে বলেই শুনেছি। কিন্তু আমার ভিতর থেকে অন্য কিছু একটা উঠে আসছিল। সেটাকে আর যাই হোক সুর বলা যায় না। বরং সুরটাকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে অগোছালো করে দিচ্ছিল। কীসের একটা কষ্ট আলুলায়িত চুলে মাথা ঠুকছে, অবিরাম রক্তক্ষরণেও শান্ত হচ্ছে না।

গাইতে গাইতে কখন যে থেমে গেছি জানি না। কথাগুলো কোথায় যেন আবার হারিয়ে গেল। ভিতরের কষ্টটা আরো প্রবলতর হয়ে উঠছে। ভনা ঝাপটে ঝাপটে গরাদ ভাঙার চেষ্টা করছে।

প্রফেসর মেঝের উপর টানটান হয়ে শুয়ে আছেন। দুই ভুরুর মাঝখানে লম্বালম্বি একটা ভাঁজ। হাত দুটোর আঙুলগুলো ইতস্তত ঘুরে ফিরে চলেছে। জ্বরবিকারগ্রস্ত রোগীর মতো আশ্রয় খুঁজছে। পা দুটো প্রসারিত। সেই পা। প্রণামের ছলে একটু ছোঁয়ার লোভে কতবার যে পা দুটোর সামনে মাথা ঝুঁকিয়েছি তার হিসেব নেই। প্রণামের ধাক্কায় জেরবার হতে হতে স্যার হেসে ফেলে বলতেন—'এত প্রণামের ঘটা কেন রে? অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ জানিস তো?'

পা দুটো আমার সামনে পড়েছিল। কুণ্ঠিত হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম। গায়ের রোমকূপগুলো খাড়া হয়ে গেল। বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে উঠেছে। প্রফেসর বোধহয় টেরও পেলেন না। ভুরু কুঁচকে তিনি এখনো কিছু ভেবে চলেছেন। পা দুটো মোড়া দড়ি দিয়ে বাঁধা। চামড়ার সাথে এঁটে বসেছে। দড়িটাকে একটু সরিয়ে দিতেই চোখে পড়ল শিরার উপর ফোলা ফোলা লালচে দাগ। আঙুল বোলাতেই নড়ে চড়ে উঠেছেন। ব্যথা হয়েছে বোধহয়।

ব্যথা অংশে হাত বোলাতে বোলাতেই হঠাৎ মনে হল এই নির্জন দুপুরে একটু দুঃসাহসী হয়ে উঠলে কেমন হয়? কৌশিক রুদ্রর স্ত্রী বা প্রেমিকা থাকলে লোকটাকে কি একটু আদর করত না? আমি অন্তত তাদের চেয়ে ওঁকে অনেক বেশি ভালোবাসি। আর একটু আদর করার অধিকার আমার নেই?

প্রথমে আলতো করে একটা চুমু। কয়েক লক্ষের মধ্যে একটা। তারপর আরো একটা...আরো একটা...আরো একটা...। তীব্র থেকে তীব্রতর। প্রফেসরের মাথাটা নড়ছে। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছেন। শার্টের বোতাম-গুলো আস্তে আস্তে খুলে দিলাম। বুকের ভিতরটা কাঁপছে। কি জানি কি দেখব। এতদিন যা অদৃশ্য থেকেই পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে এসেছিল আজ তা প্রকাশিত হয়ে পড়লে তেমন ভালো লাগবে কি? যদি না লাগে!

এই সেই নাভি!—যার জমাট অন্ধকারে অবচেতনে কতবার ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি। যাকে কল্পনা করতে করতে বুকের মধ্যে রোমাঞ্চ এসে ধাক্কা মেরেছে। এই সেই বুক। তখন রোমগুলো কুচকুচে কালো ছিল। আজ ধবধবে সাদা। বুকের পাঁজরগুলো গোনা যায়। সূর্যের আলো এসে ছুঁয়েছে সাদা পশম। তাদের মাথায় ছোটো ছোটো আলোর কণা। ছোটো ছোটো স্ফুলিঙ্গের রোশনাই সারা বুক জুড়ে।

আরো একটু চুমু খেতে গিয়েই থেমে গেলাম। প্রফেসর চোখ মেলে

তাকিয়েছেন। দুনিয়ার সমস্ত দ্বিধা, কুণ্ঠা এসে ধাক্কা মেরে আমাকে সরিয়ে দিল। ধরা পড়ার ভয়ে ছিটকে চলেই যাচ্ছিলাম। তার আগেই ধড়মড় করে উঠে বসে প্রফেসর রুদ্র আমায় জাপটে ধরলেন। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বুকে মুখ লুকিয়ে বললেন—'উয়ো...উয়ো মুঝে মার ডালেগা...মৎ যা, কহি মৎ যা, মুঝে ছোড়কে কহি নেহি যায়েগা তু...ম্যায় বহুৎ তন্‌হা হু...অকেলা হুঁ।' ঝড়ে হি হি করে কাঁপা বাঁশপাতার মতো তিনি আমার দুই হাতের ভিতরে কাঁপছেন। ঘন আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে তার হৃৎস্পন্দন শুনছি। রুগ্ন, শীর্ণ পাঁজরের মধ্যে একটা শক্তিশালী হৃদয় ধুকপুক করছে। গভীর নিরাপত্তাহীনতার কথা শুনিয়ে যাচ্ছে।

প্রফেসরের চিবুক ডানহাতে চেপে ধরে মুখটা একটু উপর দিকে তুলে দিলাম। দু চোখে মৃত্যুভয়! দাড়িতে, চুলে সূর্যকিরণের লাল মেহেন্দি। শোকে, ভয়ে, অসহায়তায় কৌশিক রুদ্র অপূর্ব! অনিন্দ্যসুন্দর!

এতদিনের সংযমের রুদ্ধকপাট এক ধাক্কায় খুলে গেল। আমিও তো মানুষ!

ভদ্রলোক প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক কী হচ্ছে বুঝতে পারেননি। ঠোঁটের উপর আচমকা একটা ভিজে ভিজে কিছু এসে পড়ায় হাত দিয়ে বাধা দেবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আস্তে আস্তে উত্তেজনায় টান টান শরীর শিথিল হয়ে এল। চোখ দুটোও বুজে এসেছে। দুই জোড়া ঠোঁটের সাথে দুটো মানুষের ইচ্ছাশক্তিও মিলেমিশে একাকার।

শুরুতে প্রফেসরের শরীর ঝিমিয়েছিল। আমি একে একে তাকে আবরণমুক্ত করছি। উনি উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ব্যাপারটা দেখছেন। কোনো ভাব-ই ফুটছে না। যেন শরীরটা তার নয়। অন্য কারো। উনি তৃতীয় পক্ষ। তাকে চিত করে ফেলে চুমু খেতে খেতে মনে হল নীচের দেহটা কোনো মৃত মানুষের। যার কোনো চেতনা নেই, কোনো অনুভূতি নেই। অন্য কেউ হলে এই শীতলতায় বিরক্ত হত। কিন্তু আমার ভিতরে একটা উচ্ছ্বসিত আবেগ নেচে নেচে বেড়াচ্ছিল। কৌশিক রুদ্র, তুমি যৌবন পেরিয়ে এখন বার্ধক্যে। কিন্তু আমার তৃষ্ণার বয়স তিরিশ। সে আজও যুবতী। তোমার শরীর তাই আজ যৌবনের তাজমহল হয়েছে। চলো, কিছুক্ষণের জন্য তার আকাশ থেকে দুঃখ, শোকের কালো মেঘ সরিয়ে দিই। তোমায় আজ আমি আমার মতো করে ভালোবাসব। যা তুমি কোনোদিন কোনো নারীকে কাছে পাওনি, সেই অমৃত নিয়ে আমি, একজন ঘৃণ্য পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছি। আমার পূজা, আমার প্রেম

তোমায় গ্রহণ করতেই হবে। ভুলে যাও। ভুলে যাও এই পৃথিবী, এই সমাজ, গোলকোন্ডা ফোর্ট, জামশেদ, তার তলোয়ারের ভয়। ভুলে যাও। সব ভুলে যাও।

সত্যিই তিনি ভুলে গেলেন। তার শরীর হঠাৎই জেগে উঠল। আমায় আঁকড়ে ধরে বন্যার মতো উচ্ছ্বাসে নেমে এলেন আমারই মধ্যে। কিছুক্ষণের জন্য দমবন্ধ করা চুম্বনে বেঁচে উঠতে চাইলেন—আবার, আরো একবার, নতুন করে।

একটা নিটোল মুক্তো। গোলাপি আভা ঠিকরে পড়ছে। সৌন্দর্যের অহঙ্কারে পরিপূর্ণ। একবিন্দু ভালোবাসার শিশির জমে জমেই বোধহয় এমন মুক্তো তৈরি হয়। কিংবা অনেক অশ্রুবিন্দুর সমষ্টিও হতে পারে। যাই হোক না কেন, এই মুক্তো ভালোবাসতে জানে। দুঃখ দিতেও জানে।

—'এটা আমার জন্য!' মুক্তোটা হাতে নিয়ে বললাম—'কী বলে তোমায় ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না! ইট্‌স মার্ভেলাস।

–'No mention' সম্রাট ঘামে ভেজা শার্টটা খুলতে খুলতে বলল—'কৌশিকবাবু কেমন আছেন?

—'ভালো।' আমি ঝিনুকটা নেড়ে চেড়ে দেখছিলাম। বেছে বেছে সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিসটাই এনেছে। একটা বোজা চোখের সামনে জমে থাকা এক ফোঁটা স্ফটিকদানা—এভাবে ভাবা যায় জিনিসটাকে?

—'সারাদিনটা আজ কেমন গেল?'

লম্বা পা দুটোকে সেন্টার টেবিলের উপর তুলে দিয়েসে হাঁফ ছাড়ল। জলের বোতলটা টেনে নিয়ে বলল—'ভীষণ হেক্‌টিক গেছে প্রুফ। চাঁদিফাটা রোদ মাথায় নিয়ে বাজারে বাজারে ঘোরা, সে যে কী আপদ! তার উপর অবেলায় গচ্ছ গুচ্ছ মটন বিরিয়ানি...।'

—'তোমার অ্যাসিডিটির সমস্যা নেই তো?'

—'নাঃ। এখনো পর্যন্ত টের পাইনি। তবে আপনাকে খুব মিস করছিলাম।'

—'আমাকে! সে কী!'

—'আমরা রাস্তাঘাটে যা তা করে বেড়াচ্ছিলাম। ধমক দেওয়ার কেউ ছিল না। অবাধ স্বাধীনতা। আপনার সৌজন্যে সেটা তো আর হয়ে ওঠে না। তাই খুব মনে পড়ছিল?

তেরছা চোখে তাকিয়ে বললাম— 'Is it a complament? or ব্যঙ্গ?'

—'যা ভাবেন। ও বোতল থেকে জল খেল। থুতনি বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। রোদে ঘুরে ঘুরে তামাটে রংটা সামান্য পুড়েছে। চওড় কবজিতে একটা সাদা গোল দাগ।

—'সারাদিনে কী কী করেছ আজ?'

—'প্রথমে শপিং। তারপর লাঞ্চ। এরপর ড্রাইভারকে সাইডে বসিয়ে র‍্যাশ ড্রাইভিং। দু'বার সিগন্যাল ভেঙে, একবার খোদ ট্রাফিক পুলিশকেই প্রায় চাপা দিতে দিতে কোনোমতে বেঁচেছি। একগোছা টাকা ফাইন দিয়ে আসতে হল।'

—'চমৎকার। র‍্যাশ ড্রাইভিংটা কে করছিল? নিশ্চয়ই অভিজিৎ বা অর্ক নয়।'

—'নাঃ...ওরা নয়।'

—'দু-চারটে লোক চাকার তলায় পড়লে কী হত?'

—'কী আর হত! মরত।'

—'যদি অ্যাক্সিডেন্ট হত! এখানকার রাস্তাঘাটে বিশাল বিশাল ট্রাক ঘোরাফেরা করে। তার একটার সঙ্গে ধাক্কা লাগলে...!'

—'সিম্পলি মরে যেতাম। মাথার ঘিলু স্টিয়ারিঙে গিয়ে পড়ত, আপনাকে আমাদের লাশ শনাক্ত করার জন্য মর্গ কিংবা পুলিশ স্টেশনে দৌড়তে হত। এর বেশি কী আর হত?'

এসব কথাবার্তা শুনলেই বীভৎস লাগে। অথচ ও কী সুন্দর নির্লিপ্ত মুখে বলে গেল! এটা যেন কোনো ব্যাপারই নয়। এই বেঁচে আছি—এই পুটুস করে মরে গেলাম। পোকামাকড়ের মতো। যন্ত্রণা নেই। কোনো দুঃখ নেই। মরে যাওয়া, পিকনিকে যাওয়ার মতোই সহজ ব্যাপার।

—'তুমি বড়ো বেপরোয়া সম্রাট।'

সে বলল—'হতে পারি।'

—'মাঝেমধ্যে আমার মনে হয় তোমার মাথাটা ভেঙে দেখি তার ভিতরে কী আছে।'

—'চেষ্টা করে দেখতে পারেন। তবে খটখটে ঘুঁটে ছাড়া আর কিছু প্রাপ্তিযোগ হবে বলে মনে হয় না। তার চেয়ে মুক্তোটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন।'

—'এটা তো ঘুষ।'

—'মানে?'

—'আমি যাতে এর চেয়ে বেশি কিছু চাইতে না পারি সেইজন্য শুরুতেই মুখ এঁটে দেওয়া।'

—'Really?' সম্রাট এতক্ষণ চেয়ারের উপর কাত হয়ে পড়েছিল। এবার সোজা হয়ে বসে বলল—'তাহলে ঠিক কী করলে সত্যি সত্যিই আপনার মুখ আঁটা যাবে?'

—'মানে?'

—'আপনি ঠিক কী চান?'

—'What!'

—'Listen,' সে বলল—'I am a business man. Give and take policy-টাই বেশি পছন্দ করি। কারণ ওটাই আমি সবচেয়ে ভালো বুঝি। So...।'

—'So what?'

—'আপনি আমার কাছে কী চান? আমার প্রতি আপনার এই অ-যা-চি-ত স্নেহের পিছনে কী আছে তা আমি জানতে চাই? কী পেলে আপনি আমার উপকার করা ছাড়বেন?'

একটা জবরদস্ত ধাক্কা। কিছুক্ষণের জন্য কি বলব বুঝে উঠতে পারলাম না। মাথার ভিতরে একটা কথাই অনুরণিত হয়ে ফিরছিল—'কি চান?...কি চান...'

—'I am sorry...যদি তাতে তোমার অসুবিধে হয়ে থাকে।'

—'অসুবিধে নয় প্রফ। I am quite self sufficient. নিজের কাজটা নিজে করে নিতেই পছন্দ করি। তাই আপনার এই কাজ করে দেওয়াটা আমার কাছে ভীষণ embarrassing লাগে। সেটা দোষ নয়। অন্য কেউ হলে হয়তো appreciate-ই করত। But I can't, because I'm not that type.

—'ও:... Then I'm sorry for disturbing you। আমার অন্যায় হয়েছে।'

সম্রাট কাঁধ ঝাঁকাল—'আপনি আমায় ভুল বুঝছেন। আমি সেকথা বলিনি।'

—'তাই-ই তো বলছ। যা বলছ তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।' দাঁতে দাঁত চেপে বললাম—'তুমি ভীষণ দাম্ভিক সম্রাট। সব কিছুই Give and take policy-তে ভাবতে চাও না?' আমার চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা তোমার আছে সে কথা ভাবলে কী করে?'

—'আছে প্রফ। কারণ এখনো পর্যন্ত কাউকেই আমি ফেরাইনি। ক্যাশ, বাড়ি, গাড়ি, ফ্ল্যাট জীবনে ভোগের সব জিনিসই আমার হাতের মুঠোয়। শুধু বলেই দেখুন।'

—'এগুলো সবই Material desire।'

—'তাহলে আপনার desire-টা কি Spiritual? সে হো হো করে হেসে উঠল।

—'বাঃ, বেশ, বেশ। দিব্যি শরৎবাবুর নায়িকার মতো কথা বলছেন তো!'

মাথার রক্ত চড়াৎ করে ব্রহ্মতালুতে চড়ে গেল। এ ছেলেটা নিজেকে কী ভাবে! কয়েক কোটি টাকা পকেটে আছে বলেই সব কিছুকেই টাকার সাথে ওজন করবে। টাকা ছাড়া আর কিছুই কি ও বোঝে না!

ঝিনুকটা টেবিলের ওপর রাখা ছিল। সেটাকে তুলে নিয়ে ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম—'নাও। তোমার দেওয়া কোনো উপহার আমার চাই না। তোমার কাছে এই মুক্তোটার কাগুজে দাম যত, আমার কাছে তার অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও এটা ফেরত দিচ্ছি। সবকিছু টাকার বিনিময়ে কেনা যায় না সম্রাট। এটা যেদিন বুঝবে সেদিন এটা দিয়ো—নেবো। কিন্তু এখন আমি চাই না। নিয়ে যাও।'

সম্রাট দুর্বোধ্য হাসল। ঠোঁটের একপাশে ছেলেমানুষি ঝিলিক।

—'আমি জানি প্রফেসর।' আমার চোখে চোখ রেখে বলল—'অনেক কিছুই টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায় না। যা যায় না তা আমি চাই না। আমার মনে হয় আপনাকে বোঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বুঝলে ভালো হত। না বুঝলেও কিছু করার নেই। Let's slip over in this issue.' আমার বুক পকেটে ঝিনুকটা আবার ঢুকে গেছে। বুক পকেটের উপর আলতো চাপড়—'Keep it baby।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বেরিয়ে গেল।

অর্ক একমনে ডাইনিং হলের ঝাড়টার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল। ঝলমলে কাচের বাতিদানগুলোর গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারুকাজ। পলকাটা টুকরোর হিরের সাতরঙা দ্যুতি ঠিকরে এসে চোখে লাগছে। ডাইনিং হলের দেওয়ালে সুদৃশ্য কাচের ঢাকনায় মোড়া আরো অনেক আলো আছে। কিন্তু ডিনার টাইম

ছাড়া ওগুলোকে বিশেষ জ্বলতে দেখিনি। জ্বলার অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনও নেই। একটা ঝাড়বাতিই সমস্ত হল আলো করেছে। এরমধ্যে অন্য আলো জ্বালা মানে—বেশি বাড়াবাড়ি।

—'ধুত্তোর।' অভিজিৎ এতক্ষণ খবরের কাগজের শেষ পাতাটা খুব মন দিয়ে পড়ছিল। এবার সেটাকে টেবিলের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়েছে—'কোনো খবর নেই। ফালতু ফালতু পেপার ছেপে কালি নষ্ট করে কেন? না ছাপলেই তো পারে।'

সম্রাটের সাথে কথা কাটাকাটি হওয়ার পর থেকেই মুড অফ হয়েছিল। আক্রমণটা যে এদিক থেকেও আসতে পারে তা সত্যিই ভাবিনি। আসলে ওকে বুঝতে আমার ভুল হয়েছিল। বয়সে সে নবীন হতে পারে কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব কিংবা আত্মসচেতনতা আদৌ নবীনের মতো নয়। ভীষণভাবে দাম্ভিক এবং আত্মকেন্দ্রিক। একটা নির্দিষ্ট বৃত্তে লক্ষ্মণরেখা টেনে রেখেছে। তার বেশি এগোলেই রেড সিগন্যাল।

অর্ক ঝাড়বাতি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল—'একদম নেই তা তো নয়!'

—'হ্যাঁ আছে। করবেট পার্কে দুটো হরিণ মরেছে বলে মানেকা গান্ধী কেঁদেকেটে ভাসাচ্ছেন, একটা পালোয়ানের ছ'টা বউ আর ৩৯টা ছেলেমেয়ে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্বর আর সানিয়া মির্জা পাত্তা ছাড়া নাস্তা করেন না। বুলশিট।'

—'ভাগ্যিস তুই রিপোর্টার হোসনি অভি। তাহলে খবরের কাগজের ডেরাডান্ডা উঠে যেত।'

—'রিপোর্টার হওয়ার কথা কখনো ভাবিনি বুঝলি।' অভিজিৎ হাসল—'ছোটোবেলায় একটাই স্বপ্ন ছিল। বড়ো হয়ে কাপড়ের ব্যবসা করব।'

মন খারাপ ছিল বলে ওদের কথাবার্তায় এতক্ষণ কর্ণপাত করিনি। কিন্তু অভিজিতের কথাটা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল। এতকিছু থাকতে শেষে কাপড়ের ব্যবসা! কেন? ছেলেবেলায় লোকে রোম্যান্টিক স্বপ্ন দেখে। পাইলট হওয়ার কথা ভাবে, ডাক্তার, মহাকাশ গবেষক হওয়ার কথা ভাবে। যারা একটু বেশিই রোম্যান্টিক তারা আবার ট্রেনের ড্রাইভার, বাসের হেল্পার হতে চায়। কিন্তু কাপড়ের ব্যবসা! নাঃ—এটা অভিনব নজির।

—'হঠাৎ কাপড়ের ব্যবসা?'

অভিজিৎ যেন প্রশ্নটা আশাই করেছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—'শখে ভাবিনি স্যার। বিপদে পড়েই ভেবেছিলাম।'

—'মানে?'

—'আমার বাবার ছোট্ট একটা চায়ের দোকান ছিল। আমরা তিন ভাই। আমি মেজো। বাবার রোজগারও তেমন কিছু ছিল না। বুঝতেই পারছেন। নুন আনতে পান্তা ফুরোত। একদিন পেটে প্রচণ্ড খিদে নিয়ে বাবার দোকানের সামনে বসে দেখছি সামনের দোতলা বাড়ির বারান্দায় বসে আমার বয়সিই একটা ছেলেকে তার মা আহ্লাদ করে করে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে খাওয়াচ্ছে। ছেলেটা খেতে চাইছে না। মা তাকে 'চিচিং ফাঁক'-এর গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে ভুলিয়ে ভুলিয়ে খাওয়াচ্ছে।' অভিজিৎ একটা 'কিংসাইজ' ধরিয়েছে। দু আঙুলের ফাঁকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী—'ছেলেটার বাবার কাপড়ের দোকান ছিল বড়োবাজারে। তার মায়ের ফর্সা রং, গোলগাল চেহারায় সোনার হার, সোনার বালা ঝকমক করত। আমার মা কুচকুচে কালো। মাথায় তেল না পড়ে চুল রুক্ষ। আহ্লাদ তো দূরের কথা একটু যত্নও কোনোদিন করতে পারেননি। ছোটোবেলায় নুন, তেল আর একটু হলুদ দিয়ে একথালা ভাত মেরে দিতাম। কখনো কখনো বেগুনপোড়া, কিংবা একতাল আলুসেদ্ধ জুটত। কখনো জুটত না। তাই দোতলা বাড়ির মালিককে দেখেই ঠিক করলাম বড়ো হয়ে কাপড়ের ব্যবসা করব।' সে ফিকফিক করে হাসছে—'So sily না?'

অভিজিতের কাছে হয়তো ব্যাপারটাকে হাস্যকর মনে হয়েছে। কিন্তু আমাদের একটুও হাসি পেল না। অর্ক চোখের উপর আঙুল রেখে চোখ বুজে আছে। আমি বললাম—'তারপর?'

—'তারপর?' অভিজিৎ আয়েশ করে বলল—'তারপর আর কী? আস্তে আস্তে বয়স বাড়ল। বাবা তার জীবনে একটাই বিলাসিতা করেছিলেন। তিন ছেলেকেই স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। বাড়ির কাছে ধ্বজা মার্কা স্কুলে ভর্তি হলাম। সে আর এক বিপদ। খারাপ স্কুল হলেও সেখানে অনেক অবস্থাপন্ন ঘরের মাথামোটা ছেলে পড়ত। তারা টিফিন আনত, খেত। আর আমরা বসে বসে দেখতাম। টিফিনটাইমে প্রচণ্ড খিদে পেত। তখন সামনের ছেলেটা পাঁউরুটি, ডিমসেদ্ধ কিংবা ফল খাচ্ছে। জুলজুল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।'

—'কিন্তু কাপড়ের ব্যবসার প্ল্যানটা ছাড়লে কবে?'

—'ও...হ্যাঁ...ওটা আবার আরেক গল্প।' অভিজিৎ নড়েচড়ে বসে বোধহয়

সে গল্পটাও বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারল না। মূর্তিমান বাধা প্রায় হুড়মুড় করে মাঝখানে এসে পড়েছে।

—'অর্ক, বাথরুমের ফ্ল্যাশটা গেছে ভাই। কী করি বলো তো!'

দাসবাবু এমনিতে সন্ধেবেলাটা তার পরিবারের তদারকিতেই ব্যস্ত থাকেন। তাই বড়ো একটা নীচে নামেন না। আজ তাকে হুড়মুড় করে আসতে দেখে একটু অবাকই হয়েছিলাম। সাংসারিক বুটঝামেলা থেকে একটু ফুরসত পেয়েছেন ভেবে ভালোও লাগছিল। কিন্তু সে ভাব বেশিক্ষণ টিকল না।

—'কেন? একদম কাজ করছে না?'

—'নাঃ।'

—'মিস্টার চক্রবর্তীকে বলেছেন?'

—'মিস্টার চক্রবর্তী।'

—'সোমভদ্র চক্রবর্তী—ম্যানেজার।'

—'না, কোথায় পাওয়া যাবে ওঁকে?'

—'চলুন দেখি।' অর্ক অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়ে—'তোরা বস, আমি আসছি।'

—'ব্যস...হয়ে গেল আড্ডার দফারফা।' অর্কর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে অভিজিৎ বলল—'অর্ক আর মি. চক্রবর্তীকে ঈশ্বর রক্ষা করুন।'

কথাটা খুব মিথ্যে বলেনি। মেয়েরা একটু ন্যাগিং হয় সেটা জানতাম। শুনেছি বিয়ের পর সেটা আরো বাড়ে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলেও কথাটা যে এক শতাংশ হলেও সত্যি তা মিসেস দাসকে দেখেই বুঝতে পারছি। অমন শান্তশিষ্ট নিরীহ স্বামীটিকে ব্যতিব্যস্ত করে না তুললে যেন মহিলার পেটের ভাতই হজম হয় না।

—'পিসটাকে দেখে এখন বিয়ে করতেই ভয় হয়।' সে সিগ্রেটটাকে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল—'এরকম একটা কপালে জুটলে সারাজীবনটাই পেছন ফাটা জিন্‌স।'

—'মিসেস দাসকে তুমি বোধহয় একেবারেই পছন্দ করো না।'

—'ঠিক তা নয় স্যার।' ওর হাতের আঙুলে উলটো চামড়া উঠছে। অনেকক্ষণ ধরেই সেখানে আঙুল বোলাচ্ছিল। এবার দাঁত দিয়ে চামড়া কাটতে কাটতে বলল—'মালটা আমায় কখনোই লেঙ্গি মারেনি, আঁচড়ে, খামচেও দেয়নি। কিন্তু মাগিটার ছেনালিপনার জন্যই দু চক্ষে দেখতে পারি না।'

শব্দটা 'খট' করে কানে বাজল। আমি সচরাচর যে পরিবেশে থাকি বা যে ধরনের কথাবার্তা শুনে অভ্যস্ত তার মধ্যে এমন শব্দ একেবারেই শোনা যায় না। অতিমার্জিত শালীনতাবোধ কোথাও যেন একটা ধাক্কা খেল।

—'সেদিন ঢ্যামনামিটা দেখলেন? এমনিতে তো সম্রাটকে খিস্তিখাস্তা করে বাকি রাখে না। জানেন রামোজি ফিল্ম সিটি থেকে ফেরার সময় কী নিন্দেটাই না করল! মুখে মদের গন্ধ! চরিত্তির খারাপ! পেট থেকে টপকে পড়ার সাথে সাথে এদের মেরে ফেলা উচিত—আরো কত কী! সেদিন যেই শুনেছে মালদার অমনি মদের গন্ধ ইউক্যালিপ্টাসের খোশবু হয়ে গেছে। লকলকে জিভ দিয়ে ওর দিমাগ চেটে ফর্সা না করা অবধি শান্তি নেই।'

আমি নুনের পাত্রটা নাড়াচাড়া করছিলাম। জিনিসটা বেশ সুন্দর। ছোট্ট একটা কুকুর হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করে দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ক্যাপ। লাল টুকটুকে টুপিটা শতছিন্ন। ওখান দিয়েই নুন পড়ে।

সরেজমিনে পরীক্ষা করে জিনিসটাকে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললাম—'মাথায় চড়তে না দিলেই তো হল।'

—'এসব মহিলাদের আপনি চেনেননি স্যার। এরা মাথায় চড়ে শালা...।'

—'তোমার আর দুই ভাই কী করে অভিজিৎ?'

অভিজিৎ মুচকি হাসল। হঠাৎ এই প্রসঙ্গ টেনে আনার কারণটাও যে সে বুঝেছে তা তার বঙ্কিম হাসিতে স্পষ্ট।

—'বড়দার S.T.D.-I.S.D. বুথ। ছোটোটা প্রোমোটারি করে ভালোই পয়সা করেছে।'

—'তোমরা সবাই এক বাড়িতেই থাকো?'

—'নাঃ। আমি আর মা-বাবা এক বাড়িতে থাকি। বাদবাকিদের সাথে সম্পর্ক নেই।'

—'সম্পর্ক নেই!'

—'রাখিনিই বলতে পারেন।' সে থুতনিতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল—'আসলে আমার সোসাইটি, আমার লাইফ স্টাইলে ওরা ঠিক খাপ খায় না। তা ছাড়া আমার ওসব পোষায়নি। হতে পারে নিজের ভাই, কিন্তু সব শা-লা সুবিধাবাদী। চাকুরে ভাইয়ের ঘাড় ভেঙে ফুর্তি করতে জানে। আমাকেও তো নিজের ভবিষ্যৎটা ভাবতে হবে। আমারও তো একটা জীবন আছে। ধর্মশালা তো আর খুলে বসিনি।'

তা বটে! এখন সকলেই নিজের কথা ভাবে। ও যদি ভেবে থাকে তাহলে এমন কি অন্যায় করেছে? তা ছাড়া এখন আর সে যুগ নেই। আমাদের সময়ে একান্নবর্তী পরিবারের খুব চল ছিল। বাবা নিতান্তই ছাপোষা স্কুলমাস্টার ছিলেন। সামান্য কটা টাকা মাইনে পেতেন। তা সত্ত্বেও দিব্যি চলে যেত। জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো দাদা-দিদিদের সাথে একই খাবার খেয়ে, একই জামাকাপড় পরে থেকেছি। কখনো কোনো অভিযোগ ছিল না। যা পেয়েছি তাতেই সন্তুষ্ট। যা খেয়েছি তাতেই পেট ভরেছে। মন ভরল কি না তা ভাবার অবকাশ পাইনি।

এখনো সেই বুড়ো জ্যাঠতুতো দাদার জন্মদিনে মিষ্টির বাক্স নিয়ে হাজির হই। পাঁঠার মাংস খেতে ভালোবাসি। তাই আমার সত্তর বছরের দাদা কাঁপা কাঁপা হাতে বাজার থেকে মাটন কিনে আনে।

আসলে হাঁড়ি আলাদা হওয়াটা বোধহয় বড়ো ব্যাপার নয়। হৃদয়টা আলাদা হয়ে গেলে এক অন্নের হাঁড়ি তা ঠেকাতে পারে না। এই সাইবার যুগে সকলেই আলাদা আলাদা হৃদয় নিয়ে জন্মায়। সে হৃদয় মিশতে জানে না, অন্য কারো সাথে এক হতে জানে না। সম্রাট কিংবা অভিজিতের দোষ নেই। ওরা কম্প্রোমাইজ করতে শেখেনি। মানিয়ে নিতে শেখেনি। স্বার্থ ছাড়া বাংলা অভিধানে যে আরো কয়েকটা শব্দ আছে—সহানুভূতি, সহমর্মিতা বলেও যে কয়েকটা কথা আছে, তা ওরা জানে না। হয়তো উপলব্ধিও করতে পারে না।

—'নাঃ খিদে পেয়েছে, ভাবছি কোনো চাইনিজ রেস্টোরান্টে ঢুকে পড়ব?' অভিজিৎ উঠে দাঁড়িয়েছে, 'যাবেন নাকি স্যার?'

—'চলো।'

—'এতক্ষণ কোথায় ছিলেন আপনারা?'

সোমভদ্র চক্রবর্তীর উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে ঘাবড়ে গেলাম। এতক্ষণ একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া সারছিলাম। অভিজিতের সঙ্গে গল্পে গল্পে অনেকটা সময় কেটে গেছে। ফেরার পথে টুকিটাকি শপিং করতেও অনেকটা সময় গেছে। এদিককার খবর কিছুই জানি না কিন্তু হল কী? কারো কিছু হল নাকি? অর্ক আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে? না প্রফেসর রুদ্র...?

—'এই একটু বাইরে গিয়েছিলাম। কেন?'

--'তার মানে আপনারা জানেন না। উপরে হুলুস্থুল কাণ্ড হচ্ছে।

আপনাদের টিমের মিস্টার চৌধুরী...।'

মিস্টার চৌধুরী! মানে সম্রাট। হৃৎপিণ্ডটা ধক করে উঠল। তার কী হল? এখন তো তার মদে ডুবে থাকার কথা! মাতাল হয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে পড়ে যায়নি তো!

—'কী হয়েছে সম্রাটের?'

—'অনেক কিছু হয়েছে। বলার সময় নেই। শিগগির উপরে চলুন।' তিনি আর কথা না বাড়িয়ে লিফ্‌টের দিকে দৌড়েছেন। তার পিছন পিছন আমরাও। যান্ত্রিক ঘরঘর শব্দ করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

—'দেখুন, আমি নিজেও পরিষ্কার জানি না যে ব্যাপারটা ঠিক কী। তবে এইমাত্র একজন বয় দৌড়তে দৌড়তে এসে জানাল যে মিস্টার চৌধুরী আপনাদের অপজিটে ছশো দুই নম্বর ঘরের মিসেস মজুমদারকে যাচ্ছেতাই-ভাবে অপমান করেছেন। মারধর করেছেন। অশ্রাব্য গালিগালাজও করছেন।'

ছশো দুইয়ের মহিলা! আলাপের সৌভাগ্য হয়নি। তবে কয়েকঝলক দেখেছি মাত্র। স্বামী-স্ত্রী আর একটা বাচ্চা মেয়ে—ভারী মিষ্টি! কিন্তু সম্রাট হঠাৎ ওই মহিলাকে নিয়ে পড়ল কেন! যাকে চেনে না তাকে গায়ে পড়ে অপমানই বা করতে যাবে কেন?

পুরো ব্যাপারটাই কেমন যে তালগোল পাকিয়ে গেছে। ভাবতে পারছি না। কিচ্ছু ভাবতে পারছি না। একটু আগেও তো এমন ঘটনা ঘটার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না! এর মধ্যে এমন কী ঘটল যে...!

—'ভদ্রমহিলার স্বামী বিজনেস করেন। এখানে কোনো ডিলের ব্যাপারে এসেছেন। বিকেলে একজন বড়োসড়ো মালদার পার্টি এল। তারপরই বেশ কয়েকবার হুইস্কি আর খাবার দাবারের অর্ডার এসেছে। তার তদারকিতেই ব্যস্ত ছিলাম। এদিকে হঠাৎ এমন কাণ্ড...আপনি বুঝতে পারছেন—এতে হোটেলের রেপুটেশন কতটা..।'

লিফ্‌টের মাথায় 'ছয়' সংখ্যাটা লাল হয়ে জ্বলে উঠেছে। ভিতর থেকে গোলমালের শব্দ কানে এল। দরজা খুলে যেতেই আওয়াজটা আরো বাড়ল। অনেক লোকের সমবেত চেঁচামেচির শব্দ। তার মধ্যেই স্পষ্ট সম্রাটের মদ্যপ কণ্ঠস্বর!

—'ই-উ ব্লাডি বি-চ! এক বাচ্চার মা হয়ে ফূর্তি করা হচ্ছে! কুত্তি...।'

—'হাউ ডেয়ার ইউ! আপনি আমার স্ত্রীকে এভাবে অপমান করতে

পারেন না।'

—'একশোবা-র পারি, হাজার বার পারি। বাজারের মেয়েছেলের আবার অপমান কী বে! ব্লাডি প্র-স্টি-টি-উ-ট। ভদ্দরলোকের বাড়িকেও সোনাগাছি করে তুলেছে।'

—'সম্রাট...ইউ আর ড্রাঙ্ক! তোর মাথার ঠিক নেই। কী করছিস? চল... ঘরে চল!...'

—'ছেড়ে দে অর্ক। তুই জানিস না। ওর পেটেও একটা বাস্টার্ড আছে। আরো একটা ব্লাডি বাস্টার্ড! সব মেয়েছেলে এক...শা-লা...জিভ সবসময় লক্‌লক্ করছে। এক বাচ্চার মা হয়ে ছাতে দাঁড়িয়ে সোয়াইনটার সাথে লদ্‌কালদ্‌কি।' সম্রাট পিচ করে একদলা থুতু মহিলার মুখের উপর ছিটিয়ে বলল—'রাণ্ডু ছিঃ!'

যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই ভদ্রমহিলা তখন আতঙ্কে প্রায় সাদা। সামনে শক্তপোক্ত চেহারার ক্ষিপ্ত লোকটা দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ঢুকতেও পারছে না। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্বামীটি আদতে পুরুষ না অন্য কিছু বোঝা দায়। সম্ভবত যে 'সোয়াইনটার কথা হচ্ছে সে বিপদ দেখে কেটে পড়েছে। আশেপাশে তামাশা দেখার লোকের অভাব নেই। দরজার সামনে রীতিমতো ভিড় জমে গেছে। ভদ্রমহিলার স্বামী গর্জাচ্ছেন। কিন্তু বর্ষানোর সাহস নেই। তবু চিড়বিড় করতে করতে বললেন—'বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন কিন্তু...।'

—'চোপ শা-লা! হিজড়ে! নিজের বউকে অন্য লোকের বিছানায় রোজগার করতে পাঠাস! আবার বড়ো বড়ো কথা! কী করবি। কী করবি তুই।' ঠাস ঠাস করে লোকটাকে এক রাউন্ড চড় মারতে মারতে বলল—'কী করবি? মারবি? পুলিশ ডাকবি? ডাক! শুধু পুলিশ কেন, পুলিশের বাপ, ঠাকুরদা, চোদ্দোপুরুষকে ডাক।'

বুঝতে পারছিলাম না কী করব? সম্রাটের চোখ টকটকে লাল। তার আচার আচরণে সব সময়ই একটা মোলায়েম আভিজাত্য থাকে। যাকে বলে 'গুড ম্যানার্‌স।' সেই সম্রাটের মধ্যে এমন আদিম রূঢ়তাও থাকতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাসই হত না। সোমভদ্র ছুটে গিয়ে তাকে চেপে ধরলেন—'মিস্টার চৌধুরী...কী করছেন? আপনি সুস্থ নন। চলুন রুমে চলুন। একটু রেস্ট নেবেন।'

সম্রাট যেন সোমভদ্রকে তোয়াক্কাই করল না। তাকে ঝেড়ে ফেলে সে

আবার মহিলার উপর চড়াও হয়েছে—'তুই মা!...তুই মা!...তুই ডাইনি!...বল... বল কত টাকা পেয়েছিস তুই? কত টাকা? কত টাকা পেলে তুই বিছানায় যাবি? ...ওপন্ আপ...সতী লক্ষ্মী!...বল...কত টাকা পেলে আরো একটা বাস্টার্ড পয়দা করবি?...বল...বল...।'

সোমভদ্র উপায়ান্তর না দেখে সম্রাটকে পেছন থেকে জাপটে ধরেছেন। কিন্তু তিনি ছোটোখাটো চেহারার মানুষ। অতবড়ো ছ'ফুট চার ইঞ্চির গাঁট্টাগোট্টা লোকটাকে সামলাতে গিয়েই রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন দেখে অভিজিৎ আর অর্কও এগিয়ে গেল। অবশ্য তাতেও বিশেষ সুবিধা হল না। ওদের সমবেত শক্তিকে অগ্রাহ্য করে সম্রাট বারবার তেড়ে যাচ্ছে মহিলার দিকে। পারলে যেন আঁচড়ে কামড়ে ফালাফালা করে দেয়।

—'তুই মা! মা হয়েছিস!...ডাইনি...ছেনাল...প্রস্টিটিউট...শা-লা...।'

এই অসম যুদ্ধ কতক্ষণ চলত জানি না। আরো কিছুক্ষণ চললে অবধারিতভাবে রক্তপাত হতই। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমার ভূমিকা নিতান্তই দর্শকের। হাঁ-করে দেখছি অর্ক, অভিজিতরা অসহায়ভাবে বারবার পরাস্ত হচ্ছে সম্রাটের জান্তব শক্তির কাছে। একদল খরগোশ যেন উন্মুক্ত বাঘের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

—'কাকু!'

কয়েকটা মিষ্টি সুরেলা শব্দ। শুধুমাত্র শব্দই। আর কিছু নয়। অথচ অদ্ভুত সম্মোহনী সুরের মতো কাজ করল। মদ্যপ, উন্মত্ত, মানুষটার মস্তিষ্কে সে ধ্বনির অনুরন কী ম্যাজিক করল জানি না। কিন্তু এইবার সম্রাট থমকে দাঁড়াল।

—'কাকু, তুমি মাকে মারছ কেন?'

সম্রাট তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। এইবার ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়েছে। সামনেই চূড়ান্ত অপমানিত তার মা। মেয়ের চোখে চোখ রাখতে পারছেন না। মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে রক্তাভ মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

ছোট্ট মেয়ে! ছোট্ট ছোট্ট দুটো হাত। সেই ছোট্ট হাতেই সম্রাটের জিন্‌স আঁকড়ে ধরে ব্যাকুল স্বরে বলল—'তুমি মাকে মারছ কেন?...মা কি দুষ্টু করেছে?'

সম্রাট যেন স্তম্ভিত! মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় গেল তার উত্তেজনা! কোথায় তার সেই উগ্র উন্মত্ততা! সে আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে

ধপ করে তার সামনে বসে পড়ে। যেন আত্মসমর্পণ কিংবা ক্ষমাপ্রার্থনা করছে। মেয়েটার হাত দুটো তার বলশালী হাতের মুঠোয় কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

—'তুমি মাকে মেরেছ কেন? তুমি একটা পচা। তোমার সাথে আমার আড়ি যাও। আড়ি আড়ি-আড়ি।'

সম্রাটের মুখে অদ্ভুত সস্নেহ একটা হাসি ভেসে উঠেছে। মেয়েটার নরম হাত নিজের বুকের উপর চেপে ধরে কপালে চুমু খেল। শান্তভঙ্গিতে তার মুখে, মাথায় হাত বুলিয়ে উঠে দাঁড়াল। মেয়েটার বাবা তখনো তড়পাচ্ছেন। বারবার বলছেন 'দেখে নেব,' 'পুলিশ ডাকব', 'কোর্টে কেস করব' ইত্যাদি। সম্রাট শুনেও শুনছে না। যে ঘটনা এতক্ষণ এখানে ঘটছিল যেন তার কিছুর মধ্যেই সে নেই। গায়ের জ্যাকেটটা হেঁচকা হেঁচকিতে খুলে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। নির্লিপ্ত, শান্তভঙ্গিতে তুলে নিয়ে ধুলো ঝাড়ল। তারপর সেটাকে কাঁধের উপর ফেলে টলতে টলতে রুমের দিকে এগোল।

—'সম্রাট...আয়। আমার কাঁধে ভর দিয়ে চল। তোর পা...।'

অর্ক কথাটা সম্পূর্ণ করার সাহস পেল না জ্বলন্ত চোখে কটমটিয়ে সম্রাট তার দিকে তাকিয়ে আছে।

—'না...মানে...তুই যদি নিজেই যেতে পারিস তাহলে আলাদা কথা।'

সে আস্তে আস্তে দেওয়ালে ভর দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল। পা কাঁপছে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে! তা সত্ত্বেও গোঁয়ারের মতো অদম্য জেদে অনেকবার পড়তে পড়তে আর বহুবার নিজেকে সামলাতে সামলাতে সে ফিরে গেল। আমরাও ফিরে আসছিলাম। কিন্তু সোমভদ্র অর্ককে ডেকে নিলেন। ফিসফিস করে বললেন...

—'ব্যাপারটা মিস্টার মজুমদারের সাথে কথা বলে মিটমাট করে নিন। দরকার পড়লে মিস্টার চৌধুরীর পক্ষ থেকে অ্যাপোলজি চেয়ে নিন। নরম কথায় আপস করে নিতে পারেন কি না দেখুন। Otherwise সত্যি সত্যিই থানা, পুলিশ, কোর্ট হলে বিশ্রী কাণ্ড ঘটবে। আমার হোটেলেরও বদনাম হবে। বোঝেনই তো।'

অর্ক বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল—'ঠিক আছে, চলুন দেখি, কী করা যায়।'

ভেবেছিলাম বেশ কড়া করে একটু বকে দেব। আজকে ও যা করেছে, তা যে রীতিমতো অন্যায়। সে জানে ওর হওয়া উচিত। এ কাজের সমালোচনা

সহ একটা ধমক খাওয়াও দরকার। নয়তো এই উন্নাসিক ঔদ্ধত্যের মাশুল ওকে নয়, আমাদের সবাইকে গুনতে হবে। সম্রাটের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স প্রায় হিমালয়। এসব ঝুঁচরো উপদ্রব হয়তো সে ঝেড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমরা টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত। ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের পাহাড় না থাকলেও আত্মসম্মান প্রায় আকাশচুম্বী। তাতে কালি লাগা তো দূরের কথা, কালো ছায়া পড়লেও শিউরে উঠি। তাই ভাবছিলাম সোজা বলে দেব— 'তোমার সমস্যা তোমার কাছেই রাখো ভাই। অন্তত আমরাও যাতে সেই সমস্যায় পড়ি এমন কিছু কোরো না। যদি এরপর তা করো তবে তুমি একাই এই ঘরে থেকো, আমি আর তোমার ব্যাপারে নেই।'

কিন্তু ঘরে পা দিয়ে বুঝলাম আমার অমন ভালো ভালো কড়া কথাগুলো আজও হজম করতে হবে। সম্রাট বিছানার উপর টানটান হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। না..বোধহয় ভুল বললাম। ঘুমোয়নি। নেশায় অচেতন হয়ে পড়ে আছে। ঘুম মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য শান্তি এনে দেয়। কিন্তু এই ঘুমন্ত তরুণ মুখটার কপালে বলিরেখার মতোই স্পষ্ট কয়েকটা দুশ্চিন্তার ভাঁজ। কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছি নাকি! গায়ের ভারী জ্যাকেট গায়েই আছে। পায়ের জুতোজোড়াও পায়েই। সবসুদ্ধ নিয়েই এ-সি-র ভিতরেও ঘেমে গলে জল হচ্ছে। চন্দনফোঁটার মতো ঠোঁটের উপর আর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

পুরো ঘরটাই অগোছালো হয়ে পড়েছিল। বিছানার চাদরটা মাটিতে লুটোচ্ছে। তাকিয়া, বালিশ সব মাটিতে। সোফার কুশনগুলোর উপর দিয়ে যেন হাতি চলে গেছে, এতটাই বিধ্বস্ত তারা। সকালের ছাড়া জামাকাপড়, অন্তর্বাস সোফার উপর প্রদর্শনী সাজিয়ে বসেছে। গোটা দুয়েক বাচ্চা রামের বোতল বিছানায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। আমি সুপার সাইক্লোন বিধ্বস্ত ভূ-খণ্ডে দাঁড়িয়ে ভাবছি কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায়। রেগে গেলে জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলা সম্রাটের বদভ্যাস। তা-ও ভালো এবার ফুলদানি আর মদের বোতলগুলো ছুঁড়ে ফেলেনি। তাহলে কেলেঙ্কারিয়াস কাণ্ড হত।

ছেলেটার মাথায় হাত রাখলাম। গরম ভাপ উঠে আসছে। মাথার ভিতরটাও ঘামছে। এই মোটকা জিন্‌সগুলো খুলে দেওয়া একান্ত দরকার। কিন্তু আমার একার সাধ্যে কুলোবে কি? দেখি একবার চেষ্টা করে। গুরুটা জুতো থেকে করাই ভালো। অবশ্য হিজ হাইনেসের হঠাৎ পা ঝাড়া দেওয়ার মর্জি হলে কী হবে বলতে পারব না। তবু সে রিস্কটুকু নিতেই হবে।

অতএব কাজে লেগে গেলাম। প্রথমেই জুতোটাকে নিয়ে পড়েছি। জুতোর গিঁট খুলতে খুলতেই বেশ মজা লাগল। নিজেকে কেমন হিন্দি ফিল্মের সতীসাধ্বী নায়িকা মনে হচ্ছে না। মদ্যপ, লম্পট স্বামী রাতের বেলা নেশার ঘোরে উলটে পড়েছে। আর তার সতীলক্ষ্মী স্ত্রী 'পতি পরম গুরু' বাণী আওড়াতে আওড়াতে তার পায়ের জুতো খুলে যত্ন করে শুইয়ে দিচ্ছে। হিন্দি সিনেমায় মীনাকুমারী, নিরুপা রায়দের এমন দৃশ্যে অভিনয় করতে বহুবার দেখেছি। মেলোড্রামাটিক সেন্টিমেন্টে দর্শকরা চোখে রুমাল গুঁজে ফোঁচফোঁচ করছে। আর আমার পেট ফেটে গেছে হাসিতে। প্যাঁও প্যাঁও করে বাজা করুণ রসের বেহালাও সে হাসি আটকাতে পারেনি।

কিন্তু আজ আমি নিজে কি সেই হাস্যকর কাজটাই করছি না! সম্রাট আজ সকালে যে কথাগুলো বলেছে তা তো অত্যন্ত বাস্তব। তা সত্ত্বেও কথাগুলো এত গায়ে লাগল কেন? বুঝি সব কাজে আমার এগিয়ে যাওয়াটা ওর পছন্দ নয়—তাও কেন এগিয়ে যাই? কেন রাতবিরেতে নিজের ঘুমের বারোটা বাজিয়ে মাতাল, নড়বড়ে মানুষটাকে ঘরে ফিরিয়ে আনি! আমার কী দায় পড়েছে? ও আমার কে? একি শুধুই সমকামীর ঘৃণ্য, ক্ষমার অযোগ্য শরীর-তৃষ্ণা। শুধুমাত্র একটা সুগঠিত পুরুষশরীর পাওয়ার জন্যই কি এতকিছু করছি আমি! সম্রাট, তুমি কি শুধুই শরীর!

—'আপনি ঠিক কী চান প্রফ?'

কী চাই সম্রাট! কী চাই?...কী চাই?

—'কী চাই আমি?'

এটাও একটা প্রশ্ন। যখন শিক্ষার্থী ছিলাম তখন পরীক্ষার খাতায় সব প্রশ্নের উত্তর লিখে আসতাম। এমনকি সাজেশনের বাইরের প্রশ্ন হলেও দিব্যি আন্দাজে আন্দাজে উত্তর দিতাম। কোনো প্রশ্নই কখনো ছেড়ে আসিনি। কিন্তু এই প্রশ্নটা আমার কমন। সাজেশনের বাইরেও নয়। অত্যন্ত চেনা। অথচ উত্তরটা জানা নেই। কড়া ইনভিজিলেন্সে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করলেও ওপেনবুক এক্সামে ডাহা ফেল।

বালিশের তলায় ঘড়িটা ছিল। রেডিয়ামের ঔজ্জ্বল্যে দেখলাম এখন প্রায় তিনটে বাজে। অথচ ঘুমের দেখা নেই। কয়েকশো সমুদ্রের ঢেউ আর শ-খানেক ভেড়া গুনে উলটো একশো থেকে মাইনাস একশোয় পৌঁছেও

দেখলাম ঘুম আসছে না। খালি খালি চোখ মেলে বিছানায় শুয়ে থাকতেও কেমন বোকা বোকা লাগছিল। তাই অনেকক্ষণ ঘুমের সাথে ধস্তাধস্তি করে শেষ পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠেই পড়েছি। পাঞ্জাবিটা মাথার কাছেই ছিল। একটু হাতড়াতেই পাওয়া গেল। চশমাটাও পড়ে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম।

বেরনোমাত্রই হালকা চমক। এমন সুন্দর রাতে শুধু আমি একাই জেগে নই। আরো একজন রয়েছে। ড্রেসিং গাউন পরা একটা পুরুষমূর্তি আমার দিকে পিছন ফিরে করিডোরের কাচের দিকে তাকিয়ে চুপ করে আছে। অস্থির তামাকের ধোঁয়া তার হাত, নাক, মুখ বেয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে সারা বারান্দায়।

—'অর্ক। ঘুমোওনি!'

—'কে? চমকে পিছনে ফিরল অর্ক। আমায় দেখে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে বলল—'ওঃ...প্রফেসর। আপনি?'

—'হ্যাঁ, ঘুম আসছে না। তাই ভাবলাম বেরিয়ে পড়ি।'

অন্ধকারের মধ্যে তার মুখভঙ্গি দেখা গেল না। কিন্তু স্পষ্ট বুঝলাম সে বিব্রত হাসছে—'ভালোই করেছেন। চুপচাপ শুয়ে থাকারও কোনো মানে হয় না।'

—'তা হয় না। তা ছাড়া যা বিশ্রী গরম।'

ছোট্ট একটা 'হুঁ' দিয়েই আমার কথায় সম্মতি জানাল অর্ক।

—'আজ বিকেলের সমস্যা মিটেছে?'

—'হ্যাঁ মিটেছে। প্রথমে একটু রোয়াব দেখাচ্ছিল। অনেক ধানাইপানাই করার পর ওকে ওকে করতে করতে চলে গেল।' সে সিগারেটের টুকরোটাকে বাইরে ফেলে দিল।

—'তবে অত মাখন বোধহয় না মারলেও চলত। থানা পুলিশ করার মতো বুকের পাটা নেই। লোকটাকে সম্রাট যেভাবে একতরফা ঠেঙিয়ে গেল তাতেই ওর দম বোঝা গেছে।

—'হঠাৎ মারতেই বা গেল কেন?'

—'এসব বিজনেস ডিলিংসের ব্যাপার স্যার। একটা কন্ট্রাক্ট পাওয়ার পিছনে অনেক নোংরামি থাকে। লোকটার বউ আর একটা লোক ছাতে উঠে ঢলাঢলি করছিল। ওরা তো আর জানে না যে ছাতটা শ্রীমান সম্রাটের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য!'

—'যাই হোক না কেন, ওটা ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সম্রাট কাজটা ঠিক করেনি।'

অর্ক এবার স্পষ্ট হাসল—'ঠিক কি বেঠিক—সে তো পরের কথা। কিন্তু ওকে Appreciate করার লোভ সামলাতে পারছি না।'

—'Appreciate! Why?'

—'যা ইচ্ছে তাই করার সাহস খুব কম লোকেরই থাকে। কাউকে মারার ইচ্ছে হল। দুমদাম মেরে দিলাম। খিস্তি দিতে ইচ্ছে হল, দিয়ে দিলাম। একটা মেয়েকে ভালো লাগল। খুব করে তার সাথে পুর্তি করলাম। আবার যখন পোষাল না, ছুড়ে ফেলে দিলাম। এসব করা চাট্টিখানি কথা নয়। মনের জোর আর বুকের পাটাও লাগে। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের মধ্যে একটাই সম্রাটই বোধহয় সবচেয়ে বেশি Independent।'

—'আর তুমি?'

—'আমি?'অর্ক হেসে উঠল—'চোখের সামনে এতবড়ো শিখলটা থাকতে প্রশ্নটা করতে পারলেন?'

—'শিখল! তিস্তাকে তোমার শিকল মনে হল?' একটু মজা করে বললাম—'অমন ডানাকাটা পরি বউ আমার থাকলে সারাজীবন তার পায়ের কাছে অসুর হয়ে থাকতেও রাজি হতাম।'

—'ডানাকাটা পরি।' ও ছোট্ট একটা নিঃশ্বা ফেলে বলে—'শিকল সোনারই হোক, কি লোহার হোক—সে শিকলই। বিয়ে থা করেননি, বুঝবেন না।'

—'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস/ও পারেতে সর্বসুখ, আমার বিশ্বাস। তুমি বিয়ের লাড্ডু খেয়ে পস্তাচ্ছ ভাই, আর আমি না খেয়ে।'

অর্ক মুচকি হেসে মুখ ফেরাল। কাঁধের উপর আলতো চাপ দিয়ে বলল— 'চলুন, এভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে ওপাশে চেয়ার আছে। বসা যাক।'

করিডোরের একপাশে সুন্দর গদিওয়ালা চেয়ার আছে। তার সামনের জানলা দিয়ে হায়দরাবাদের মেইন রোড দেখা যায়। সেইখানে গিয়েই দুজনে বসলাম।

—'কফি খাবেন না কি?'

—'এত রাতে কফি?' চোখ ব্রহ্মতালুতে তুলে বলি—'শেফ আর বয়রা তো বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছে। কফিটা বানাবে কে? তুমি নাকি?'

—'ধরুন তাই।'

—'তুমি বানালে খাব না। একেই অভিজিৎ আজ যা চাউমিন খাইয়েছে তাতে সারাজীবন আর ও জিনিস মুখে তুলছি না। কিন্তু কফি আমার খুব প্রিয় পানীয়। তাই ওটা ছাড়তে চাই না।'

সে আবার জোরে হেসে উঠল—'ছাড়তে আপনাকে হবে না। ডাইনিং হলে একটা কফি মেশিন আছে। ওটাতে সব সময় কফি available। বলেন তো নিয়ে আসি।' মাথা নেড়ে জানালাম যে আপত্তি নেই। অন্তত তাতে না ঘুমোনোর ক্লান্তিটা কাটে। সারারাত জেগে থাকার পর সকালে কীরকম ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা হবে তা প্রায় মানসচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। তার উপর যদি সাইড এফেক্ট হিসাবে মাথাধরা আর গা ম্যাজম্যাজও থাকে, তাহলেই একেবারে সোনায় সোহাগা।

অর্ক সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে নেমে গেল। ও আজকাল প্রায়ই রাত জেগে থাকে নাকি? এর আগে একদিন সম্রাটকে ঘরে ফেরাতে গিয়ে ওকে করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। গতকাল রাতেও বারান্দায় পায়চারি করছিল। ইদানীং একটু যেন রেস্টলেস। সেই স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসটাও নেই। তিস্তার সাথে একটু ছোটোখাটো কথা কাটাকাটি হয়েছে কয়েকদিন আগে। কিন্তু তেমন স্বাভাবিক খিটিমিটি তো সব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই হয়ে থাকে। সাময়িক একটি বিষণ্ণতা থাকলেও সেটা স্থায়ী নয়। যতই মনোমালিন্য থাক না কেন, পাশাপাশি দুটো গনগনে যৌবন থাকলে, তারা এক না হয়ে পারে না। তবে এমন কী হল যে তরুণী, রূপসি বউকে একা বিছানায় ফেলে তার স্বামী রাতের বেলা বারান্দায় এসে পায়চারি করছে! এমন কী ভয়ানক দুশ্চিন্তা ওর মাথায় এসে ভর করল!

হঠাৎ একঝলক ঠান্ডা বাতাস গায়ে এসে ঝাপটা মারতেই সতর্ক হয়ে গেলাম। সারা বিকেল আকাশটা মুখ গোমড়া করেছিল। ভ্যাপসা ভ্যাপসা, প্যাচপ্যাচে গরম। ছাই ছাই রঙের জলভারাক্রান্ত মেঘ এককোণে এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল অপেক্ষমান জংলি হাতির মতো। মাঝেমধ্যে চিড়িক চিড়িক করে বিদ্যুতের চেরা জিভও ঝলসে ঝলসে উঠছে। শহরের ঘুমন্ত উঁচু উঁচু অট্টালিকার মাথায় চমকে চমকে উঠে কঙ্কালসার আঙুলে দিক্‌নির্দেশ করে বলছে—'ওই যে...ওই যে...ওখানে...ওখানে।'

—'ওখানে কী?'

—'ওখান দিয়ে সে আবার আসছে?'

—'কে আসছে?'

—'কড়।'

—'নিন।'

দু হাতে গরম কফির কাপ। কড়া গন্ধ। ধোঁয়া ওঠা পানীয় আধার থেকে চলকে উঠেছে।

—'খেয়ে নিন গরম গরম।' অর্ক আমার হাতে কফির কাপ ধরিয়ে দিয়ে পাশের চেয়ারে বসল। কফিতে আলতো চুমুক মেরে আরামসূচক আওয়াজ করল—'আঃ।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। কুচকুচে কালো অন্ধকারে দুটো মানুষ পাশাপাশি বসে আছে। অথচ কোনো শব্দ নেই। কফিতে চুমুক দেওয়ার আওয়াজও প্রায় শোনাই যায় না। এত কাছাকাছি আছি, অথচ মাঝখানে নৈঃশব্দ্যের কী সীমাহীন দূরত্ব! পাশেই আছে অর্ক। হাত বাড়ালেই ওকে ছোঁয়া যায়। একটু আন্তরিক হয়ে বলাই যায়—'কী হয়েছে তোমার?' কিন্তু আড়ষ্টতা যেন চিনের প্রাচীর হয়ে দ্বিখণ্ডিত করে রেখেছে দুটো অনুভূতিকে। পাশাপাশি এসে সহানুভূতি দেওয়ার জো পর্যন্ত নেই।

—'You know Sir?' নীরবতা ভাঙল অর্কই—'সম্রাটকেই আমার মাঝেমধ্যে ঠিক বলে মনে হয়।'

চুপ করে পরবর্তী প্রসঙ্গের অপেক্ষা করছি। বোধহয় ও কিছু বলতে চায়। হয়তো বলবেও। সে সুযোগ ওকে দেওয়া যাক।

—'অভিজিৎ কী করবে জানি না। তবে সম্রাট আমাদের মতো নয়। ও সারা দুনিয়াটাকে নিজের মর্জিমাফিক চালাতে পেরেছে। আমরা পারিনি। অন্যের খেয়াল, খুশি, মান, অভিমানের হিসেব রাখতে রাখতে নিজের ইচ্ছেটুকুও বিসর্জন দিয়েছি। আদর, স্নেহ দিতে দিতে এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে যে খেয়ালই করিনি প্রিয় মানুষটার কাছে তার কোনো দাম আছে কিনা।'

—'হঠাৎ একথা কেন?'

অর্ক আবার নীরব হল। নিশ্চুপে কফিতে কয়েকটা চুমুক দিয়ে আবার বলল—

—'বাবা মারা যাওয়ার সময় আপনি এখানে ছিলেন?'

—'না, কোচবিহারে ছিলাম। তবে খবর পেয়েছিলাম, ওঁর সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছিল। তুমি চিকিৎসার ত্রুটি রাখোনি সে খবরও আমার কাছে পৌঁছেছে।'

সে ধীরে মাথা নাড়ছে—'সেরিব্রাল স্ট্রোকে বাবা মারা যাননি।'

চমকে উঠলাম। সেরিব্রালে মারা যাননি! তবে যে আমি খবর পেলাম!

—'তবে?'

অনেকখানি রহস্যময়তা নিয়ে মনের গোপন অন্দরে অর্ক কিছুক্ষণ ডুবে রইল। ভিতরে ভিতরে কথাগুলো হয়তো হাতড়ে হাতড়ে জড়ো করল। অস্থির সময় লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে টিকটিক করতে করতে শেষের পথে চলেছে। প্রতীক্ষার প্রতিক্ষণ দুলে দুলে উঠে শিরশিরে কম্পন বয়ে আনছে।

—'বাবার মৃত্যুর কারণ একাকিত্ব। কথা বলতে ভালোবাসতেন। কথার মানুষ ভালোবাসতেন। সবচেয়ে ভালোবাসতেন আমাকে। কিন্তু শেষ ছ'মাস কেমন যেন চুপ মেরে গেলেন। এমনকি দরকার ছাড়া মায়ের সাথেও কথা বলতেন না! নিঃসঙ্গতাজনিত অসুখ।'

এর কারণটা আমার অজানা নেই। স্যারের সাথে দেখা সাক্ষাৎ না হলেও প্রথমদিকে টেলিফোন মারফত যোগাযোগ ছিল। তখনই খবর পেয়েছিলাম অর্করা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। শাশুড়ির সাথে নতুন বউমার বনছে না। মা ও তিস্তা দুজনেই অর্কর ক্ষেত্রে মারাত্মক পসেসিভ। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে এক ছাতের তলায় থাকা প্রায় অসম্ভব। স্যারের কণ্ঠস্বর ভীষণ হতাশ লেগেছিল। অভিমান ঘন কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছিলেন—'ছেলে আমার বড়ো হয়েছে। এখন আর বাবা-মা নিয়ে থাকলে চলবে কেন? এতখানি জীবন তো কাটিয়েছে আমাদের সঙ্গে। বাকি জীবনটা না হয় স্ত্রীর সাথেই কাটাল। এটাই বাস্তব বিদ্যুৎ, আমি মেনে নিয়েছি। তোর কাকিমা এখনো পারেনি। কিন্তু একসময় মেনে নেবে।'

অর্ক আরো একটু সময় নেওয়ার জন্য থামল। হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে। একটু বেশিই যেন স্মোক করছে কয়েকদিন ধরে।

—'সেদিন মাঝরাতে আমাদের ফ্ল্যাটের ফোন বাজল। খবর পেয়েই হসপিটালে দৌড়লাম। বাবা তখন আই.সি.ইউতে। কাচের দরজার ভিতরে পুরোদমে অ্যাকশন চলছে। বাবার মুখটা একপাশে কাত করা। চোখ মেলে

সেই শেষবারের মতো আমায় দেখছেন।' অর্ক আমার হাতের উপর হাত রাখল। হাতের আঙুলগুলো ঘামছে। একটু একটু কাঁপছেও।

—'সেই চোখ দুটোর সাথে চোখ মেলানোর হিম্মত ছিল না। অদ্ভুত দৃষ্টি। বাবা যেন বলতে চাইছিলেন—'কী দেখছিস অর্ক? বেঁচে আছি কি না? কী হবে দেখে? বাবার প্রয়োজন তো আর তোর নেই।'

অর্ক মুখ তুলে তাকাল। মনে হল ও আমার কাছে কিছু চাইছে। হয়তো একটু সান্ত্বনা, একটু উষ্ণতা।'

—'তুমি তো চেষ্টা করেছিলে অর্ক।'

—'হয়তো। কিন্তু বাবাকে বাঁচাতে পারিনি। যে নিঃসঙ্গতায় তার দমবন্ধ হয়ে এসেছিল সেই নিঃসঙ্গতা কাটাতে পারিনি। শেষ জীবনে এতবড়ো আঘাত তাকে আমিই দিয়েছিলাম...সেই গল্পটার মতো...বাবার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে প্রেমিকাকে...।'

বাদবাকি কথাগুলো ও বলতে পারল না। ঠোঁট কামড়ে ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের তালু ঠান্ডা, আর্দ্র। জোরে জোরে শ্বাস ফেলে ভিতরের উচ্ছ্বসিত আবেগকে লঘু করার চেষ্টা করছে। সমুদ্রের ঝড়ে উত্তাল তরঙ্গকে শান্ত করার জন্যে গর্জন তেলের স্রোত যেমন জলে ছড়িয়ে পড়ে তেমনই একটা ঠান্ডা নীরবতা চতুর্দিকে ছেয়ে যাচ্ছিল।

—'তিস্তার জন্যে আমি বাবা-মাকে ছেড়েছি। মা একা থাকেন। অসহায়। ভীষণ ইচ্ছে করে মাকে আমার কাছে এনে রাখি। কিন্তু তিস্তা চায় না।'

—'স্বাভাবিক। তোমার মা যদি সর্বক্ষণ আমার ছেলে, আমার ছেলে করেন তবে তিস্তা বেচারি যায় কোথায়? তারও তো স্বামীর প্রয়োজন। তার জন্য তুমি তাকে দায়ী করতে পারো না।'

—'দায়ী করছি না।' সে খানিকটা আত্মস্থ হয়ে বলল—'হিসাব করছি। হিসাব করছি আমি তিস্তার জন্য কী কী করেছি। আর তিস্তা আমার জন্য কী কী করেছে।'

—'হিসাব কোরো না অর্ক। কোনো সম্পর্ক হিসাবে চলে না। বিশেষ করে যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে হিসাব করা বোকামি।' কথাটা বলেই শিউরে উঠলাম। এই তো! এই তো আমার প্রশ্নের উত্তর! এতক্ষণ ধরে যা খুঁজছিলাম! এত সহজে কী করে বেরিয়ে গেল! এত স্বাভাবিক, আটপৌরে হয়ে কথাটা আমার বুকের মধ্যে শুয়েছিল। অথচ ওকে যে আমি গরুখোঁজা খুঁজছিলাম।'

—'হয়তো।' অর্ক অল্প হাসল। কিন্তু বিশেষ আশ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। সে উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বলল—'নাঃ...এখন চলি। আপনিও শুয়ে পড়ুন।'

—'হ্যাঁ, আমিও যাব,' আমিও উঠলাম—'তবে এতদিন বাদে এসব ভেবে মনখারাপ কোরো না। এতখানি জীবন এখনো পড়ে আছে। এনজয় করো। পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। তাতে তিক্ততাই বাড়বে।'

—'পুরানো কথা আমি মনে করতে চাইনি স্যার। কিন্তু প্রোফেসর রুদ্র...।'

'প্রোফেসর রুদ্রর চোখদুটোয় অবিকল আমার বাবার শেষের দৃষ্টি।' অর্ক যেন কেঁপে উঠল—'সেই হতাশা, অবিকল সেই অভিমান। ওঁর চোখে আমার বাবা তাকিয়ে থাকেন। বারবার মনে করিয়ে দেন যেন আমিই তার খুনি। আমিই আমার বাবাকে খুন করেছি। তাঁকে আমিই মেরে ফেলেছি...আমিই...।'

শোঁ শোঁ করে একটা শব্দ। পরক্ষণেই পাগলের মতো দমকা হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাচের উপর। ধুলোবালির কালো কালো কণা হাওয়ার সাথে ঘুরতে ঘুরতে এসে ঝাপটা মারছে চোখেমুখে। জামার স্তরে স্তরে জমে যাচ্ছে।

তবু আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি বারান্দায়। খানিকটা হয়তো খ্যাপার মতো, খানিকটা বোকার মতো। দুজনে দাঁড়িয়ে আছি—নিষ্কম্প, নির্বাক স্থির।

...সম্রাট!...সম্রাট!...

তুমি কি টের পাচ্ছ কেউ তোমার বুকে মাথা রেখেছে? অনুভব করছ কি তোমার বুকের ভেজা নরম রোমগুলো কারো মুখ ছুঁয়ে যাচ্ছে? হৃৎপিণ্ডের খুব কাছাকাছি একজোড়া ঠোঁট নীরব হয়ে কিছু বলতে চায়? যে অভদ্র ঠোঁট একদিন তোমার অচেতনে নিমগ্নতার সুযোগ নিতে চেয়েছিল, হায়নার মতো সেই কুৎসিত ঠোঁট-জোড়া আজ কিছু বলছে। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। শোনো...শোনো...শুনছ? সম্রাট!...সম্রাট...।

তুমি বড্ড সুন্দর। আর সেটাই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। নাঃ, কন্দর্পের মতো পেলব সুন্দর নও। উল্কার মতো সুন্দর। অমোঘ সর্বনাশের মতো সুন্দর। প্রথম দর্শনেই চোখ ধাঁধিয়ে দাও। হতাশায়, দুঃখে, নেশায় সে সৌন্দর্য আরো দ্যুতিময় হয়ে ওঠে। নাগমণির বিষাক্ত আলোয় সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষা অন্ধ হয়ে যায়। কামনাকে ছোবল মেরে বিষে বিষে অস্থির করে তোলে। তাই পতঙ্গের মতো তোমার শরীর, যৌবনের আগুন সবাইকে টেনে নেয় সর্বনাশের পথে।

আমি গিয়েছিলাম। আমিও শরীর চেয়েছিলাম একটা জন্তুর মতন। সম্রাট, তুমি আমায় কয়েক মুহূর্তের জন্য পশু করে তুলতে পেরেছিলে।

কিন্তু তখনো বুঝিনি তুমি নিজেই কী ভয়ঙ্কর নেশা। রূপের ছটায়, জৈব আকর্ষণে বুঝতে ভুল হয়েছিল। যতক্ষণ সে চমক আমার চোখে সয়ে যায়নি ততক্ষণ তোমার শরীরের ভিতরের তোমাকে দেখতে পাইনি। যে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিলে তিলে বিষ খেয়ে যাচ্ছ, তার গুরুত্ব বুঝতে পারিনি। অপরিসীম দম্ভ আর অহঙ্কারের বোঝাই দেখেছি। তার ভিতরের পরাজিত সৈনিককে দেখিনি। তার রহস্যময়তা, খামখেয়ালিপনা দেখেছি। কিন্তু অস্থির আতঙ্ককে দেখিনি।

আজ সবই আমার চোখের সামনে একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে। মনে হয় আর একটু এগোলেই তোমায় দেখতে পাব। আর কয়েকটা দরজা ভাঙলেই তোমায় পাওয়া যাবে। যেখানে অন্ধকারে ডুবে একা দাঁড়িয়ে আছ, সেখানে পৌঁছানো যাবে। আর কিছু চাই না, শুধু তোমায় সেইভাবে একবার দেখতে চাই। রক্তাক্ত ক্লান্ত, বিধ্বস্ত তোমায় শুধু একবার, একবার দেখতে চাই, আর কিছু নয়। আর কিছু না।

আর হ্যাঁ...খুব জরুরি কথা কি না জানি না। কিন্তু প্রফেসর রুদ্রর পর তুমিই দ্বিতীয় মানুষ, যে আমার সারাদিনটা মাটি করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আমি আমার শূন্য জীবনে তোমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি সম্রাট। জানি না, তুমি কখনো আমার প্রয়োজনীয়তা বুঝবে কি না। কিন্তু আমি বুঝি। 'ভালোবাসি' বলে শব্দগুলোকে আর ক্লিশে করব না। কারণ ভালোর চেয়েও অনেক ভালো তোমায় বাসি। এ ভালোবাসা কেউ বুঝবে না। তাকে কোনো সম্পর্ক, কোনো পরিচয় দেওয়া যায় না। তার কোনো গন্তব্য স্থান নেই। সমাজের কাছে সে ব্রাত্য, কলঙ্কিত। তাই সেকথা আর নাই-ই বা বললাম। অন্ধখনির ভিতরে কয়লার কালো হয়েই সে থাক। বার করে কাজ নেই।

—'তুই নিজেকে ভাবিসটা কী?'

ব্রেকফাস্ট টেবিলে অর্ক সম্রাটকে প্রায় একহাত নিল। আগের দিন রাতে সে যাই বলে থাক না কেন বাস্তব সাংসারিক জীবনে তার প্রভাব যে আদৌ পড়েনি তা বুঝলাম তার কথাবার্তায়—'তোর উৎপাতে হোটেলের বোর্ডাররা টিকতে পারছে না। অন্য লোক ব্যক্তিগত জীবনে কী করছে না করছে তা তোর

দেখারকী দরকার? নেহাত সোমভদ্রবাবু মানুষ ভালো তাই বেঁচে গেলি। অন্য কেউ হলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে হোটেল থেকে বের করে দিত।'

সম্রাট মাথা নীচু করে নির্লিপ্ত মুখে ডিমের পোচ খাচ্ছিল। মাঝেমধ্যেই তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে। এমনিতেই সকাল থেকে মেজাজ খারাপ। সকালবেলায় সোমভদ্র চক্রবর্তী এসে নরম অথচ তেজালো কয়েকটা কথা শুনিয়ে গেছেন, যা আদৌ তার ভালো লাগেনি। হোটেলের কর্মচারীরাও তাকে দেখে মুখ টিপে হাসছে। করিডোরে, ডাইনিং হলে অন্য বোর্ডারদের ফিসফাস। স্বাভাবিক গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্বে সেগুলো গায়ে না মাখলেও একটা প্রভাব তো পরেই। তার উপর অর্কর বকুনি। সম্রাটের যা স্বভাব তাতে সে যে এতক্ষণ চুপচাপ ভর্ৎসনা সহ্য করে যাচ্ছে সেটাই আশ্চর্যের।

—'তোর এই খামখেয়ালিপনার জন্য একদিন আমরা বিপদে পড়ব সম। এটা কি তোর জমিদারি না মগের মুলুক! কথা নেই বার্তা নেই, একটা লোককে দুমদাম পিটিয়ে দিলি। এক মহিলা, যাকে চিনিস না, জানিস না তাকে কুৎসিত গালিগালাজ করে দিলি। এসব কী? তা-ও আমি আর সোমভদ্রবাবু মিলে কোনোমতে সামাল দিলাম। নয়তো...।'

এইবার সে মুখ তুলল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—'এই দয়াটা আমি করতে বলিনি। যা করেছিস নিজে করেছিস। আমায় শোনাচ্ছিস কেন?'

—'মানে?' রাগে অর্কর মুখ লাল হয়ে গেছে—'শোনাচ্ছি মানে? জানিস কাল তুই কি ম্যাসাকার করেছিস? ভদ্রলোক আরেকটু হলেই কেস করতে যাচ্ছিলেন।'

—'যাচ্ছিলেন তো আটকাচ্ছে কে? Let him go to the court।'

অর্ক তেলেবেগুনে জ্বলে প্রায় চিৎকার করে উঠল—'Let him go to the court.! তারপর? হাতে হাতকড়া পড়ত। জেলের ভাত খেতে হত। সেটাই ভালো হত তাই না?'

—'Far better. অন্তত তোর কথা শুনতে হত না।'

—'তুই...।'

—'শ্ শ্ শ্ শ্...।' ঠোঁটে আঙুল রেখে সম্রাট বলল—'আস্তে অর্ক। এত চড়া সুর আমার পছন্দ নয়।' ঠান্ডা ইস্পাতের মতো কঠিন অথচ শীতল দৃষ্টি চতুর্দিকে একবার বুলিয়ে নিয়ে আবার বলে—'শোন, কাল রাতে যা যা করেছি তা আমার পরিষ্কার মনে আছে। তার জন্য একটুও অনুতপ্ত নই। সুযোগ পেলে

এ কাজ আবার করব। আমার behaviour-এ তোদের কোনো problem হয়ে থাকলে বল। I will search for another place।'

অর্ক কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে—'ব্যস হয়ে গেল। প্রবলেম সলভ্‌ড। সুন্দর সমাধান। আর কিছু বলারই নেই।'

তিস্তা এতক্ষণ কিছু বলেনি। রোজ সকালে ব্রেকফাস্টে একগ্লাস ফলের রস খাওয়া তার অভ্যাস। দৈহিক সৌন্দর্য আর ত্বকের চেকনাইয়ের জন্য অনেকেই এই অভ্যাসটা রাখে। সে-ও রেখেছে। একগ্লাস মোসাম্বির জুসে চুমুক দিতে দিতে এতক্ষণের কথা কাটাকাটি শুনছিল। এবার বলল—'সম্রাট, অর্ক সে কথা বলেনি। তুমি ভুল বুঝছ।'

—'Please তিস্তা, তোমার কাছে explanation চাওয়া হয়নি। So, চুপ করে থাকলেই খুশি হব।'

—'এই...তুই আর একটা কথাও বলবি না।'

অর্ককে এত রেগে যেতে আমি আগে কখনো দেখিনি। প্রচণ্ড রাগে তার কান লাল হয়ে গেছে। ফর্সা মুখে লালচে আভা—'যথেষ্ট হয়েছে। কী ভেবেছিস? যা খুশি করার ক্ষমতা তোর আছে? কালকের ঘটনার জন্য আমাদের কথা শুনতে হচ্ছে। কাল রাত থেকে আজ সকাল অবধি—এই কয়েকঘণ্টায় তোর জন্য যথেষ্ট হ্যাপা গেছে আমাদের। তোর জন্য আমাদের হাসির খোরাক হতে হচ্ছে।'

—'তোকে আমার দায় ঘাড়ে তুলে নিতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছিল? আমার সমস্যা আমারই। আর কারো নয়। আমি যা করছি বা বলছি তার দায় সিম্পলি আমার—সম্রাট চৌধুরীর। যদি অর্কবাবু তার মধ্যে হামলে পড়ে সেটাকে নিজের ঘাড়ে টেনে নেন তাহলে সেটা তার অনধিকার চর্চা। এই sense-টা তোর আছে? কে বলেছিল ওই লোকটার কাছে ক্ষমা চাইতে? তা-ও আবার আমার হয়ে! Apology-র নামে ওই হারামিটার কাছে আমাকে ছোটো করলি কী অধিকারে? আমার বাপও যে কাজ করতে সাহস পেত না, সে কাজ করার রাইট তোকে কে দিল?'

'রাইট? রাইটের প্রশ্ন ওঠে না। যা করেছি তোর ভালোর জন্যই করেছি।'

—'Damn your ভালো। কে বলেছে তোকে আমার ভালো করতে আমার ভালো করার তুই কে? Who are you?'

অর্ক বিস্ফারিত চোখে সম্রাটের দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে। বুঝতে

পারছিলাম যে দুই বন্ধুর বচসায় সম্রাট মাস্টারস্ট্রোক খেলে দিয়েছে। এই কথার পর অর্কর চুপ করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ও দুহাতে মুখ আড়াল করেছে। আমরা পুতুলের মতো বসে কাণ্ডটা দেখছি। বন্দনা মুখ মুখ নীচু করে একটা ছুরি দিয়ে টোস্টের উপর পুরু মাখনের স্তর লাগাচ্ছে। আর একটা একটা করে সবার প্লেটে রাখছে। সমবেত স্তম্ভিত মানুষের মধ্যে একমাত্র সে-ই কর্তব্যে অবিচল।সম্রাটের প্লেটে একটা টোস্ট রেখে নিষ্প্রাণ গলায় বলল—'আর লাগবে?'

সম্রাট ঘাড় ঘুরিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল—

—'না।'

—'অভিজিৎদা?'

—'দে।'

—'চিনি না গোলমরিচ?'

—'কোনোটাই নয়।'

—'আরেকটু কফি নেবে?'

—'আরেক কাপ হলে মন্দ হয় না।' অভিজিৎ কাপটা এগিয়ে দেয়...'দে, দুধটা বেশি দিস।'

কফির পাত্রটা তুলে নিয়ে বন্দনা কাপে কফি ঢালছে। চিনির স্বচ্ছ স্ফটিকদানা সরসর করে পড়ল। নিস্তব্ধতার মধ্যে টুং টাং চামচ নাড়ার শব্দ। দাসবাবু কাঁটা চামচে আনারসের টুকরো গেঁথে ভয়ে ভয়ে মুখে তুলেছেন। তার গিন্নিও চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছেন। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

—'সম্রাটদা, তোমাকে কফি দেব?'

—'নো থ্যাঙ্কস।' সম্রাট সশব্দে চেয়ারটাকে পিছিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল—'আই থিঙ্ক দ্য ডিসকাশান ইজ ওভার। স্কিউজ মি।'

বড়ো বড়ো পা ফেলে অস্বস্তিকর পরিবেশ ছেড়ে সে বেরিয়ে গেল। অর্ক তখনো দুহাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। অভিজিৎ তার কাঁধে দুহাত রেখে বলল— 'Come on dude...দুঃখ করিস না। নে...খেয়ে নে।'

আবার সম্রাটের কথা

মাথার ভিতরে যেন আস্ত একটা ফার্নেস জ্বলছে। করোটিটা খোলা গেলে দেখা যেত উত্তপ্ত লোহার মতোই মস্তিষ্কের ভাঁজে ভাঁজে লাল স্রোত চিড়বিড় করে ফুলকি ছড়িয়ে ছড়িয়ে উষ্ণ রক্তক্ষরণ হয়ে বয়ে চলেছে ভেতরে ভেতরে। সহ্যশক্তির সীমা ছাড়িয়ে অনেকগুণ জোরালো ডেসিবেলে প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে।

মাথার দুপাশের শিরা দপ্‌দপ্‌ করছিল। একটা পেইনকিলার খেয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছি। মাথার ব্যথার টানটান ভাবটা ওষুধের গুণে এখন অনেকটাই স্তিমিত। তবু জ্বলুনি কমছে না। গায়ের ঝালটা ঝাড়তে না পারলে কমবেও না। সক্রিয় পরমাণুর মতো ছটফটিয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ছুটে বেড়াচ্ছি। কিন্তু হাতের কাছে এমন একটা লোক নেই যার উপর অগ্ন্যুৎপাত সম্ভব।

কাল আমি যা করেছি তা নিয়ে একটু অনুশোচনাও নেই। যা করেছি তা আবারও করতে পারি। যে থানা-পুলিশ-কোর্টের ভয়ে অর্কদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হচ্ছে সেই ইন্ডিয়ান পিনাল কোড আমায় স্পর্শও করতে পারবে না। যতই বলা হোক না কেন 'আইন সবার জন্যে সমান'—আজও আইনের ধারাগুলো কাঠগড়ায় দাঁড়ানো লোকটার অঢেল ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স থাকলেই চোখে পট্টি পরে।

অনুশোচনা বা ভয় নয়। যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তা আফসোস। স্কাউন্ড্রেলটাকে কাল খুন করতে পারলেই বোধহয় খুশি হতাম। মাতাল হয়ে যাওয়ার দরুন উদ্দেশ্যটা গুলিয়ে গিয়েছিল। তাই অনাবশ্যক চিৎকার চেঁচামেচি করে ভিড় জমিয়ে ফেলেছি। তার বদলে হাতে ধরা রামের বোতলটা সোজা

ওর মাথায় বসিয়ে দিতে পারলেই ব্যস—খতম। তা নয়! গাধার মতো থিস্তিখেউড় করে ভানুমতীর খেল করে ফেললাম। হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠল। আর একবার যদি লোকটাকে হাতের কাছে পাই...।

—'খুট্...।'

দরজার পাল্লাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। বেগুনিরঙের শাড়ির আঁচলপ্রান্ত দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে—তিস্তা। ঘরে ঢুকেই পিছন ফিরে ছিটকিনি তুলে দিল।

আমি নির্বাক হয়ে ওকে দেখছিলাম। মেয়েটার কী অদ্ভুত দুঃসাহস! অসীম ক্ষমতাও! সম্রাট চৌধুরীকে আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ে এভাবে উন্মত্ত করে তুলতে পারেনি। আমার অফিসে অনেক রূপসি মেয়েই চাকরি করে। সুন্দরী পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টেরও অভাব নেই। তাদের মধ্যে অনেকের নির্জন ফ্ল্যাটের সোফায় বসে মদ খেতে খেতে দেখেছি তন্বীর শরীর থেকে এক এক করে আবরণ সরছে। উপরের আবরণ, নীচের আবরণ, অন্তর্বাস একটু একটু করে খসে পড়ছে। মিটিমিটি হেসে প্রশ্রয়ও দিয়েছি, কিন্তু নিজে থেকে হামলে পড়িনি।

কিন্তু এই মেয়েটাকে দেখলেই আমার যে কী হয়! সুন্দরী ঠিকই। তবে এমন সুন্দরী আমি অনেক ঘেঁটেছি। সাঙ্ঘাতিক কিছু ব্যক্তিত্বও নেই। রূপ ছাড়া আর কোনো আকর্ষণী শক্তিও নেই। অথচ ও সামনে এলেই দুষ্প্রবৃত্তিগুলো কেমন যেন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসে। মনে হয় এত ভদ্র, সভ্য সেজে থাকার দরকার কী?

—'অমন করে তাকাচ্ছ কেন?' তিস্তা এগিয়ে এল—'জানো না? তুমি এভাবে তাকালে আমার ভয় করে।'

আমি ওর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়েছি। তিস্তা আরো কাছে ঘনিয়ে এসেছে। ওর বুক দুটো আমার কপাল স্পর্শ করল। মসৃণ উরুর স্পর্শ উরুতে। পাতলা কোমরের মাঝখানে উন্মুক্ত নাভি। কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল। টের পাচ্ছি দানবটার ঘুম ভেঙেছে। তেড়েফুঁড়ে উঠে সে শিকল ভাঙার জন্য দাপাদাপি করছে।

—'এখনো রাগ কমেনি?' বুকের আঁচল খসে পড়ল। বেগুনি ব্লাউজের ভিতরে সাদা মাংসের উচ্ছ্বসিত ঢল নেমেছে। আলতো দুটো হাত আমার মাথাটাকে আলগোছে নরম স্পঞ্জের উপর টেনে নিল। গালের উপর আরো

একটা মসৃণ গালের স্পর্শ। তিস্তা কোলের উপর বসে পড়ে গালে গাল ঘষতে ঘষতে বলল—'বাপ রে বাপ! কী রাগ! কী রাগ! ছেলের এত রাগ তা আগে জানতাম না তো! অর্ক তো মুখ ঝামটা খেয়েই থেমে গেল! এখন দেখি আমার কপালে কী লেখা আছে!'

—'ইয়ার্কি ভালো লাগছে না তিস্তা!' আমি ওকে অগ্রাহ্য করে উঠে দাঁড়াতে চাইছিলাম। এমনিতেই মেজাজ টং হয়ে আছে, তার মধ্যে এসব খেজুর ভালো লাগে! তবু যথাসম্ভব ভদ্রভাবেই বললাম—'একটু ডিস্টার্বড আছি। Will you please leave me...?'

—'উঁহু, সে আমাকে চিত করে ফেলে বুকের উপর উঠে এল। আমার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বলল—'ছাড়ব না। কী করবে?'

অদ্ভুত! অদ্ভুত মেয়েটা! ততোধিক অদ্ভুত তার মোহিনী শক্তি! অদ্ভুত তার সাহস! ওর স্বামী ঠিক দুটো ঘরের পরের ঘরটাতেই হয়তো সশরীরে উপস্থিত। তা সত্ত্বেও তার স্পর্ধা আর দুঃসাহসে কোনো ঘাটতি নেই।

আমি চুপ করে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। এই তাকিয়ে থাকার কোনো অর্থ নেই। আবার আছেও। ওর দুঃসাহসিকতার তারিফ না করেও পারছিলাম না। আবার মনে মনে রাগ হচ্ছিল। যদি এই মেয়েটা অর্কর না হয়ে আমার স্ত্রী হত! বাঘের উপযুক্ত বাঘিনী হত। চাবকে সোজা করে আরামও হত। প্রতিশোধও হত। যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা আর রাগ মনের মধ্যে পুষে রেখেছি, তার থেকে রেহাইও পাওয়া যেত।

—'অর্ক কোথায়? ঘরে নেই?'

—'না, নীচে বসে আছে।

—'ঠিক আছে।' আমি ওর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বললাম—'ছাড়ছ না তা হলে!'

—'না।'

—'আমিও ছাড়ছি না।'

খুব যে ইচ্ছে ছিল তা বলতে পারি না। বিশেষ করে শেষ পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছে একেবারেই ছিল না। ভেবেছিলাম অল্প স্বল্প আদর টাদর করে ছেড়ে দেব। কিন্তু কেমন একটা প্রচণ্ড জেদ চেপে বসল। আস্তে আস্তে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছি তা বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু তার সাথে কাণ্ডজ্ঞানটাও যে হারিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে চাইনি। আমার শক্তিশালী চুম্বনের ধাক্কায় তিস্তা ছটফট

করছিল। নিশ্চিত জানি ওর দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জানি ওর কষ্ট হচ্ছে। তবু আমি পাগলের মতো ওকে চুমু খেয়ে যাচ্ছিলাম। মাথার চুলে মারাত্মক টান না পড়া পর্যন্ত হুঁশ ফেরেনি।

—'কী করছ?...।' তিস্তা ঠোঁট ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁপাচ্ছে—'ওঃ...আরেকটু হলেই দমবন্ধ হয়ে মরছিলাম। You are so wild...।'

—'Yes, I am' মুচকি হাসলাম—'কেন? খারাপ লাগল? তা হলে থাক।'

ও আমার দিকে তাকাল। দৃঢ় হাতে নিজের ব্লাউজের হুক খুলছে। নাকের পাটা ফুলল। গালে আর নাকে উষ্ণতার লালচে আভাস। উত্তুঙ্গ বুক দ্রুতগতিতে উঠছে নামছে। মেয়েটা খেপেছে। বিছানায় এ মেয়ে মারাত্মক খেপু! উপর থেকে দেখে বোঝা যায় না। কিন্তু একেকটা সময়ে এমন খেপে যায় যে তখন ঠান্ডা করার জন্য বলপ্রয়োগ না করে উপায় থাকে না। তিস্তাই বটে!

—'কী ভেবেছ?' ও আবার আমার উপর উঠে এসেছে—'সেক্সটা শুধু তোমরাই করতে জানো! ভোগ করার অধিকার শুধু তোমারই আছে। শুধু তুমিই অত্যাচার করতে পারো?'

—'না...তা যে নয় সে তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।'

ও বুকে, গলায় চুমু খেতে খেতে বলল—'তা হলে আজ আমি তোমাকে রেপ করব। তোমার ইচ্ছে না থাকলেও শেষ পর্যন্ত যেতেই হবে। ভালোয় ভালোয় চলো তো ভালো কথা, নয়তো...।'

—'নয়তো কী করবে?'

ঘাড়ে তীব্র কামড়—'জোর করে টেনে নিয়ে যাব।'

আমি হাসলাম।

তিস্তা বাঘিনীর মতো আমার বুকের উপর থাবা পাতল—'আজ আমার ইচ্ছে অনুযায়ী তোমায় সেক্স করতে হবে।'

আমি কোনো উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে থেকে দেখার চেষ্টা করি, ও কী করে।

তিস্তা এক এক করে তার সমস্ত পরিধান খুলে ফেলেছে। মেয়েদের সাধারণ শরীরের থেকে এ শরীর অনেক মাত্রায় বেশি উত্তেজক। উদগ্র স্তন দুটো দেখলে ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে করে। পাতলা কোমর ও নিতম্ব যেন বহু যত্নে গড়া। বিশেষ করে পিছনটা অবিকল তন্বুরার মতো।

সে আমার কান চেটে দিল। জিভটা ঢুকিয়ে দিল কানের মধ্যে। বুঝতে পারলাম, ফের উত্তেজিত হয়ে উঠছি। এ উত্তেজনা মানুষের নয়, পশুর।

তিস্তা আমাকে ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে গিয়ে বসল। অদ্ভুত তেজি ভঙ্গিতে বসে আছে। গর্বোদ্ধত স্তন। তার নীচে কোমল, মসৃণ ত্বকে ঘেরা নাভি। সিংহের কেশরের মতো চুল ঘাড়ের কাছে অবিন্যস্ত। দু পা ফাঁক করে সাহসী এবং আমন্ত্রণী ভঙ্গি তার। কলাগাছের গুঁড়ির মতো পুষ্ট অথচ চিক্কণ দুই উরুর ফাঁকে উঁকি মারছে দেহের প্রবেশ পথ। সিংহদুয়ার।

—আজ একটু অন্য স্টাইলে করি?' আমি উঠে বসলাম—'তোমাকে জন্তুর মতো লাগছে।'

সে বোধহয় ব্যাপারটা বোঝেনি। এই হল মুশকিল। বেশিরভাগ মেয়েরাই কামসূত্র পড়ে না। তাই পশ্চারগুলোও ঠিকমতো জানে না।

আমি ঠিক করলাম, আজ পিছন দিক দিয়ে করব। তিস্তা অবিকল একটা কুকুরীর মতো আমার দিকে পিছন ফিরে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। ও যদি কুকুরী হতে পারে, আমার কুকুর হতে আপত্তি নেই। বেসিক্যালি আমি তো তাই-ই।

পিছন দিক দিয়ে ওকে রমণ করতে শুরু করি। ওর বিপুল নিতম্ব থরথর করে কেঁপে ওঠে। এ মেয়েটা এত বড়ো বুক আর পাছার ভার নিয়ে হাঁটে কী করে! আমি ওর পাছাটাকে চাটছিলাম চটকাচ্ছিলাম। তিস্তা আরাম পাচ্ছিল। কিন্তু যন্ত্রণাও ছিল সমান। ও যন্ত্রণায় কাতরে উঠল—'এত যন্ত্রণা দাও কেন আমায়? উঃ...মা-গো! কেন এত অত্যাচারী তুমি? আই লাভ ইউ ড্যাম ইট!'

মনে মনে উত্তর দিই—'আই হেট ইউ।'

সব শেষ হতে ঘণ্টা দেড়েক লাগল। এতক্ষণ ধরে আমরা যতটা আদর করেছি তার চেয়ে বেশি মারপিট করেছি। জন্তুর মতো বারবার মিলিত হয়েছি। তিস্তা নিভে আসতে আসতে আবার জ্বলে উঠেছে। আমি নিভিয়ে দিয়েছি। আবার জ্বলে উঠেছে। আবার নিভিয়েছি। এই অদ্ভুত খেলার মধ্যেই কী করে অতখানি সময় কেটে গেল টেরই পেলাম না। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর তৃপ্তিমাখা গলায় তিস্তা বলল—'জানো সম্রাট, মাঝেমধ্যে আমার খুব আফসোস হয়।'

আমি মাথাটা কাত করে ওর দিকে তাকিয়েছি।

—'ছোটোবেলা থেকে এমন এক পুরুষের স্বপ্ন দেখে আসছি যে তোমার

মতোই রুক্ষ, অথচ সুন্দর। তোমার মতোই আদর করতে জানে। তোমার মতোই নিষ্ঠুর, অথচ আশ্রয়ও দিতে পারে।' ও আমাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রাখল—'যার বুকে মাথা রেখে নিজেকে সুরক্ষিত মনে হবে, এমন এক পুরুষ।'

কথাটা কি ঠাট্টা? সব মেয়েরাই পরিতৃপ্ত হলে এমন সব কথা বলে। ফ্যান্টাসি আর ইউটোপিয়া দিয়ে ঘর বাঁধে। নয়তো একটা মেয়ে আমার বুকে নিরাপত্তা খুঁজছে, এর চেয়ে বড়ো অবাস্তব কথা আর কী হতে পারে?'

—'তখন তোমার সাথে আলাপ হয়নি কেন? তখন যদি তোমায় আমি চিনতাম...।'

—'তোমার সৌভাগ্য। নয়তো পুরো লাইফটাই বরবাদ হত।'

—'বরবাদ কীরকম?'

—'যেমন তোমার রুমমেট শিউলির হয়েছিল। পড়াশোনা শিকেয় উঠত। পরীক্ষার খাতায় লিখে আসতে 'আই লাব ইউ সম্রাট'। অর্কর মতো ভালোমানুষ স্বামী পেতে না। ভালোবাসা পেতে না...।'

—'শুধু শিউলি! শিউলি, তৃষা, নীলাঞ্জনা, সোমদত্তা...।'

হেসে ফেললাম—'আমার পুরো ট্র্যাক রেকর্ডটাই মুখস্থ করে রেখেছ দেখছি।'

—'মুখস্থ নয়।' ও আরো ঘন হয়ে এল—'ওরা সব বলাবলি করত। শুনেছি।'

—'হুম্।'

—'কিন্তু একটা কথা বুঝিনি। এরা প্রত্যেকেই তোমাকে ভীষণ ভালোবাসত। নীলাঞ্জনা তো তোমার জন্য পাগলই হয়ে গেল। দু'বার হাত কেটে ফেলল। তারপর কেমন যেন হয়ে গেল...।' চকিত হয়ে বললাম—'ওর সাথে যোগাযোগ আছে তোমার? জানো এখন কেমন আছে?'

—'বদ্ধ পাগল, বিয়ে থা করেনি। টোট্যালি ডিসব্যালেন্সড।' তিস্তা একটু থামল—'সে যাই-ই হোক না কেন, আমার প্রশ্ন সেটা নয়।'

—'তবে কী প্রশ্ন তোমার?'

—'ওদের ছাড়লে কেন? They are so loving, তোমায় খুব ভালো-বাসত! তবে ওদের ছেড়ে গেলে কেন?'

এর উত্তরে কী বলব ভাবছিলাম। কেন ছেড়ে গেলাম, তার কি কোনো

নির্দিষ্ট কারণ আছে? আদৌ কোনোদিন ধরেছিলাম কি? কারো চোখ ভালো লেগেছে, কারো নাক ভালো লেগেছে, কারো নিতম্ব—ওই যাকে পাছা, টাছা বলে আর কী। কারো বুক, ঠোঁটের যৌন আবেদনে চমকে গেছি। শখ মিটে গেলে আরো নতুন কিছুর খোঁজে লেগে পড়েছি। পিছনের হাতছানি চোখের জল—কোনো কিছুই থামাতে পারেনি।

তবে নীলাঞ্জনা মেয়েটা একটু অন্যরকম ছিল। গায়ের রং ছিল সোনালি আভাময়। ফর্সা শরীরে একটু আঁচড় লাগলেই লাল হয়ে যেত। ওকে লাভ বাইট দিতে বেশ মজা লাগত। বুকে একটু দাঁত বসালেই টুকটুকে লাল হয়ে যেত। মনে হত স্তন বেয়ে, গোলাপী বৃন্ত বেয়ে এক্ষুনি রক্ত গলে গলে পড়বে!

নীলাঞ্জনাই আমার জীবনের প্রথম নারী শরীর। তার আগে মাস্টার-বেশনেই দিব্যি কাজ চলছিল। শুধু মাঝেমাঝে কমোডটার দিকে তাকিয়ে ভয় করত! মনে হত এই বুঝি কয়েকশো শিশু ওর গর্ভ থেকে লাফ মেরে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার উপরে! চিৎকার করে বলবে—'বাবা...বাবা...!'

নীলাঞ্জনা আমার কাছে প্রায়ই আসত। আমার চোখের প্রশংসা করত। একদিন বলল—'তোর চোখের চাউনিটা একদম এক্সরে-র মতো সম।'

আমি মুচকি হেসে বলি—'এক্সরের মতো নয়, এক্স রে-ই।'

—'এক্স রে? তাই?' নীলাঞ্জনা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—'বল তো, আমি কী রঙের আন্ডারগারমেন্ট পড়েছি।

বেমক্কা প্রশ্নটির ধাক্কা খেয়ে কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। ওর দিকে ভালো করে তাকাতেই মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশিরে একটা স্রোত বয়ে গেল। ধাক্কা মারল পুরুষাঙ্গে।

—'তুই কোনো আন্ডারগারমেন্ট পড়িসনি!'

আমি বোকার মতো উত্তর দিয়ে চুপ করে গেলাম। ওদিকে আবার লিঙ্গটা টনটনিয়ে উঠেছে।

—'তোর তো অবস্থা কাহিল!' নীলাঞ্জনা কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করেই একঝটকায় টপ খুলে ফেলেছে। জিন্স পরা পা-টা দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে টেনে নিল ওর উপরে। ফিসফিস করে বলল—'ওয়েল. আমি কিন্তু প্যান্টিও পরিনি।'

এরপরের দৃশ্যটা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুনেছি উলঙ্গ পুরুষকে দেখতে মেয়েদের ভালো লাগে না। তাই আলো নিভিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।

নীলাঞ্জনা জেদ ধরল—

—'না, আলো জ্বেলেই কর।'

—'তোর লজ্জা করবে না?'

ও আমার মাথাটাকে ওর সোনালি নরম বুকে চেপে ধরে বলেছিল—'না। যখন তুই আমাকে করবি তখন আমি দেখব!'

কী উদ্ভট শখ! আরো অদ্ভুত ছিল ওর পরের প্রতিক্রিয়া। আমার সেদিন খুব ব্যথা লেগেছিল। আর নীলাঞ্জনা! তার যোনিতে শেষ ঝাঁকুনিটা দেওয়ার সময় যেন মাথায় রোখ চেপে গিয়েছিল। ও দু'হাতে আমার মাথার চুল খিমচে ধরে গোঙাচ্ছে। শেষ ঝাঁকুনিটা দিতেই চিৎকার করে উঠল। আর...আর ফিনকি দিয়ে রক্ত! ওর গোপনাঙ্গ থেকে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসছে!

নীলাঞ্জনা ব্যথাতুর অথচ পরম তৃপ্তস্বরে আমাকে আঁকড়ে ধরে বলেছিল—'তোর পেনিসে আমার রক্ত লেগেছে। আর আমার ভ্যাজাইনার রক্তে তোর বীর্য মিশছে। তুই আমার নথ ভেঙেছিস...আমায় ছেড়ে যাবি না তো?...'

আমি চুপ করেছিলাম...।

—'কী হল? উত্তর দাও।'

—'কোনো কোনো প্রশ্নের উত্তর হয় না তিস্তা।

—'ঠিক আছে। তবে আরেকটা প্রশ্নের উত্তর দাও।'

—'বলো,'—

—'জানি না। আমি এখনো confused, তবে ছাড়ব এটা নিশ্চিত। আজ না হোক কাল। কাল না হোক পরশু।'

তিস্তা আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। দুহাতে চুলের মুঠি ধরে টেনে বলল—'যখন তোমার ইচ্ছে হবে তাই না? তোমার কাছে যখন আমি পুরোনো হয়ে যাব তখন—তাই না?'

—'হয়তো।'

ওর দুচোখ ধক ধক করে জ্বলছে—'সম্রাট, আমি নীলাঞ্জনা নই। যখন ইচ্ছে করবে কাছে টেনে নেবে, যখন ইচ্ছে করবে ঠেলে দেবে। তোমার ইচ্ছে না থাকলেও আমার ইচ্ছের দাম তোমায় দিতে হবে।' আমার চোয়াল চেপে ধরে ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নামিয়ে এনে বলল—'আমি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করব না। পাগলও হব না। কিন্তু তোমাকে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলে পড়ব। তুমি

আমার। আমার হয়েই থাকবে। অন্য কোনো মেয়ের দিকে চোখ তুলেও তাকিয়েছ কী...?'

ঘন চুলের রাশ আবার নেমে এল মুখের উপর। চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঠোঁটের উপর উত্তপ্ত আর একটা ঠোঁট। ক্লান্তিতে চোখ বুজলাম। কখন শেষ হবে এই ক্লান্তিকর খেলা! সুগন্ধী চুলের রাশ আর নরম মাংসের পিণ্ডে ডুবতে ডুবতে আমি উঠতে চাইছিলাম। নদীর জোয়ারে ভেসে যেতে যেতে একটা সবুজ ঘাসের কুটো খুঁজছিলাম।

কতগুলো ছায়া! ছায়া ছায়া। কালো কালো। কালো চাদরে মোড়া।

ছায়াগুলো আমায় ঘিরে ঘুরছে...ঘুরছে...ঘুরছে। চারদিক দিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে লৌহবেষ্টনীতে ঘিরে ধরেছে। কালো কালো হাত পা বের করে অঙ্গুলিনির্দেশ করে কিছু একটা বলছে। আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি—কিন্তু বুঝতে পারছি না। অথচ ভাষাটা দুর্বোধ্য নয়। প্রত্যেকটা শব্দ আমার চেনা, পরিচিত। এ কথাগুলো আগেও কখনো শুনেছি। তবু বুঝতে পারছি না।

অন্ধকারের ভিতর মানবশৃঙ্খলের গায়ে হাতড়ে হাতড়ে বেড়াই। কই, কোথাও তো কিছুই অনুভব হয় না। কোনো বাধা নেই, বন্ধ নেই, ইচ্ছে করলেই কায়াহীন মূর্তিগুলোকে এড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারি।

চক্রব্যূহে ঘুরতে ঘুরতেই ছায়াগুলো উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে গেল। নক্ষত্রগুলো সাঁৎসাঁৎ করে পায়ের তলা দিয়ে চলে চলে যাচ্ছে। অন্ধকারের বুকে ছায়াপথের গুঁড় নেমে এল। আমাকে চতুর্দিক দিয়ে বেষ্টন করে অনায়াসে তুলে নিয়ে ছুড়ে দিল কোনো একটা জায়গা লক্ষ্য করে। একটা বাড়ির জানালার দিকে। অন্ধকার বাড়ি, অন্ধকার জানালা। গোলকোন্ডা ফোর্টের মতোই অন্ধকার।

আমি জানি এখানে কেন আমাকে পাঠানো হয়েছে। কেন আমাকে ওরা এখানে নিয়ে এসেছে। এ-ও জানি এক্ষুনি এখানে একটা নাটক অভিনীত হবে। কী নাটক হবে তা-ও জানা আছে।

ওই যে দূরে আবছা একটা সিঁড়ি আছে, অন্ধকারে কালো হয়ে আছে, ওটা দিয়ে একটা লম্বা ছেলে টলতে টলতে এক্ষুনি উঠে আসবে। বছর পঁচিশের ছেলে। ঠোঁটে, গালে লাল লিপস্টিকের দাগ। মাথার চুল ঘেঁটে গেছে। হাতে মদের বোতল...। ওই যে...ওই যে আসছে। ঠিক যেমন

বলেছিলাম। একটা চটুল হিন্দি গানের সুরে শিস্ দিতে দিতে উঠে আসছে। জামাকাপড় অবিন্যস্ত। যেন ঝড় বয়ে গেছে...।

—'রাজা। দাঁড়াও।'

একটা দীর্ঘ ছায়ামূর্তি তার পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। বলিষ্ঠ, মজবুত গঠন। চৌকো, দৃঢ় চোয়াল শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে বলল—'কোথায় ছিলে এতক্ষণ? রাত দুটো বাজে, অথচ বাড়ি ফেরার নাম নেই। মা চিন্তা করে মরছে...।'

আমি জানি এবার রাজা কী বলবে। সে উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাবে। ভুরু নাচিয়ে খিঁক খিঁক করে হেসে বলবে—'কে-কে চিন্তা করছে বললে? কে?'

—'তোমার মা।'

—'মা...মা জননী!...হিঃ...হিঃ...হিঃ...।'

—'অসভ্য ছেলে! হাসছ কেন?'

—'ওঃ...ওঃ...আমার কথা চিন্তা করার সময় মা জননীর আজকে আ-ছে তাহলে। তা বে-শ। তা বে-শ। কিন্তু কেসটা কী গুরু? কোন্‌টা ফুরিয়ে গেছে? ভায়াগ্রা না কন্ডোম? বলো নিয়ে আসছি।'

—'রা-জা। পুরুষমূর্তিটা হিসহিস করে বলে—'মুখ সামলে কথা বলো। You are talking about your mother.'

—'M-o-o-ther রাজা আবার খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ হাসল— 'Oh! Yes! Yes! ভুলেই গিয়েছিলাম জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী...ঠিক বলেছি? ...হ্যাঁ...ঠিকই বলেছি...।' বলতে বলতেই তার চোখে পড়েছে দোতলায় দরজার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার মা। স্তম্ভিত। মৃত মানুষের মতো স্থির।

—'ওঃ...মা...মা-মাম্মি...তুমিও আছে? ...জগদম্বা মা আ-মা-র...স-রি, লে-ট হয়ে গেল। কিন্তু তোমার আজকে পার্টি নে-ই? মদ নে-ই? কাবাব নেই? ফুর্তি নেই? ওই পুরুষমানুষটা নে-ই?'

—'রাজন!'

—'হ্যা-ট শালা। কী সব ফালতু বকছি!' সে টলতে টলতে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—'Come on, Look at me, ওই লোকটা বুড়ো হয়ে গেছে, ওর জিনিসপত্তর এখন হাতির শুঁড়। দ্যাখ, আমি ওর চেয়ে অনেক হ্যান্ডসাম, অনেক ইয়ং, অনেক গরম। যা-বি?

—'রাজন!' তার মা কাঁপছেন। অসহ্য রাগে বুকফাটা কান্নায় কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে গেছে।

—'কী বলছিস! তুই আমার ছেলে! আমি তোর মা!'

—'চুপ!' পুরুষমূর্তিটা গর্জন করে উঠল—'আরেকটা কথা বললেই পিঠের ছাল তুলে নেব। দিনকে দিন প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে দাদা তোমাকে shameless brut তৈরি করেছেন। অঢেল কাঁচা টাকা পেয়ে মেয়ে আর মদের পেছনে ঢালছ। কোম্পানির টাকা ধ্বংস করে উচ্ছন্নে যাচ্ছ...।'

—'সঙ্কণ!' মহিলা প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছেন—'ওকে ছেড়ে দাও। রাজন পুরো ড্রাঙ্ক। ও জানে না ও কী বলছে।'

—'চুপ করো শ্রেয়া। এতদিন অনেক সহ্য করেছি। কিছু না বলেই তোমরা ছেলের সর্বনাশ করেছ। যথেষ্ট হয়েছে...।' লোকটা রাজার কলার চেপে ধরেছে—'ছেলেকে কীভাবে সিধে করতে হয় তা আমার জানা আছে। এই সোজা...সোজা হয়ে দাঁড়া। বল...গতকাল ব্যাঙ্ক থেকে কত টাকা তুলেছিস তুই? কোথায় উড়িয়েছিস? রথেলে? বারে? ক্যাসিনোয়?'

—'যেখানেই ওড়াই। তোমার বাপের টাকা উড়িয়েছি? আমার বাপের টাকা আমার নিজের টাকা, আমি উড়িয়েছি। তোমায় কৈফিয়ত দেব কেন? Who r u?'

—'Who am I? Don't u know? আমি তোর বিজনেস পার্টনার। কোম্পানির শেয়ারের একটা মোট চাঙ্ক আমার। আমি তোর কাকা।'

—'I know...I know...!' তুমি আমার কাকা। তুমি ওই মহিলার অবৈধ বাচ্চার জন্মদাতা। তুমি আমার অবৈধ বাপ।

—'রাজা, Stop it...;

—'চোপ শা-লা। কী ভেবেছিস? আমি কিছু জানি না। আমার টাকায় ফুর্তি করছিস। আমার বাপের বউয়ের সাথে লটঘট করছিস। আবার বড়ো বড়ো কথা।'

—'Shut up...You ruscal...' ঠাস করে ছেলেটার গালে একটা জোরালো চড় পড়ল। তারপরে আরো একটা—'খুব বাড় বেড়েছিস! বাপের টাকার উপর খুব দাবি না? একটা পয়সাও পাবি না। I will prove, যে তুই ওর সন্তান নোস। ওই কোম্পানির উপর তোর কোনো দাবি নেই। কী ভেবেছিস! তুই যা ইচ্ছে তাই বলবি? যা ইচ্ছে তাই করবি? আর আমি তোকে ছেড়ে দেব!

No...Never. প্রপার্টির একটা কানাকড়িও তুই পাবি না। পথের ভিখিরি করে না ছেড়েছি...।'

চড় খেয়ে রাজা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুছে নিল। থুতনির কাছে নুন, ছাল উঠে গিয়ে জ্বালা করছে। হাত পা বশে নেই। তবু সে উঠে দাঁড়ায়। তার মা তখন হা হা করে কাঁদছেন—'প্লিজ...তোমরা চুপ করো...থামো প্লিজ...for Godsake...stop it.'

—'কী বললি? রাজা টেনে টেনে বলল—'কী করবি? আমায় বাস্টার্ড প্রমাণ করবি?...'

—'Yes...I'll do it!'

—'Will you?'

—'Offcourse, I'will.'

মা তখনো কাঁদছেন, আর ক্ষিপ্ত জন্তুর মতো চিৎকার করে বলছেন... 'প্লিজ...ভগবানের দোহাই...তোমরা চুপ করো...চুপ করো।'

—'You...swine!'

—'দে। কত গালিগালাজ দিবি দে। কতগুলো থার্ডক্লাস বস্তির ছেলের সাথে মিশে এসবই তো শিখেছিস তুই। আর কী করবি?'

—'খু-ন করে ফেলব।'

—'খুন করবি!'...সপাটে আর একটা চড়। রাজা এবার আর পড়ে গেল না। খ্যাপা ষাঁড়ের মতো জান্তব চোখে কাকাকে দেখছে। দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট আর চিবুক শক্ত হয়ে উঠল।

—'খুন করবি!...খুন করবি আমায়!...আয়! আয়! খুন কর! মার আমায়! দেখি তোর কত হিম্মত!...মারবি তো মার!...বাপটা ছিল হিজড়ে!... দেখি তুই কেমন পুরুষ হয়েছিস!...আয়...মার?...মার!'

—'রাজন...রাজন কী করছিস? ...রা-জো-ন...।'

মেয়েলি গলার চিৎকার। ভারী কিছু একটা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে। সবকিছু তালগোল পাকিয়ে মাথার মধ্যে এসে ধাক্কা মারছে। দপ করে আলো নিভে গেল। পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। শুনতে পেলাম প্রফেসর রুদ্রর উন্মত্ত চিৎকার—'ক্যায়া করে গা তু?...মার ডালেগা মুঝে?...আ...আজা...মার...মার ডাল মুঝে...মার ডাল...মার...মার...মার! বে-ই-মা-ন!'

ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসি। বালিশ, তোষক, ব্ল্যাঙ্কেট, চাদর

ঘামে ভিজে জবজব করছে। আমার জামাকাপড়গুলো বিছানার একপাশে এলোমেলোভাবে পড়ে আছে। তিস্তারগুলো নেই। তিস্তাও নেই। চলে গেছে। যাওয়ার আগে হয়তো বলেও গেছে। আমি শুনতে পাইনি।

বাঁ চোখের শিরাটা চিড়িক চিড়িক করে লাফিয়ে উঠল। বুকের মধ্যে একটা জোরদার চাপ। নিস্তব্ধতার মধ্যে নিজেরই শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ বড়ো বেশি করে শুনতে পেলাম। বাইরে তখন খটখটে রোদ্দুর।

—'প্রফ...প্রফ...প্রো-ফে-স-র...।'

প্রফেসর খুব মন দিয়ে কৌশিক রুদ্রর দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছিলেন। আমার চিৎকার চেঁচামেচিতে বিন্দুমাত্রও উৎকণ্ঠিত হয়েছেন বলে মনে হল না। ফেনামাখা রেজারটা জলে ডুবিয়ে নিঃশব্দে তাকালেন। তার গাম্ভীর্যপূর্ণ চাউনিতে রীতিমতো বিরক্তি।

আর কারো উপর রাগ ফলাতে না পেরে প্রফেসর মুখার্জির বিরুদ্ধে সব ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। কেন লোকটা সবসময় আমার সাথে থাকবে না! প্রফেসর রুদ্র ছাড়া কি ত্রিভুবনে আর কেউ নেই! আর কারো ওকে প্রয়োজন হতে পারে না! যখন দরদ উথলায় তখন অতিবৃষ্টির চোটে টেকা দায়! যেই আসল কথাটা বলে ফেলেছি অমনি আঁতে ঘা লেগে গেছে। চেনা আছে। সব শালাকে চেনা আছে। সব এক।

—'পৃথিবীতে তুমি ছাড়াও আরো অনেকে চড়া সুর পছন্দ করে না সম্রাট। তাদের কথাও তোমার মনে রাখা উচিত।'

জুলপির পাশ দিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা কিছু একটা গড়িয়ে পড়ছিল। পকেট হাতড়ে দেখলাম রুমালটা নেই। অগত্যা হাত দিয়েই মুছে ফেলে বলি—'স-রি।'

প্রফেসর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কৌশিক রুদ্রর সাবান মাখা গালে মনোযোগ দিলেন। আমার দিকে ফিরেও দেখছেন না। সতর্ক আঙুল সন্তর্পণে আস্তে আস্তে রেজার টানছেন। প্রফেসর রুদ্রও দিব্যি শান্ত হয়ে চুপ করে বসে আছেন। স্থির, নট নড়ন চড়ন, পুতুলের মতো। বুড়োটার যত শত্রুতা সব আমার সাথে। এখন তো কই মড়াকান্না জুড়ছে না! যত শোক, সব কি আমাকে দেখলেই উথলায়!

প্রফেসর দাড়ি কামাতেই ব্যস্ত। বাধ্য হয়েই একটা চেয়ার টেনে সামনেই

বসে পড়ি। সেন্টার টেবিলের উপর অনেকগুলো ম্যাগাজিন পড়েছিল। একটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। কভারে একটা মেয়ের প্রায় নগ্ন ছবি। দেখেই বিরক্ত লাগল। মেয়েটা মডেলিংয়ের জগতে পরিচিত মুখ। প্রায়ই টিভিতে নানা বিজ্ঞাপনে দেখায়। কী সাম সাওয়ন্ত যেন! মুখের দিকে তাকালে ছুঁতেও ইচ্ছে করে না। তাই হয়তো মাংসের পসরা সাজিয়ে নিজেকে পণ্য করে তোলার চেষ্টা করছে।

ম্যাগাজিনটার বিষয়বস্তু খুলমখুল্লা সেক্স ও ভায়োলেন্সের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। কভার পেজটা দেখেই পড়ার ইচ্ছেটা চোঁ চাঁ দৌড় মেরেছে। ওটাকে কোলের উপরে রেখে আরো একটা ম্যাগাজিনের দিকে হাত বাড়াই। প্রফেসর এখনো দাড়ি কামিয়েই যাচ্ছেন। কখন শেষ হবে কে জানে! প্রফেসর রুদ্রর মতো মানুষের দাড়িকাটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এখন শান্ত হয়ে বসে আছেন। হঠাৎ কী মর্জি হবে, টুক করে মুখটা নেড়ে দেবেন—ব্যস, কেলেঙ্কারির একশেষ। প্রফেসর মুখার্জির অসীম ধৈর্য্য! একহাতে কৌশিকবাবুর চোয়াল ধরে আরেক হাতে আস্তে আস্তে রেজার টেনে যাচ্ছেন। দায়সারাভাবে নয়, রীতিমতো সযত্নে।

এমন এক একটা মানুষই বোধহয় থাকে, যাদের মানুষকে ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো কাজই নেই। মেয়েদের মতোই সস্নেহ, কোমল। একজনকে তো জন্ম থেকেই দেখে এসেছি। আরো একজনকে এখন দেখছি। রাগ নেই, বিরক্তি নেই, অভিযোগ-অনুযোগ নেই। সব সময়ই প্রশান্ত, আনন্দময়। এত অনাবিল আনন্দধারার জোগান যে কোথা থেকে পায় এরা কে জানে!

ফেনায় ভরা ব্রাশ আর রেজারটাকে ঠক করে মেঝের উপর নামিয়ে রেখেছেন প্রফেসর। বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। সামান্য একটু শব্দই চেতনাকে জোরালো কাঁকুনি দিয়ে গেল। তোয়ালে দিয়ে প্রফেসর রুদ্রর গাল, গলা মুছে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমার কোলের উপর শুয়ে থাকা নগ্নিকাকে দেখে তার ভুরু কুঁচকে গেছে। ঠান্ডা গলায় বললেন—'বলো, এত হাঁকডাক করছিলে কেন? কিছু দরকার ছিল?'

ঘরের স্থির নীরবতায় উত্তেজনার পারদটা কখন যে নেমে গেছে টেরই পাইনি। এবারে অনেক শান্ত গলায় বললাম—'নাঃ, দরকার তেমন কিছু নয়। একা একা ঘরে ভালো লাগছিল না। তাই...।'

প্রফেসর আমার কোল থেকে ম্যাগাজিনটা টেনে নিয়ে টেবিলের উপর

ফেলে দিলেন—'তোমার একা একা থাকাই বোধহয় ভালো সম্রাট।'

হাসলাম—'একা থাকতেই তো চাই।'

—'তবে এলে কেন?'

—'হঠাৎ ইচ্ছে হল।'

—'তোমার ইচ্ছেগুলো এরকম হঠাৎ হঠাৎ হয় নাকি?'

—'বলতে পারেন।'

—'কিন্তু সবার ইচ্ছে তো তোমার মতো হঠাৎ হঠাৎ না-ও হতে পারে। আমার এখন তোমার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে না-ও করতে পারে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম—'সেক্ষেত্রে with due respect to your ইচ্ছে, আমি কেটে পড়ব।

প্রফেসর মুখার্জি হাসলেন—'নাঃ...তোমার উপরে রাগ করাটা নেহাতই 'অরণ্যে রোদন' দেখছি, যেয়ো না, বোসো।'

ধপ করে আবার বসে পড়ি—'বসলাম। এবার?'

ব্রাশ আর রেজার তুলে নিয়ে তিনি বললেন—'এগুলোর ব্যবস্থা করেই আসছি। তুমি ততক্ষণ প্রফেসরের নতুন রূপ দেখো আর মুগ্ধ হও।'

প্রফেসর রুদ্র তখন আয়নায় নিজের দাড়িবিহীন মুখটা নানারকম মুখভঙ্গি করে দেখছেন। সম্ভবত বনজঙ্গলবিহীন শূন্য প্রান্তর তার পছন্দ হচ্ছে না। হয়তো এটা তিনিই না অন্য কেউ, সে বিষয়ে সন্দিহানও হয়ে উঠেছেন। জোড়া হাতদুটো নাকে, মসৃণ গালে বোলাতে বোলাতে ভুরু কুঁচতে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত একটা অস্ফুট শব্দ করে আয়নাটাকে মেঝের উপর আছড়ে ফেললেন। ঝনঝন করে খণ্ড খণ্ড টুকরোয় তার প্রতিবিম্ব ভেঙে পড়ল। দশটা ছোটো ছোটো টুকরোয় দশটা প্রফেসর রুদ্রর দাড়িবিহীন মুখ।

কৌশিক রুদ্র আমার দিকে তাকালেন। প্রচণ্ড জিঘাংসা তার চোখ থেকে ফেটে পড়ছে। রক্তিম জ্বালায় আমায় ভস্ম করে দিতে পারলেই যেন খুশি হন। দাড়িটা উড়িয়েছেন প্রফেসর মুখার্জি। কিন্তু রাগটা আমার উপর পড়েছে। যেন কুপরামর্শটা আমিই তাকে দিয়েছি।

—'দাড়িছাড়া প্রফেসর রুদ্রকে কেমন লাগছে বললে না তো?'

—'কু-ল।' লোকটাকে আরো একটু রাগাতে ইচ্ছে করল। বললাম—'দাড়িটা কেটে ভালোই করেছেন। আরো আগে কাটা উচিত ছিল। এখন বেশ পরিষ্কার লাগছে।'

প্রফেসর রুদ্র বড়ো বড়ো চোখ করে তাকাচ্ছেন। কথাটা যে বুঝতে পেরেছেন তা রাগের বহর দেখেই বুঝতে পারছি। খুনির মতো নিষ্ঠুর অথচ ধারালো ভঙ্গিতে তার উপরের পাটির দাঁত নীচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে। এই লোকটার যৌবন নেই, তারুণ্যের ভরপুর শক্তি নেই, হাত পা নিজের ইচ্ছেমতো নাড়াচাড়া করার স্বাধীনতাও নেই—তবু কী পরিমাণ প্রতিশোধ-স্পৃহা! অদম্য জেদে গোটা বিশ্বের উপর শোধ তুলতে চান! যে চামচটা তার মুখে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার তুলে দিচ্ছে তাকেও তিনি বিশ্বাস করেন না। পৃথিবীর তাবৎ মানুষ তার কাছে বেইমান। বিশ্বাসঘাতক! আমি তো বটেই।

আর এই জন্যেই লোকটাকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করে। আমি জানি লোকটাও আমায় খুন করতে চায়। আমি ওকে অসম্ভব ঘৃণা করি। এই লোকটাও তাই করে।

হাতের জিনিসগুলো থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। প্রফেসর সেগুলোকে ড্রেসিং টেবিলের একপাশে সরিয়ে রাখতে রাখতে বললেন—'বলো, কী বলতে এসেছিলে।'

—'কিছুই না প্রফ। ঘরে বসে বোর লাগছিল। তাই...।'

—'তাহলে চলো একটু বেরোনো যাক। তবে তার আগে অর্ক বা অভিজিৎকে একটু বলে আসি।' প্রফেসর পায়ে জুতো গলাতে গলাতে বললেন—'কাউকে পাহারায় বসিয়ে তবেই আমার ছুটি মিলবে।'

আমাদের হোটেলটার পিছনেই সুন্দর একটা মন্দির আছে জানতাম না। শ্বেতপাথরের ধবধবে চূড়োয় কিংবা স্তম্ভে, পবিত্রতা ছাড়া আর কোনো স্থাপত্য সৌকর্য নেই। আকারে খুব বড়ো না হলেও বেশ পরিপাটি। বিখ্যাত মন্দিরগুলোর মতো হাওয়ায় টাকার গন্ধ নেই। ধুপ, ধুনোর একটা অদ্ভুত মিশেলে হঠাৎ ভালো লেগে যাওয়া অনুভূতি। এতক্ষণ মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটোছুটি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবার যেন একটু হাঁফ ছেড়ে শান্ত হয়ে বসল।

—'হুঁ...উঁহু...।'

জুতোসুদ্ধই মার্বেলের সিঁড়ির উপরে পা রাখতে যাচ্ছিলাম। প্রফেসর মাথা নাড়লেন—'জুতো পায়ে দিয়ে মন্দিরে ঢুকতে নেই। খুলে রাখো।'

—'কেন প্রফ? আপনাদের ঈশ্বর কি জুতো Allow করেন না।'

—'Allow করার ব্যাপার নয়। জুতো পরে কোনো মন্দিরেই ঢুকতে নেই।'

ব্যাপারটা ঠিক মাথায় ঢুকল না। যে ঈশ্বরের কাছে মুচি, মেথর, শুদ্র, ব্রাহ্মণ, ধনী, গরিব সব সমান তার কাছে জুতো জিনিসটা অপাঙ্‌ক্তেয় কেন? জামা পরে ঢুকতে অসুবিধে নেই। ট্রাউজার, টুপি, সানগ্লাস—সব পরিধেয় বস্তুরই প্রবেশাধিকার আছে। শুধু জুতো বেচারাই বাদ। জুতোটাও তো পরিধেয় বস্তুই। পায়ের তলায় থাকে বলেই কি এত অবহেলা? দুনিয়ার সমস্ত নোংরা আবর্জনা নিজের গায়ে টেনে নেয় বলেই কি ঈশ্বরের দরবার থেকে তার নাম কাটা?'

—'তা নয়।' প্রফেসর বললেন—'দেবতার কাছে নগ্নপদে যাওয়াটাই রেওয়াজ।'

অন্যদিন হলে এই অদ্ভুত রেওয়াজ নিয়ে একচোট তর্ক করে ফেলতাম। কিন্তু আজ ইচ্ছে করল না। বিনাবাক্যব্যয়ে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে প্রফেসর মুখার্জির কথামতো জুতো খুলে ফেললাম। ধুপের গন্ধে, ফুলের সৌরভে মন্দির 'ম' 'ম' করছে। খুব আস্তে একটা ভজনের সুরও কানে এল। অদ্ভুত শুচিশুদ্ধ পরিবেশে গোঁয়ার্তুমি করতে ইচ্ছে করল না।

—'চলো।'

দুজনে পাশাপাশি হেঁটে মন্দিরে ঢুকলাম। পায়ের তলায় মার্বেলের মেঝে কখনো উষ্ণ, কখনো ঠান্ডা। কাল রাত্রে প্রচুর ঝড়বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় হাওয়াটা ঠান্ডা ঠান্ডা। মন্দিরের শান্তিময় পরিবেশ ভালোই লাগছিল। প্রফেসর মুখার্জির বোধহয় ঠান্ডা লাগার ধাত। তিনি গায়ের হালকা চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিলেন।

—'জায়গাটা কেমন লাগছে?'

একরাশ তাজা শান্তিময় সুগন্ধী হাওয়া বুকে ভরে বললাম—'ফ্যাবুলাস। হোটেলের পেছনে এমন একটা জায়গা আছে জানতাম না। আবিষ্কার করলেন কবে?'

—'অনেকদিন আগেই করেছি। অবশ্য আবিষ্কার করার কিছু নেই। শিবাকুমারণ কথায় কথায় বলেছিল। এতদিন আসা হয়নি। তোমার অনারে আজ চলে এলাম।'

মন্দিরের ভিতরে একদিকে বিষ্ণুমূর্তি। নতুনত্ব কিছু নেই। সেই মাথার উপরে ফণাতোলা সাপ। সেই এক আধশোওয়া দেবতা। এই-একজনকে দেখলাম যার গোটা জীবনই অখণ্ড অবসর। কোনো কাজ করবার নেই—দিব্যি শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দিলেন।

—'ওই দেখো। যার চোখের উপর পট্টি দেওয়া, উনি হলেন তিরুপতি বালাজী!'

—'এ-ই তিরুপতি। চোখের উপর পট্টি বাঁধা কেন?'

প্রফেসর মুখার্জি মাথা চুলকোচ্ছেন। চোখে মুখে একটা মজাদার ভঙ্গি ফুটিয়ে বললেন—'ওকে গুংগায় ধরেছে।'

বিগ্রহের সামনের স্তম্ভগুলো কিন্তু আদৌ সাদামাটা নয়। ছোটো ছোটো সিংহের মূর্তি, লতায়-পাতায় রীতিমতো কারুকার্যমণ্ডিত। বিগ্রহের দুপাশে ঘিয়ের প্রদীপ। সামনে প্রণামীর থালায় বেশ কিছু নোট আর গুচ্ছ কয়েন। নোটের সংখ্যা আরো বাড়াতেই হাতে চলে এল প্রসাদের ঠোঙা। খাবারটা ঠিক কী তা বোঝাই দায়। খিচুড়ি আর পোলাও-এর মাঝামাঝি কিছু একটা। মুখে দিয়ে দেখলাম মন্দ নয়।

প্রসাদের ঠোঙা হাতে নিয়ে দুজনেই এসে বসেছি মন্দিরের সিঁড়িতে।

—'বলো।' প্রফেসর কাঠের চামচে করে খানিকটা প্রসাদ মুখে ফেলে বললেন—

—'যা বলতে চাও, বলেই ফেলো।'

—'কী বলব?'

—'যা বলতে এসেছিলে।'

—'ওঃ।' আমি হেসে মাথা নাড়লাম—'আপনি যা ভাবছেন তা নয়। নিতান্তই ক্যাসুয়ালি...।'

—'দেখে তো বিশেষ ক্যাসুয়াল মনে হচ্ছে না।' তিনি হাসলেন—'ঠিক আছে যখন তুমি বলতে চাইছ না তখন থাক।'

—'তেমন কিছু নয় প্রফ...।'

—'থাক সম্রাট। প্রসাদ খেয়ে শালপাতার ঠোঙাটা ময়লা ফেলার বাক্সে ফেলে দিয়েছেন প্রফেসর—'বাদ দাও, অন্য কথা বলো।'

—'আপাতত একটা কথা বলার আছে।' আমার ঠোঙাটাও ফাঁকা গিয়েছিল। শেষবারের মতো দরদ দিয়ে শালপাতাটা চেটে নিয়ে ফেলে দিয়ে

বললাম...

—'আরেকটা হবে?'

প্রফেসর হো হো করে হেসে উঠলেন। সস্নেহে কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন—'হবে, বোসো।'

তারপর সেখান থেকে পদব্রজে ভ্রমণ। কোথাও পৌঁছব বলে হাঁটছিলাম না। ইতস্তত ভবঘুরের মতো ছন্নছাড়া ঘুরে বেড়ানো। ইতি-উতি হানা দেওয়া। পাশাপাশি দুটো মানুষের নিঃশব্দে হেঁটে যাওয়া আর মাঝেমধ্যে দু-চারটে সংলাপ। বেশিরভাগ সময়টা ছিল নীরবতায় মোড়া। সেই নীরবতার মধ্যে হাঁটতে হাঁটতেই উপলব্ধি করছিলাম একটা আশ্চর্য জিনিস। আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কোনো না কোনোভাবে এই পাশের মানুষটার উপর নির্ভর করতে শুরু করেছি। কবে, কীভাবে, কোন্ মন্ত্রবলে তা জানি না। কিন্তু যখন পা কাঁপে, যখন ত্রিভুবন দোলে, শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে তখন এই ছোট্ট মানুষটাকেই মনে হয় হারকিউলিস। বদ্ধমূল ধারণা হয় ওর ওই দুটো হাতের বেষ্টনীর মধ্যে আমি ভীষণভাবে নিরাপদ। তখন যদি হঠাৎ ভূমিকম্প কিংবা সুপার সাইক্লোনও এসে পড়ে তা-ও ওই হাত দুটো অমিত শক্তিবলে আমায় টেনে নিয়ে যাবে জীবনের পথে।

আমি প্রফেসরের দিকে তাকিয়েছিলাম। কী আছে লোকটার মধ্যে? কী এমন ম্যাজিক জানেন উনি? স্পষ্ট বুঝতে পারছি ওঁকে আমার ভালো লাগে। ওঁর সঙ্গে ভালো লাগে। এতগুলো মানুষের মধ্যে একমাত্র প্রফেসরকেই বোধহয় সব কথা খুলে বলতে পারি। এইটুকু বিশ্বাস করতে পারি যে অন্ধকুয়োর মতো সে কথা উনিও গর্ভগৃহে চেপে রাখবেন। অন্তত পাঁচকান করবেন না।

কিন্তু কেন বলব? নিজের কষ্টের কথা ট্যাঁড়া পিটিয়ে বলাটা দুর্বলচিত্ত মানুষের কাজ। সম্রাট চৌধুরীও সে পথে হাঁটবে কেন? তার বুকের পাঁজরে এখনো এত শক্তি আছে যাতে তার ভিতরে একটা বিরাট তুফানকে পুরে রাখা যায়। আজও একা একা হাঁটতে সে সক্ষম। তার জন্য কোনো ক্রাচের প্রয়োজন হয়নি, হবেও না।

আমরা যেখানে হাঁটছি তার অনতিদূরেই এক ভদ্রলোকের স্ট্যাচু। গোলকোন্ডা ফোর্ট বা সলার জঙ্গ মিউজিয়ামে যাওয়ার সময় এটাকে অনেকবার দেখেছি। প্রথম দর্শনে ভেবেছিলাম সুভাষচন্দ্র বসু। দ্বিতীয়বার

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। কিন্তু দেখলাম অন্ধকারে ঢিল ছুড়ে একটাও ঠিকঠাক লাগাতে পারিনি। ভদ্রলোকের পরিচয় তিনি অন্তুকেশরী। নাম? টঙ্গোট্টারো প্রকাশম পান্তালু।

—'তুমি কখনো প্রেমে পড়েছ সম্রাট?'

কথাটা বলার কোনো কারণ ছিল না। নীরবতায় মগ্ন হয়ে আপন মনে হেঁটে চলেছিলাম। সঞ্জীবেয়া রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতেই একসময় নেকলেস রোডে এসে পড়েছি। টানা পিচের রাস্তার কাঠিন্যের পাশে সবুজ ঘাসের মখমলি ছোঁয়া। দেখেই দু'চোখ জুড়িয়ে গেল।

তার মধ্যেই আকস্মিকভাবেই প্রশ্নটা করে ফেলেছেন প্রফেসর।

—'নাঃ, প্রফেসর।'

—'তোমার বয়েস কত হল?'

হাতে কলমে, দিনক্ষণের হিসাব করে বললাম—'এখনো পর্যন্ত বত্রিশ বছর, চার মাস, সতেরো দিন, আট ঘণ্টা...সেকেন্ডটা জানি না।'

—'তার মানে পূর্ণ যৌবন।' প্রফেসর মাথা নাড়ছেন—'নাঃ, তুমি দেখছি একটি টিপিক্যাল বেরসিক।'

মুচকি হাসলাম।

—'বত্রিশটা বছর কাটিয়ে একটা প্রেমও করতে পারলে না! তোমায় আর কী কী বিশেষণ দেব ভাবছি।'

—'আনরোম্যান্টিক বলতে পারেন।'

—'না...সম্রাট, হেসো না। বত্রিশটা বসন্তে তুমি জল ঢেলেছ। জীবনের আসল সুখটাই বোকোনি। সেই জন্যই তোমার কোমল প্রবৃত্তিগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে যাচ্ছে। তুমি রুক্ষ হয়ে যাচ্ছ।'

—'হলাম-ই বা।'

—'এটা কোনো কাজের কথা নয়। কথা শোনো, একটা মিষ্টি মেয়ে দেখে মিষ্টি একটা প্রেম করো। দেখবে অনেক শান্তিতে আছ।'

—'আমার কথা ছাড়ুন। ওসব আমার পোষায় না।' একটু মজা করার লোভ সামলাতে পারলাম না—'কিন্তু আপনি তো যথেষ্টই রোম্যান্টিক। আপনি প্রেম করেননি কেন?'

প্রফেসর অনিমেষ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। গা শিরশির করে উঠল! কী ছিল সেই চোখে কে জানে! মনে হল, আলো নয়, এক ঝলক অশ্রু

চোখে চেপে রেখে তাকিয়ে আছেন। চোখের মণিতে আদিম গুহার অন্ধকার। তার মধ্যে কী যেন একটা লুকিয়ে আছে! অথচ বাইরে থেকে দেখা যায় না।

তার সেই শীতল চাউনির সামনে ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। নীরবতায় তা আরো বাড়ে। তাকে লঘু করে দিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকটা ধ্বনি।

—'কে বলল প্রেমে পড়িনি?'

—'পড়েছেন?'

—'পড়েছি।'

—'কার?'

—'তোমার।'

—'যা ব্বাবা।' হেসে উঠলাম—'বলবেন না সেটা বললেই তো হত।'

—'কেন? তোমার প্রেমে পড়তে পারি না? একটা মানুষ আরো একটা মানুষের প্রেমে পড়তে পারে না!'

—'নিশ্চয়ই পারে।'

—'তবে?'

—'ইয়ার্কি নয়, সিরিয়াসলি বলুন প্রফ। আপনি সত্যিই প্রেমে পড়েছেন?'

—'পড়েছি।'

—'বিয়ে করেননি কেন?'

—'সব সম্পর্কের শেষ কি বিয়ে? আমি তা মনে করি না।'

—'তবে?'

—'বিয়ে মানে সম্পর্কের একটা সামাজিক নাম। সব সময় সেটা দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে ভালোবাসাটা তো মিথ্যে নয়। সেটা ভালোবাসাই। দুটো হৃদয়ের মাঝখানের সেতু, দুটো মনের মিশে যাওয়া; দুটো মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতা, বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, আর সহানুভূতি।'

—'কেমন লাগল সেটা তো বলুন।'

—'প্রেম তো আর খানাখন্দ নয়, যে ঝপাং করে পড়ে গেলাম, আর টপাং করে লাগল। কেমন লেগেছে সেটা বোঝার জন্যই হয়তো সারাজীবনই লেগে যায়। তার মধ্যেও কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। তা ছাড়া সবার বোঝা তো এক নয়।'

কাল রাতের ঝড়বৃষ্টির পর আজ মেঘভাঙা লাজুক রোদ উঠেছে। ঘাসের ডগায় জলের ফোঁটা শুকিয়ে গেলেও ভিজে ভিজে ভাবটা এখনো যায়নি। কখন এমন ভিজে ঘাসের উপর খালি পায়ে হেঁটেছিলাম তা মনে নেই। আজ শক্ত জুতোর শুকতলায় ছোটো ছোটো জলবিন্দু পিষে ফেলতে ফেলতে হঠাৎই মনে পড়ে গেল হাতের পাতায় প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা ধরতে পারার আনন্দ। শৈশবের সারল্যে সেই অনুভূতি কী আনন্দঘন হয়েই না এসেছিল! পরে এই হাতের মুঠোতেই লক্ষ লক্ষ টাকা ধরে দেখেছি, তাতে আত্মসন্তুষ্টি আছে, অহঙ্কার আছে—আনন্দ নেই।

বন্দনা যেদিন সলারজঙ্গে দু চোখ ভরা লজ্জা নিয়ে বলেছিল— 'ভালো-বাসি' সেদিনও মনে হয়েছিল হাতের মুঠোয় আরেক ফোঁটা বৃষ্টি ধরে ফেলেছি। অমূর্ত আনন্দ নিয়ে প্রতিটা শব্দ আমার রক্তবিন্দুতে নেচে নেচে ফিরছিল। যান্ত্রিক নিঃসঙ্গতার মধ্যে ওই একটা শব্দই যেন এক লহমায় আমার শুকনো হাড়, পাঁজর, মেদ, মাংসের উপর সজীব ত্বক দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল।

কিন্তু তারপর?

প্রফেসর আর কথা বললেন না। নৈঃশব্দ্যের মধ্যে আত্মমগ্ন হয়ে কিছু বোধহয় ভাবছিলেন। হয়তো তারুণ্যের কিছু রঙিন স্মৃতি উদ্ধার করে থাকবেন। তা নিয়েই নিশ্চুপে নাড়াচাড়া করছিলেন। আমরা নেকলেস রোড থেকে 'ইউ' টার্ন মেরে ফের সঞ্জীবৈয়া রোডের দিকে ফিরছি। খুব দ্রুত পদক্ষেপে নয়, খুব মন্থর গতিতেও নয়। দুলকি চালে আবার সেই চার দেওয়ালের দিকে পা বাড়াচ্ছি।

উলটো দিক থেকে একজোড়া বৃদ্ধ দম্পতি হাঁটতে হাঁটতে এদিকেই আসছিলেন। বেশ একজোড়া ধবধবে পায়রার মতো। ভদ্রলোক আনুমানিক সত্তর-পঁচাত্তরের কাছাকাছি। তার সঙ্গিনী প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি। দুজনে হাত ধরাধরি করে হাঁটছেন। মাঝেমধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হচ্ছে। বৃদ্ধ আপনমনেই কী যেন বকবক করে চলেছেন। বৃদ্ধার মুখে স্মিত হাসি। স্বামীর কথা শুনতেই ব্যস্ত। যেন এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা আর হতেই পারে না।

আমি তন্ময় হয়ে তাই দেখছিলাম। মেইন রোডের উপর দিয়ে অসংখ্য গাড়ির পিঁপ পিঁপ। হাজার হাজার লোকের ব্যস্ত কোলাহল। জীবিকার জন্য মানুষের ইঁদুরদৌড়। সব যেন এক সেকেন্ডের জন্য থেমে গেল। স্থির ক্যানভাসের আকাশে উড়ে চলেছে দুটো সাদা পায়রা—ডানায় শান্তির গন্ধ।

—'কী দেখছ অমন হাঁ করে?'

প্রফেসরের কথাটা কানে গিয়েছিল। এর উত্তর দেওয়ার জন্য একটা জোরালো কণ্ঠস্বর প্রয়োজন। সম্রাট চৌধুরীর গলা কোনোদিন, কোনো কারণে কাঁপেনি। কিন্তু আজ কাঁপবে। টের পাচ্ছি বুকের ভিতরটা আস্তে আস্তে খালি হয়ে যাচ্ছে। সেখানে হৃদয় নেই, ফুসফুস নেই, শুধু খাঁ খাঁ করা শূন্যতা। ঠান্ডা মর্গের মতো খালি। জীবনের স্পন্দন নেই—কিছু নেই।'

—'সম্রাট?'

—'উঁ?'

—'কী দেখছ?'

—'কিছু না।' যথাসম্ভব দৃঢ়কণ্ঠে বলি—'আমি ওসব প্রেম-ফ্রেম বুঝি না প্রফ। অন্য কথা বলুন।'

হোটেলে ফিরে, স্নান খাওয়া সেরে ঘরে ফিরে এলাম। প্রফেসর মুখার্জি বিছানার উপর টান টান হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। মাথার উপর আলতো হাওয়া নিয়ে পাখাটা অলসভঙ্গিতে ঘুরছে। এ.সি.টা অফ। সদাব্যস্ত হোটেলের ঘরে ঘরে নৈঃশব্দ্য। বাথরুমে জলের টুপটাপ এখন। বাইরে মাঝেমধ্যে একলা শালিখের একটানা কিচিমিচি। জানালার পর্দাটা মাঝেমধ্যেই একটা নরম আঁচলের মতো হু হু করতে করতে আছড়ে পড়ছে মুখে মাথায়। কোলবালিশটা উষ্ণ, নরম স্পর্শ নিয়ে বুকের কাছে গুটি গুটি মেরে শুয়ে আছে। পর্দার পিছনে আবছায়া রোদ। আর মাথার ভিতরে ছায়া ছায়া একটা মুখ। অনাড়ম্বর, প্রসাধনবিহীন, ভোঁতাভাতা। সরল, স্বাভাবিক—আত্মনিবেদনে পরিপূর্ণ। চোখ থেকে উপচে পড়া জলের মোটা মোটা ফোঁটা। এক ঝলক যন্ত্রণা, অপমান আর...।

—'আচ্ছা অর্ক, বউভাতের দিন কী কী হয়েছিল রে?'

—'কী আবার হবে? ওই তো বাটার নান, পনীর পসিন্দা, রেশমি কাবাব, ছ'রকমর স্যালাড, পোলাও, মাছ, মাং...।'

—'ধুত্তোর! খাওয়ার কথা কে জানতে চাইছে? তোর বিয়ের নেমন্তন্ন তো আমিও খেয়েছি।'

—'তবে কী জানতে চাইছিস?'

—'রাতে কী হল?'

—'রাতে আবার কী হবে? ফুলবাবুটি সেজে ঘুরে বেড়ালাম। অচেনা, অপরিচিত লোকের সামনে দাঁত বের করে বিনয়ের অবতার সেজে দাঁড়ালাম। ব্যস!'

—'আরে ঘোঁচু। তারপর কী হল বলবি তো।'

—'কী আর হবে? খেলাম দেলাম।'

—'তারপর?'

—'তারপর দিলাম।'

—'কী দিলি?'

—'সেটাও কি পাবলিক প্লেসে চেঁচিয়ে বলতে হবে?'

—'আচ্ছা...আচ্ছা...জোরে দিলি না আস্তে দিলি সেটা অন্তত বল।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই অভিজিতের ট্রেনিং পর্ব কানে আসছিল। আলোচনার টপিকটা শুনে মনে মনে না হেসে পারলাম না। অভিজিৎ এখন থেকেই বেশ টেনশনে পড়ে গেছে। অভিজ্ঞতা না থাকলে যা হয়। দাম্পত্য শারীরিক মিলন সম্পর্কে ওর বোধহয় সাংঘাতিক কিছু ধারণা থেকে থাকবে। যখন বুঝবে যে আরাম মাত্র কয়েক সেকেন্ডের, আর ব্যাপারটা আদৌ হাতিঘোড়া কিছু নয়, বেচারার স্বপ্নভঙ্গ হবে।

—'শালা, তোরা দিব্যি পাওয়ারলুম হয়ে হাততালি বাগাচ্ছিস। আর আমি এখনো হ্যান্ডলুম!' অভি রেগে গেছে—'ভালোয় ভালোয় বলবি না...।'

—'কী মুশকিল!' অর্ক গোবেচারার মতো বলে—'বিয়ে হলে তুইও তো শালা, হ্যান্ডলুম থেকে পাওয়ারলুম হবি। এখন থেকেই এত নাচানাচি কীসের?'

—'বলবি কি না বল।'

—'কানটা বাড়া বলছি।' অর্ক মুখ বাড়িয়ে এগোতে গিয়েই আমায় দেখে কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। কোথায় মুখ বাড়াচ্ছে সেটাও তার খেয়াল নেই।

—'অর্ক, এটা আমার কান নয়, ঠোঁট।' অভিজিৎ চটে গিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে বলল।

—'শা-লা। গে (Gay) পেয়েছিস নাকি? আমি তোকে প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাতে বলিনি। থুতু দিয়ে আমার...।' বলতে বলতেই আমার দিকে তার

চোখ পড়েছে। চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে গেল।

ওদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে অস্বস্তিটা আমাকেও পেয়ে বসল। সকালবেলা অর্ককে যে কথাগুলো বলেছিলাম সেগুলো আবার মনে পড়ে গেছে। কথাগুলো যে ভুল বলেছি একথা আদৌ স্বীকার করব না। তবে হ্যাঁ, হয়তো তার মধ্যে একটু বেশি রূঢ়তা ছিল। ঝাঁজটাও ছিল বেশি। অতখানি নিষ্ঠুর বোধহয় না হলেও পারতাম। কিন্তু অতিরিক্ত রূঢ়তাটুকু বাদ দিলে আর কোথাও আমার কোনো দোষ নেই। কোনো ত্রুটি নেই। তাই অর্ক যদি আমার কথায় ব্যথা পেয়ে থাকে তবে তার সমস্ত দায় আমার একার নয়।

—'আয় বোস।' অভিজিৎ স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল—'পকোড়া খাবি?'

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ি—'পকোড়া? কোথায়?'

—'এখনো নেই। তবে আসবে। অনেকক্ষণ ধরেই মনটা "চিকেন পকোড়া...চিকেন পকোড়া" করে নাচছে। কিন্তু একা একা খেতে পারছি না। অর্কও খাবে না বলছে। এখন যদি তুই খাস তবে অর্ডারটা দিই।'

আমি কিছু বলার আগেই অর্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অভিজিতের দিকে তাকায়—'তোর না ছিপি এঁটে গিয়েছিল? তুই আবার ও চিকেন পকোড়াগুলি খাবি।'

সে মুখ কাঁচুমাচু করে বলল—'খেতে দে না বাপ! আর তো মাত্তর দুটো দিন। কাল বাদে, পরশু বাদে, তরশুই তো ফিরছি। ফেরার পথে ট্রেনের ওই বাপে খেদানো, মায়ে তাড়ানো খাবারগুলো খেতে হবে। আর বাড়ি ফিরে যথারীতি...।'

—'যা পারিস কর। আমি এর মধ্যে নেই।'

অভিজিৎ কিছুক্ষণ উশখুশ করে চুপ করে গেল। পরিস্থিতি অনাবশ্যক গম্ভীর হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে চিকেন পকোড়া খাওয়া উচিত কিনা তা নিয়ে সে রীতিমতো দ্বন্দ্বে। হেসে বললাম—'হলে মন্দ হয় না। আজকে বেশ ঠান্ডাও আছে।'

—'এগজ্যাক্টলি। আমিও তো তাই-ই বলছিলাম।' অভিজিৎ উৎসাহে প্রায় নাচতে শুরু করেছে—'এমন এনভায়রনমেন্টে গরম গরম পকোড়া না হলে জমে? যাই অর্ডারটা দিয়ে আসি।' সে নাচতে নাচতে অর্ডার দিতে চলে গেল।

অর্ক মুখ নীচু করে বসেছিল। মনখারাপ করা বিবর্ণতায় সারামুখ

নিষ্প্রভ। সচরাচর তাকে এতটা চুপচাপ দেখা যায় না। সারাক্ষণই একটা 'জেন্টল স্মাইল' মুখে ঝলমল করে। আজ সেটা নেই।'

—'তোর মদের স্টক কি শেষ হয়ে গেছে?' সে অন্যদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল—'এখনো খেতে শুরু করিসনি যে?'

হাসলাম—'নাঃ...আছে। একটু বাদে খাব। এখন একটু আড্ডা মেরে নিই। তারপর দেখা যাবে।'

—'কার সাথে আড্ডা মারবি?'

—'কেন? তোদের সাথে!'

—'আমাদের সাথে? কেন? আমরা তো কেউ নই! কতগুলো থার্ড পার্সন প্লুরাল নাম্বারের সাথে আড্ডা মারার দরকারই বা কী?'

নিজের কথাটাই বুমেরাং হয়ে ফিরে এল! অর্ক আমার গুটি দিয়েই আমাকে গজচক্র করার প্ল্যান আঁটছে। এর উত্তরে কী বলব বুঝে পেলাম না।

—'অর্ক, কথাটা আমি ওভাবে বলতে চাইনি। যদি দুঃখ পেয়ে থাকিস...।'

—'দুঃখ আমি পাইনি সম্রাট।' অর্ক রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল—'Shocked হয়েছি। এত বিক্ষিপ্ত মেজাজ তোর তো আগে ছিল না! একটু মুডি ছিলি। কিন্তু আজকাল যেভাবে react করছিস তাতে রীতিমতো ভয়ই লেগে যাচ্ছে। কখন কোন্ কথাটা বললে কী মূর্তি ধরবি তাও বুঝতে পারছি না। আজকাল তুই বড্ড দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছিস।'

—'তাই! জীবনানন্দের কবিতার মতো?'

—'ঠাট্টা নয়—ব্যাপারটা যথেষ্ট সিরিয়াস। তোর টেম্পারামেন্ট যদি এভাবে ক্রমশই আনপ্রেডিক্টেবল হতে থাকে, তাহলে কে তোকে সহ্য করবে? আমরা না হয় কয়েক ঘণ্টার সঙ্গী। বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বললাম না! তোর মা-ও অপত্য স্নেহে চুপ করে থাকলেন। কিন্তু বাদবাকিরা?'

—'বাদবাকি আর রইল কে?'

অর্ক একটু থেমে বলল—'তুই কি কিছু চেপে যাচ্ছিস সম্রাট? Any tension or disturbances? যার থেকে এইগুলো হচ্ছে?'

—'No...Not at all...'

—'চাপবি না। চেপে গেলে কোনো কিছুই সমাধান হবে না। বল কী সমস্যা?' অভিজিৎ অর্ডার দিয়ে ফিরে আসছিল। দরজার মুখ থেকেই বোধহয়

কথাটা শুনতে পেয়েছে। ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল—'সমস্যা তো আছেই। হে-ভি চাপ। আমি জানি কেসটা কী?'

—'কী কেস?' অর্ক একবার অভি আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—'চাপটা কী? বন্দনা?'

আমি বিপন্ন বোধ করি। এই প্রসঙ্গটায় যতটা ক্লান্তি আছে, ঠিক ততটাই অস্বস্তি। যখনই বুঝতে পারি আমার অন্তরঙ্গ অনুভবগুলোকে নিয়ে এইবার কাটাছেঁড়া শুরু হবে তখনই নিজেকে পোস্টমর্টেম টেবিলে শুয়ে থাকা উলঙ্গ লাশ বলে মনে হয়। ভিতরে, বাইরে কোনো আবরণ নেই। ইচ্ছেমতো ছুরি, কাঁচি চালিয়ে গোপনীয়তা ছিন্নভিন্ন করে আমার ভিতরের সমস্ত উচিত-অনুচিত, আবেগ-নির্মমতাকে সবার সামনে প্রকাশ্যে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনো মূল্যই সেখানে নেই।

—'ওর প্রতি তোর কোনো ফিলিংস নেই সেটা ওকে জানাসনি?' মাথা নাড়লাম।

—'তাহলে আবার কী! মিটেই তো গেল!'

অভিজিৎ বলল—'আরে টুনির মাথায় সেকথা ঢুকলে তো! সে রীতিমতো নাছোড়বান্দা। একেবারে আদা-নুন খেয়ে লেগে পড়েছে। আমিও বোঝানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু সে বোঝেই না।'

অর্ক বিরক্ত হয়ে বলল—'বোঝে না মানে? মাথামোটা নাকি? সেই এক কথা ঘ্যানঘ্যান করে সবার কান মাথা খেয়ে নিচ্ছে। বারবার বলা সত্ত্বেও কি সহজ কথাটা মাথায় ঢোকে না! কোথায় সে? ডাক। আমি এখনই ঝামেলা চুকিয়ে দিচ্ছি।'

—'অর্ক, থাক।' আমি বাধা দিলাম। কেন জানি না মেয়েটার উপর আর অত্যাচার করতে ইচ্ছে করছে না। সবার সামনে দাঁড় করিয়ে বোঝানো মানে ওর অনুভূতিটাকে বারোয়ারি করে দেওয়া। সেটা মেনে নিতে মানবিকতায় লাগল। আমাদের সমস্যা আমাদের মধ্যেই থাক। আর কাউকে ঢুকিয়ে দরকার নেই।

—'কেন থাকবে? মিটিয়ে ফেলাই ভালো।'

—'তবে তুই মেটা। আমি উঠছি।'

—'তুই উঠলে চলবে কী করে?'

—'না অর্ক। I can't support these things. This is not the right

way...' প্রফেসর মুখার্জি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছিলেন। আমাকে উঠতে দেখেই হেঁকে বললেন—'আরে, আমি এলাম, আর তুমি চললে! এটা কেমন হল?'

—'একী! আপনি!' অর্ক তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল—'প্রফেসর রুদ্রকে কার জিম্মায় রেখে এলেন? আমরা সব ছেলেরাই তো এখানে।'

—'তাই তো।' অভিজিৎ আঁতকে উঠেছে—'তিস্তা বা বন্দনাকে রেখে আসেননি তো? লোকটার আবার মেয়েতে অ্যালার্জি...।'

প্রফেসর মুখার্জি মিটমিট করে হাসছেন—'মধুসূদন বলেছিলেন "রেখো মা দাসেরে মনে।" মা মনে রাখলেও রাখতে পারেন। কিন্তু বাবারা দেখছি ভুলে মেরেছেন। যতদূর মনে পড়ছে আমরা চারজন ছাড়াও আরো একটা পুরুষমানুষ আছে।'

অর্ক আর অভিজিৎ হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে আমিই মুখ খুললাম—'দাসবাবুকে যে রেখে এলেন তার গিন্নির পারমিশন নিয়েছেন তো?'

—'পারমিশন না নিয়ে পারি? হার হাইনেসের দাস ধার নিতে যাচ্ছি, তার পারমিশন তো নিতেই হবে।' তিনি বসতে বসতেই বললেন—'আঃ হা! পকোড়ার গন্ধ পাচ্ছি। অর্ডার করেছ নাকি?'

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম বেয়ারা পকোড়ার ট্রে নিয়ে আসছে। দূর থেকেই সুগন্ধের চোটে মুখে লালা জমার উপক্রম। এমন ঠান্ডা ঠান্ডা আবহাওয়ায় গরম গরম পকোড়া!—ব্যাপারটাই আলাদা!

—'অমৃত!' প্লেট থেকে পকোড়া তুলে সটান মুখে ফেলে দিয়ে চিবোতে চিবোতে প্রফেসর চোখ বুঁজেছেন—'অনেকদিন পরে এত ভালো পকোড়া খেলাম। লাস্ট খেয়েছিলাম কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে। তা-ও প্রায় বছর ছয়েক আগে।'

অভিজিৎ বলল—আমি কফি হাউসে গিয়েছিলাম বছর দুয়েক আগে। তাও দায়ে পড়ে। আমার এক কলিগ তার নেট-বান্ধবীর সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। বেচারা একা একা সাহস পাচ্ছিল না তাই...।'

—'তাই তোকে সাথে নিয়ে গেল!' অর্ক এতক্ষণ 'খাবো না, খাবো না' করলেও এইবার একটা হৃষ্টপুষ্ট পকোড়া তুলে নিয়ে তাতে টম্যাটো সস মাখাচ্ছে—'তোর কলিগটা কী পদার্থ-দেখার ইচ্ছে রইল।'

—'মানে? তুই ভেবেছিস কী আমায়? জানিস! অফিসে যত লোকের লাভ প্রবলেম সব আমিই সল্‌ভ করি। আমার এক কলিগ সুমিত কুলকার্নির বউয়ের সাথে যখন ঝগড়া চলছিল তখন তার ইললিগ্যাল অ্যাডভাইসর আমিই ছিলাম।'

—'ওয়েট...ওয়েট...।' অর্ক প্রায় লাফিয়েই পড়েছে—'সুমিত কুলকার্নি মানে উইপ্রোর অমিত কুলকার্নির দাদা তাই না? এখন আমেরিকায় আছে! তাই তো?'

—'হ্যাঁ...কিন্তু...।'

—'ফাইন। তবে তোর অ্যাডভাইসের লেটেস্ট ফলাফলটা জানিয়ে দিই। সুমিত কুলকার্নির বিয়েটা ভেঙে গেছে। এই বছর 5th March কোর্টে ওদের মিউচুয়াল ডাইভোর্স হল।'

প্রফেসর মুখার্জি সজোরে হেসে উঠেছেন। অভিজিৎ অপ্রস্তুত। মুখটা ব্যাজার করে বলল—

—'এটা আমার অ্যাডভাইসের দোষ নয়। সুমিতটা এক নম্বরের চুতিয়া...।'

—'প্রেমের সমস্যা সমাধান করা খুব সহজ নয় অভিজিৎ। প্রফেসর হাতের তেল টিস্যু পেপারে মুছছেন—'সলিউশনটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে। দুনিয়ায় কত রকমের মানুষ আছে তাদের সাইকোলজি একেকরকম। রিঅ্যাকশন আলাদা আলাদা। সবার ধাতে সব অ্যাডভাইস সয় না। তোমার চোখে যেটা ঠিক বলে মনে হচ্ছে—অন্যের চোখে তা ভুল হতে পারে। তাই এরকম স্পর্শকাতর বিষয়ে দুমদাম সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ঠিক নয়।'

—'আমি যদি ভুল না করি স্যার...।' অর্ক হেসে বলে—'আপনিই কলেজ লাইফে দুর্দান্ত লাভ প্রবলেম সল্‌ভ করতেন। বাবা একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন...।'

—'দুর্দান্ত কি না জানি না। তবে প্রজাপতির আশীর্বাদে কলেজ লাইফে অনেক হৃদয় জুড়ে দিয়েছিলাম। তারা পরে বিয়েও করেছে। এবং এখনো সাকসেসফুল ম্যারেড লাইফ লিড করছে।

কথাটা কোন্ দিকে বাঁক নিতে যাচ্ছে তার একটা অস্পষ্ট ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। আশঙ্কায় প্রায় কাঠ হয়ে বসে ছিলাম। আমাকে আরো ঘাবড়ে দিয়ে, আশঙ্কাকে সত্যি করে অভিজিৎ বলল—'তাহলে সম্রাটের

প্রবলেমটাও সলভ করে দিন না।'

প্রফেসর ভুরু কুঁচকে তাকালেন—'সম্রাটের লাভ প্রবলেম! সম্রাট প্রেম করতে জানে নাকি!'

—'জানে না বলেই তো প্রবলেম!' অর্ক যতটুকু জানে তার পুরোটাই খুলে বলল। প্রফেসর খুব মন দিয়ে শুনছেন। ডান হাতের আঙুল দিয়ে মাঝেমধ্যে টেবিলের উপরে 'তেরে কেটে তাক' বোলও তুলছেন। মাঝেমধ্যে ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে। কখনো চোখ ছোটো কখনো বা বড়ো। নাতিদীর্ঘ পাঁচ মিনিটে গোটা ঘটনার ভূগোল ইতিহাস এক নিঃশ্বাসে বর্ণনা করার পর সে একটু থেমে বলল—'আমি ভাবছিলাম ওকে এখানে ডেকে এনে বোঝানোর চেষ্টা করব। কিন্তু সম্রাট বারণ করছে।'

—'হম্‌ম্‌ম্‌...।' 'প্রফেসর আমার দিকে দেখছেন। চোখ নয়, এক্স রে। কিছুক্ষণের জন্য মনে হল আমার গায়ে রক্তমাংস নেই। শিরা, পেশি, হাড় কিছুই নেই।

—'আমি শুধু এইটুকুই বলব অর্ক।' তিনি আস্তে আস্তে বললেন—'সম্রাট should think about himself. বন্দনাকে বোঝানোর চেয়ে ওর নিজেকে বোঝাটা বেশি জরুরি।'

—'মানে? ঠিক বুঝলাম না স্যার।'

—'Well,' ...সময় নিয়ে নিয়ে তেঁতুল খাওয়ার মতো চেখে চেখে তিনি বললেন,

—'যতদূর আমি জানি মেয়েদের সিক্সথ সেন্সটা ভয়ানক প্রখর। কোনো একজন পুরুষমানুষের দৃষ্টি, স্পর্শ, হাবভাবের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে ওরা এমন অনেক কিছু বুঝতে পারে যা অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। একটা জিনিস লক্ষ করো মেয়েটি কতটা কনফিডেন্ট। সম্রাটের যা পার্সোনালিটি তাতে যে কোনো মেয়ে তার প্রশ্রয় ছাড়া এতটা এগোনোর আগে কয়েকশো বার ভাববে। বন্দনা কিন্তু তা ভাবছে না।'

—'আপনি বলতে চান আমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছি'।

—'আমি তা বলিনি।'

—'তবে?'

—'শুধু তোমাকে আরো একবার ভাবতে বলছি। ভালো করে ভেবে দেখো সত্যিই তুমি ওকে রিফিউজ করতে চাও কি না।'

—'যাঃ শা...।' অভিজিৎ আধহাত জিভ কাটে—'সরি...সরি।' কিন্তু এ তো কেঁচে গণ্ডুষ। এতবার রিফিউজ করার পরও ওকে ভাবতে হবে যে সত্যিই রিফিউজ করতে চায় কি না?'

—'কখনো কখনো কেঁচে গণ্ডুষ করাটাও লাভজনক অভিজিৎ।' প্রফেসর মুচকি হাসলেন—'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই/পাইলেই পাইতে পার অমূল্য রতন।'

তার আঙুল আবার টেবিলের উপর তাল ঠুকল—'তেরে কেটে তাক।'

আমার বাড়িতে বিরাট দুটো অ্যাকোয়ারিয়াম আছে। সেখানে রঙিন মাছ কিলবিল করে বেড়ায়। কিসিং গোরামি দুটো রুপোলি শরীর নিয়ে মাঝেমধ্যেই পরস্পরকে চুমু খেয়ে নেয়। অ্যাঞ্জেল, ফাইটার আর হোয়াইট শার্কের ফিনফিনে পাখায় স্মার্ট ছটফটে গতি। ছোট্ট ছোট্ট কচ্ছপ, আর ঈলের লতানে আলস্যে সুললিত।

আর একটা অ্যাকোয়ারিয়ামে পিরান্‌হা পুষেছি। ধারালো মাংসাশী দাঁত বের করে সব সময়ই কামড়াবার জন্য তৈরি হয়ে আছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়। একবার আরশোলা, ব্যাঙ ফেলার সময় চাকরের আঙুলের মাথা কেটে নিয়েছিল। চাকরটা প্রথমে টের পায়নি। অ্যাকোয়ারিয়ামের জল হঠাৎ লাল হয়ে যাচ্ছে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। হাতটা জল থেকে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই কাঁউমাঁউ করে বিকট চিৎকার।

আমার ঘরে দুটো অ্যাকায়ারিয়ামেই পাশাপাশি থাকে। মাঝখানে দুটো কাচের দেওয়াল। এপাশে পেলব কিসিং গোরামি চুম্বনোদ্যত। আর ওপাশে পিরান্‌হার খুনি দাঁত। দাঁত আর ঠোঁট। চুম্বন আর কামড়। দুটোতেই কি সমান রক্ত ঝরে?

ব্রেজারগুলো বড়ো সুটকেসে যাবে। জিন্‌সের সেট দুটো ট্রলিতে। পুলওভার আর জ্যাকেটগুলোও ভি আই পি-তে। শেভিং সেটটা পরে গুছোব। আপাতত দুটো জুতো বাইরে থাক। বাকি দুটো ট্রলিতে যাবে। ক্যাসুয়ালগুলোর কয়েকটা ছেড়ে বাকিগুলো ভরে ফেলি নয়তো পরে ভুলে যাব...।

—'এখন থেকেই গুছোতে শুরু করলে?' প্রফেসর বেতের চেয়ারে বসে সকালের নরম রোদ পোয়াচ্ছিলেন। গরম কফিতে চুমুক দিতে দিতে পেপার

পড়ছেন। মাঝেমধ্যেই আড়চোখে আমার প্যাকিং পর্ব দেখছেন। আর মিটমিট করে হাসছেন। আমি এমনিতে এসব কাজে আনাড়ি। জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ পণ্ড করতে যতটা ওস্তাদ, গুছোনোর বেলায় ঠিক ততটাই অষ্টরম্ভা। তার উপর প্রফেসরের সকৌতুক দৃষ্টির সামনে রীতিমতো নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি। কপালের ঘাম মুছে ফেলে বললাম—'এখন থেকে না শুরু করলে পরে ভুলে যাব প্রফ। তাছাড়া একদিনে সমস্ত গুছিয়ে ওঠা আমার সাধ্য নয়।'

—'হুম্। হেল্প লাগবে?'

—'No...No Prof.। আমি নিজেই পারব।' একটা ট্রাউজার ভাঁজ করতে করতে বললাম—'এমন কী কাজ? কয়েকটা জিনিসপত্রই তো।' প্রফেসর তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো জিনিসপত্রের স্তূপের উপর একবার বুলিয়ে নিলেন। মুচকি হেসে বললেন—'হ্যাঁ...কয়েকটা জিনিসই বটে। আশা করি তুমি পারবে।'

গোটা তিনেক স্যুট, গুচ্ছ ক্যাসুয়াল, গাদাগুচ্ছের জিন্‌স, পারফিউম, মাউথ ফ্রেশনার, মাউথ স্প্রে, ডিওডোর‍্যান্ট, বডি স্প্রে, হেয়ার জেল, কাজুবাদাম, চেরীর প্যাকেট, গ্লুকোজ, ডিক্সান্টার, ব্র্যান্ডি, বিয়ারের ক্যান, গুচ্ছ সিগারেটের প্যাকেট, হার্ড ড্রিংসের স্টক, এখান থেকে কেনা নতুন কিছু শেরওয়ানি, ঘড়ি, জুতো, মুক্তোখচিত সিগ্রেট কেস, কাচের শোপিস, রুপোর মোমবাতিদান, শয্যাসঙ্গিনীদের জন্য জুয়েলারি, কিউরিও...ওঃ...যতই দেখছি ততই বুক দুরুদুরু করছে। মার্কেটিং করার সময় একবারও ভাবিনি যে এগুলোকে নিয়ে যাব কী করে। তখন ভাবলে এখন চোখ ছানাবড়া হয়ে যেত না।

তবু আস্তে আস্তে যতটা সম্ভব গুছিয়ে ব্যাগে ভরছি। গোছানোর চোটে ভি আই পি জ্যাম। কিছুতেই আটকাচ্ছে না। চাপাচাপির চোটে একটা কাচের শো-পিস চিড় খেয়ে গেল। প্রফেসর মুখ টিপে হাসছেন দেখে রাগও হচ্ছে। ওদিকে ভি আই পি-টাও সাধ মিটিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করেছে। প্রাণপণে বন্ধ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু বন্ধ হওয়ার নাম-ই নেয় না।

—'জিন্‌সটাকে বের করে নাও। বন্ধ হয়ে যাবে।' তিনি পেপারটাকে টেবিলের উপর ভাঁজ করে রেখে উঠে এসেছেন—'সরো, তোমার কম্ম নয়। হুড়ুম হুড়ুম করে কি সব কাজ হয়? বুদ্ধি আর ধৈর্যও লাগে।'

—'তার মানে আপনি বলতে চান আমার বুদ্ধি নেই?'

—'না, তা বলব কেন?'

—'তবে আমার কাজটা আমাকেই করতে দিন না।'

প্রফেশর ভি আই পি-টা ঠেলে দিলেন—'বেশ করো।'

আমি আবার ব্যাগ, ট্রলি, আর জিনিসপত্র নিয়ে পড়লাম। প্রফেসর আবার চেয়ারে ফিরে গেছেন। হাতলের উপর হাতদুটো আলগোছে রেখে এদিকেই দেখছেন। মুচকি হাসিটা ঠোঁটে লেগে আছে আমি যে ডাঁই করা জিনিস নিয়ে নাকানি চোবানি খাচ্ছি—এটাই তার আমোদের বিষয়। আস্তে আস্তে আমার জেদের পারদ চড়ছিল। এর চেয়ে অনেক দুঃসাধ্য কাজ করেছি। হার মানতে শিখিনি। আর এই বক্টা লাগেজ গোছাতে পারব না?

বাইরে তখন মেঘ করে আছে। ঝড় বা বৃষ্টি আসেনি। কালসিটে পড়ার মতো নীলচে কালো রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘ এসে জড়ো হয়ে আছে মাত্র। মাঝেমধ্যে রুপোলি বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আশেপাশে কোথাও হয়তো বৃষ্টি হচ্ছে। তারই ভিজে ভিজে দমকা হাওয়া আসছিল মাঝেমধ্যে।

—'আর কিছু না হোক, তোমার জেদের প্রশংসা করতেই হয় সম্রাট।'

—'থ্যাঙ্কস।'

—'তুমি জানো এ কাজটা তুমি পারবে না, তা সত্ত্বেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ।'

—'কে বলল পারি না?' আমি ব্যাগের চেন টেনে দিয়ে বলি—' আমাকে অনেক অফিসিয়াল ট্যুরেই এদিক-ওদিক যেতে হয়। সেখানে তো আর হেল্প করার জন্য আপনি থাকেন না।'

—'দেশের বাইরে কোথাও গিয়েছ এখনো পর্যন্ত?'

—'চিন, জাপান, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মানি, ইংল্যান্ড...।'

—'ওরে বাবা। তাহলে তো গোটা বিশ্বই ঘুরে ফেলেছ দেখছি।'

হাসলাম—'পৃথিবীটা অনেক বড়ো প্রফ। সবটা ঘোরা কি সম্ভব?'

—'তবু যথেষ্টই ঘুরেছ।' তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—'মাঝেমধ্যে তোমাকে খুব হিংসে হয় জানো।'

—'হিংসে! কেন?'

—'তুমি তোমার ভাগ্য গড়ে নিতে পেরেছ সম্রাট। আকাশে মাথা ঠেকাতে পেরেছ। আমাদের মতো গড়পড়তা জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকোনি।'

আমি কথার উত্তর না দিয়ে প্যাকিয়ে মন দিলাম। আমার ভাগ্য মানে

হেডেক আর ইনসিকিউরিটি। কিন্তু সে কথা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না বোঝানোর চেষ্টা করাও বৃথা। তার চেয়ে পারফিউম, বডি স্প্রে, অডিকোলনের শিশিগুলোকে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ঢোকানোর চেষ্টা করাই ভালো।

প্রফেসর বোধহয় আরো কিছু বলতে চাইছিলেন। হয়তো বলতেনও। কিন্তু দরজাটা হঠাৎ খুলে যেতে দেখে কথাটা গিলে ফেলে উৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকালেন।

—'আসব স্যার।'

গাইড শিবাকুমারণ। গোলাপি রঙের শার্ট, কালো রঙের ট্রাউজার। হাতে একটা বাদামি রঙের প্যাকেট। এক ঝলক বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করে বলল—'অর্কবাবুকে বলে আমার টাকাপয়সা মিটিয়ে দিন স্যার, আমি চলে যাই।'

সেকী! আমরা দুজনে অবাক। চলে যাবে মানে! এখনো তো কালকের প্রোগ্রাম বাকি আছে। পরশু আমাদের সেকেন্দ্রাবাদে ট্রেনে তুলে দেওয়ার পর ওর চলে যাওয়ার কথা। তার আগেই চলে যেতে চাইছে! ব্যাপারটা কী?

শিবাকুমারণ সোফার উপর বসে পড়ল। তার শার্টের বুক পকেটটা বেশ ঝুলে পড়েছে। উপরের ফাঁকা অংশ দিয়ে একটা নীল মোবাইলের উঁকিঝুঁকি। সেন্টার টেবিল থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে চোঁ চোঁ করে জলটুকু খেয়ে বলল—'আমার আর ঝামেলা ভালো লাগছে না। আপনি অর্কবাবুকে বলুন, আমায় যেন ছেড়ে দেয়।' প্রফেসর বোধহয় আমার মতোই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ এই প্রসঙ্গের অবতারণা কেন তা বুঝে উঠতে পারছেন না। বিস্ময়ের ধাক্কাটা কোনোমতে সামলে নিয়ে বললেন—'কেন কী হয়েছে?'

একথার উত্তরে সে যা জানাল তা একদিকে যেমন পিলে চমকানিয়া, অন্যদিকে তেমন বিরক্তিকরও। দাসবাবু নাকি রামোজি ফিল্ম সিটিতে গিয়ে অন্য একটি ট্যুরিস্টদলের সঙ্গে ভাব জমিয়েছিলেন। তাদের কাছ থেকে ভ্রমণ ও গাইডের সম্পর্কে বিশদ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার মনে হয়েছে যে শিবাকুমারণ স্বাভাবিক রেটের চেয়ে অনেক বেশি চার্জ করেছে। আজ সকালে সে আসতে-না-আসতেই প্রায় তার উপর লাফিয়ে পড়েছেন এবং অনেক কথাও বলেছেন যা শুনতে কারোর-ই ভালো লাগে না।

—'যদি মনেই হয় আমি আপনাদের ঠকিয়েছি, তাহলে আমায় রেখেছেন কেন? আপনাদের ট্যুর তো প্রায় শেষ হয়ে এল। কালকের প্রোগ্রামও এমন কিছু ইম্পর্ট্যান্ট নয়। নিজেরা নিজেরাই দেখে নিতে পারবেন।

আমায় ছেড়ে দিন।'

—'কী মুশকিল!' প্রফেসর বললেন—'এই কথায় তুমি এত রিঅ্যাক্ট করছ কেন? ওনার মনে হয়েছে, উনি বলেছেন। তোমার শোনার কথা নয়, শুনবে না। একটা সামান্য জিনিস...।'

—'এটা সামান্য জিনিস নয় স্যার। এতে মার্কেটে আমার নাম খারাপ হবে। তা ছাড়া আমি এতে অপমানিত বোধ করছি। এরপরও আমায় থাকতে বলেন?'

—'আরেঃ'। তিনি একটা ধমক দিলেন—'এত ইমোশন্যাল হলে চলে? তুমি না এখানকার সেরা গাইড! প্রত্যেক ট্যুরিস্ট দলেই কি সব ভালো ভালো কথা বলার লোক থাকে? এত প্রেস্টিজ থাকলে গাইডগিরি ছেড়ে দাও। এ লাইন তোমার জন্য নয়।'

ভেবেছিলাম হয়তো চটে লাল হয়ে চলেই যাবে। কিন্তু শিবাকুমারণ মাথা হেঁট করে বকুনিটা হজম করল। গোঁজ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল—

—'ঠিক আছে আপনি যা চান তাই হবে। কিন্তু ওই ভদ্রলোক...।'

—'ওকে আমি সামলে নেব'খন। ও চিন্তা তোমায় করতে হবে না।' প্রফেসর এবার গলায় নরম সুর মাখিয়ে বললেন—'তাছাড়া উনি তেমন গুরুত্বপূর্ণ লোক নন। যদি কিছু বলে তাহলে পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই।'

—'আচ্ছা। সে মাথা নাড়ে।'

—'থাক। এখন এ প্রসঙ্গ বাদ দাও। কাজের কথা বলো। এত সকাল সকাল হাজির হয়েছ যে? কোনো দরকার ছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ'—শিবাকুমারণের যেন কিছু মনে পড়ে গেল। সে টান টান হয়ে বসেছে—'আপনারা তো পরশুই চলে যাচ্ছেন। কাল সকালে সারাদিন ব্যস্ত থাকব। তাই ভাবছিলাম, প্রফেসরকে একটু দেখে যাই। আর তো দেখতে পাব না।'

—'প্রফেসরকে দেখবে?' প্রফেসর মুখার্জি উঠে দাঁড়ালেন—'বেশ তো, এসো।'

প্রফেসর রুদ্র তখন একজোড়া চপ্পল নিয়ে খেলা করছিলেন। নাঃ, খেলা করছিলেন বললে কেমন যেন খাপছাড়া শোনায়। তার চেয়ে বলা ভালো, নাড়াচাড়া করছিলেন। চপ্পল দুটো খুব সম্ভবত অভিজিতের। সে বিছানার উপর আড়কাত হয়ে কাগুটা দেখছে। প্রফেসর দুহাতে দু পাটি জুতো পরে মেঝের

উপর ঘষছিলেন। কখনো উলটো করে ধরে সোলের কারুকার্যের উপর আঙুল রেখে হয়তো ভাবছেন তার প্রাসাদের থামে বা জাফরিতে এই ডিজাইনটা হলে কেমন হয়। মাঝখানে একপাটি চটিকে ভাঁজ করে কিছু একটা এক্সপেরিমেন্ট করার কথা ভাবছিলেন। ছেড়ে দিতেই চটাস করে লাগল থুতনিতে। খেপে গিয়ে আমাদের দিকেই ছুড়ে মারলেন।

—ওঃ...মাইঃ...।'

ছোটোবেলায় মার্শাল আর্টের ট্রেনিং নিয়েছিলাম। এইবার সেটা কাজে লাগল। চপ্পলটা ধাঁ ধাঁ করে আমার নাকের দিকে ছুটে আসছিল। 'ডাক' করে বসে পড়ায় আপাতত দেওয়ালের উপর দিয়েই ফাঁড়াটা কেটেছে।

—'ঠিক আছ সম্রাট?'

—'আছি, প্রফ। উঠে দাঁড়িয়ে বলি—'লাগেনি।'

—'লাগলে নাকটা মায়ের ভোগে যেত।' অভিজিৎ বিড়বিড় করে বলল—'খানদানি চপ্পল। দশ বছর আগে কিনেছিলাম। এতদিনে ছেঁড়েনি। তবে এবার বোধহয় ছিঁড়বে। শা-লা ঘেঁটে ঘেঁটে ওটার প্যাটাপিত্ত বার করে দিচ্ছে।'

—'তোকে আমি একটা নতুন চপ্পল কিনে দেব।' আমি ঘরে গিয়ে শিবাকুমারণকে জায়গা করে দিয়েছি—'যান।'

অভিজিতের মুখটা হঠাৎ কেমন বদলে গেল। আমায় মেপে নিয়ে বলল—'কিনে দেওয়ার দরকার নেই। আমি নিজেই কিনে নিতে পারব।'

প্রফেসর রুদ্র কৌতূহলী দৃষ্টিতে এদিকেই তাকাচ্ছেন। শিবাকুমারণকে চিনতে পেরেছেন বলে মনে হল না। এক ঝলক তার দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর যাবতীয় মনোযোগ আবার গিয়ে পড়েছে আরেক পাটি জুতোর উপর। সেটার স্ট্র্যাপ ধরে টানাটানি করছেন।

—'স্যার।'

শিবাকুমারণ তার সামনে গিয়ে বসে পড়েছে। ওর চোখ ছলছল করছে। বাদামি প্যাকেটা মেঝের উপর রেখে ডাকল—'স্যার কেমন আছেন?'

প্রফেসর মুখ তুললেন না। বরং চটির পাটিটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।

শিবাকুমারণের মুখে হতাশা ছায়া ফেলে সরে গেল। গভীর মমতামাখা গলায় আবার বলল—'কলকাতায় গিয়ে আমাদের ভুলে যাবেন না তো? মনে রাখবেন তো স্যার?'

এবারও কোনো উত্তর নেই। কথাগুলো যেন হাওয়ার উদ্দেশ্যে বলা

হচ্ছে।

—'ভালো হয়ে আবার আসবেন। আবার দেখা হবে।'

সে উঠে দাঁড়াল। বাদামি প্যাকেটটা প্রফেসর মুখার্জির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল।

—'এটা ওঁর জন্য। দিয়ে দেবেন।'

শিবাকুমারণ শার্টের হাতায় চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল। তার ধীর বেদনার্ত চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়েই অভিভূত হয়েছিলাম। লোকটাকে কোনোদিন নিতান্তই সাধারণ একটা গাইড ছাড়া কিছু ভাবিনি। পুরো সফরেই তার ভাবলেশহীন মুখ দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। ভেবেছিলাম লোকটা অসম্ভব পোশাদার। মেকানিক্যালও। কিন্তু বোধহয় ভুল ভেবেছিলাম।

বাদামি প্যাকেটটার ভিতরে একটা ঝকঝকে শাল ছিল। আর ছিল বেশ কয়েকটা বই। আমি বইয়ের তেমন কিছু বুঝি না। প্রফেসর বললেন এর প্রত্যেকটাই দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের উপর লেখা দামি ও দুষ্প্রাপ্য বই।

প্রফেসর রুদ্র জুতোর পাটিটা হঠাৎ ছুড়ে ফেলে মুখ তুলে তাকালেন। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। উদভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক কী যেন খুঁজতে খুঁজতেই চিৎকার করে উঠলেন—কৌন!...কৌন!...কিসনে কঁহা...।'

কে আবার কী বলল? যা বলার তা তো শিবকুমারণই বলে গেল। উনি শুনেছেন বলে তো মনে হয় না। তাহলে আবার কার কথা হচ্ছে?

—'উসে বুলাও...উসে বুলাও...উসে বুলাও...।'

ভেবেছিলাম আরো ফুঁসে উঠবেন। চিৎকার চেঁচামেচি আরো বাড়বে। মত্ত জন্তুর মতো মাথা ঠোকাঠুকি চলবে। কিন্তু প্রফেসরের ঝাঁজ হঠাৎ করে যেমন বেড়ে গিয়েছিল, তেমন হঠাৎ করেই নরম হয়ে এল। ঝড়ের উন্মত্ততা নয়। বৃষ্টির ফোঁটা জমিয়ে জল ভরে এল চোখে। খাঁচা সর্বস্ব বুকের ভিতর অদম্য কান্না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে। অভিমানী বাচ্চা ছেলের মতো বললেন—'ক্যায়া দেখতা হ্যায়? তামাশা? মজা আয়া না? সবকে সামনে তামাশা বনাকে রখ্‌খা হ্যায়...।

প্রফেসর কাঁদলেন না। কান্নার স্রোত তার গলায় ঝাপটা মারছে। তিনি চাপার চেষ্টা করছেন। এই দুই অদম্য আবেগের টানাপোড়েনে কথাগুলো বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। ফিসফিস করে বলেছেন—'তামাশা...তামাশা বনা দিয়া, তামাশা বনা দিয়া মুঝে...তামাশা বনা দিয়া...।'

বিকেলে ক্যাম্পফায়ার করার আইডিয়াটা কার ছিল জানি না। কিন্তু অর্ক আর অভিজিতের দেখলাম উৎসাহের শেষ নেই। কতগুলো কাঁচা আলু, ভুট্টা রান্নাঘর থেকে হাতিয়ে এনে অর্কর ঘরে ডাঁই করা হয়েছে। চকোলেটবার, চিপস, বাটার আর কোল্ডড্রিঙ্কসের বোতল বিছানার উপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। তুর্দিকে ছড়ানো চেরী, কাজু, কিচমিশ, খেজুর, আরো নানাবিধ শুকনো ফলের মাঝামাঝি বসে অর্ক গম্ভীর মুখে মেনু বানাতে ব্যস্ত। বিড়বিড় করে বলছে—'চিকেন তন্দুর, শিক-কাবাব, তন্দুরি রোটি...।'

—'তন্দুরি কেন? রুমালি কর না।' অভিজিৎ বাধা দিয়ে বলল—'রুমালি রুটি, বাটার পনীর, মুর্গা কা ভর্তা...।'

—'এটা ক্যাম্পফায়ার অভিজিৎ।' সে কটমট করে তাকিয়ে বলল—'বিয়েবাড়ির মেনু নয়।'

—'কিন্তু আমার তন্দুরি রুটি খেতে ভালো লাগে না। শক্ত শক্ত পোড়া পোড়া বিচ্ছিরি।'

অর্ক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে খাতায় লিখল—অভিজিতের জন্য রুমালি রুটি। দাসবাবু অনেকক্ষণ ধরেই কিছু বলার জন্য পাঁয়তাড়া করছিলেন। নীচু গলায় টুনির সাথে আলোচনাও করছিলেন। এবার গলা চড়িয়ে বললেন—'শিক-কাবাবটাও বাদ দাও ভাই, ওটা খাওয়ার দরকার নেই।'

—'কেন?'

—'কী দরকার? খাস বাদশাহী জায়গা। যদি বিফটিফ দিয়ে দেয়? ওসব কাবাব ঠাবাব...।'

—'আমরা তো বিফ খাওয়ারই প্ল্যান করছি। ইনফ্যাক্ট শিক-কাবাবটা বিফের-ই হবে।' অর্ক বলল বিফে আপনার অ্যালার্জি আছে নাকি?'

দাসবাবুর চোখ ব্রহ্মতালুতে ঠেকে গিয়েছে। বিষম খেতে গিয়েও কোনোমতে সামলে নিয়ে ঢোঁক গিলে বললেন—'তোমরা গোরু খাবে?'

অর্ক জোরে হেসে উঠেছে—'আপনি বিফ শুনেই ঘাবড়ে যাচ্ছেন? আরে, আমি তো কায়স্থ, অভি বৈদ্য। আমাদের মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণসন্তান সম্রাট চৌধুরী। ছোটোবেলায় ওকে রীতিমতো ন্যাড়া করে পইতে দেওয়াও হয়েছিল শুনেছি। ওকেই জিজ্ঞাসা করুন এখনো পর্যন্ত কোন্ কোন্ মাংস খেয়েছে।'

—'উহুঁ...ভুল হল।' অভি ছোট্ট নড করে বলে—'বরং জিজ্ঞাসা করুন কোন্‌টা খায়নি।' দাসবাবু চুপ করে গেলেন। অভিজিতের কথা শুনেই হয়তো তালিকার রকম সকমটা আন্দাজ করে থাকবেন। কিন্তু টুনি আস্তে আস্তে বলল—'কী কী খেয়েছ?'

সেদিনের কুৎসিত ঘটনাটার পর থেকে আজ অবধি সে আমার সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারেনি। একটা যন্ত্রণাদায়ক অস্বস্তি আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে। আজ কেমন ইতস্তত করে কুণ্ঠিত স্বরে প্রশ্নটা ছুড়ে দিল।

—'মুরগি, পাঁঠা, শুয়োর, গরু, কচ্ছপ, উট, ময়ূর, ভেড়া, কাঁকড়া, হরিণ, ব্যাঙ...।' একটু ভেবে দেখলাম। কিছু বাদ গেল কি?

—'ও...হ্যাঁ, সাপ আর আরশোলা।'

টুনি গোল গোল চোখ করে শুনছে। যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না এসব জিনিসও কেউ খেতে পারে!

—'তুমি এর সবগুলো খেয়েছ?'

একটু হাসলাম।

—'কী করে খেলে? সাপ খেয়ে কিছু হল না?' চোখ দুটোয় সরল বিস্ময়ে ফুটিয়ে সে বলল—'সাপ তো বিষাক্ত জিনিস!'

কিছু কিছু মানুষের সৌন্দর্য কখনো কখনো তার মন থেকে নেমে আসে শরীরে। একটা খুব কুৎসিত মানুষেরও ভিতরটা যদি সুন্দর হয়, তবে তার মুখে সে ছাপ পড়ে। সেই লোকটার চোখ যতই হাতির মতো হোক। কিংবা ট্যারা, নাক থ্যাবড়া দাঁত উঁচু হোক, সেই ছাপ-ই মানুষটাকে দৃষ্টিনন্দন করে তোলে। টুনিও তেমনই একটা মানুষ।

—জানোয়াররা সব কিছুই খেয়ে থাকে টুনি। সাপখোপ, ইঁদুর, ব্যাঙ, আরশোলা, টিকটিকি...।

টুনি চমকে উঠেছে। বড়ো বড়ো চোখদুটোয় একটু রক্তিমাভা। আস্তে আস্তে জলে ভরে এল। চোখ লুকোতে মুখ নীচু করে বলল—'sorry।'

—'সে যাই হোক।' দাসবাবু অর্ককে উদ্দেশ্য করে বললেন—'গোরুটা লিস্টে রেখো না অর্ক। তোমার কাকিমা শুনলে হুলুস্থুল বাঁধাবে।'

—'হুলুস্থুলু কাণ্ডটা কীসে হবে?' একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বললাম—'আমরা খেলে? না আপনি খেলে?'

—'যদি কোনোভাবে জানতে পারে আমি বিফ খেয়েছি...।' দাসবাবু মাথা

নেড়ে বললেন—'তা ছাড়া তোমাদের খাওয়ারই বা দরকার কী? জিনিসটা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়।'

—'আপনি বিফ খাবেন না। চিকেন মাটন তো আছেই। কাবাব না খেলেই হল।' সিগ্রেটটা মুখ থেকে নামিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললাম—'ব্যস। তা হলে আর হুলুস্থুলু হবে না।'

টুনি কখন যেন সবার অলক্ষে সন্তর্পণে চোখ মুছে ফেলেছে। কাঁচা ভুট্টার পাতার উপর হাত বোলাতে বোলাতে কী যেন আপনমনে ভাবছিল। চোখের গোড়ায় আর আগায় সামান্য লাল রং জমে আছে। হাতের কাছে মিক্সমেডের টিন আর বাটারের প্যাক চিত হয়ে পড়ে।

—'আচ্ছা, তা হলে কী ঠিক হল।' পেনের মাথা চোষা অর্কর পুরোনো বদভ্যাস। মুখ থেকে কলমটা নামিয়ে বলল—'আবার শুরু থেকে পড়ছি শোন। তন্দুরি রোটি, চিকেন তন্দুরি, ভেটকি মাছের পাতুরি, শিক-কাবাব, মাটন দো পেঁয়াজা, রায়তা...।'

—'স্যালাডটা বাদ গেল কেন?' মাঝখানে আবার অভিজিতের নাক গলানো।

—'ওটা থাকছে? না থাকছে না?'

—'না, থাকছে।' অর্ক ফর্দ থেকে মুখ তুলে বলল—ওটা সম্রাট বানাবে।'

—'আমি কেন?' আকাশ থেকে পড়লাম।

—'ন্যাকামি করিস না। তুই ভালো স্যালাড বানাতে পারিস তা আমরা সবাই জানি।'

—'সেটা আমিও জানি। কিন্তু এতজনেরটা...।'

—'পারবি।' সে বলল—'আর অভি, তুই আর টুনি ভুট্টা পোড়াবি। যে মাখন খাবে তাকে মাখন আর যে নুন, লেবু খাবে তাকে নুন, লেবু মেরে দিবি। বুঝলি।'

অভিজিৎ মাথা ঝাঁকাল 'বাদবাকি আইটেমগুলো কে করবে?'

—'ওগুলো হোটেল থেকে রেডিমেড নিয়ে যাব।'

—'ঠান্ডা হয়ে যাবে না?'

—'গরম করে নেব।' অর্ক আবার ফর্দে মন দিয়েছে—'হ্যাঁ...তারপর ফিরনি, গুলাবজামুন, রসগোল্লা আর সবশেষে বেনারসি পান।'

—'রসগোল্লা পেলি কোথায়?'

সে বেশ মাতব্বর গোছের হাসি মেরে বলল—'খুঁজে নিতে হয় বস। এখানে মিষ্টির দোকানে কে. সি. দাসের টিন্‌ড রসগোল্লা পাওয়া যায়। টিন খুলে গোটা কয়েক চেখেও দেখেছি—'আমাদের ওখানকার মতো না হলেও মন্দ নয়। একটু ছানা ছানা-সুজি সুজি খেতে।'

—'ব্যস।' অভিজিৎ ভুরু কোঁচকায়—'তিস্তা কোথায় জানতে পারি? ওর জানা দরকার বরের ঠোঙাভুঁড়ি কেমন করে বেলুন হচ্ছে।'

—'তিস্তা হোটেলের কিচেনে। স্টক থেকে আনারস সরাতে গেছে।'

—'ছি...ছি...ছি...।' সে বলে—'বউটাকেও চৌর্যবৃত্তি শিখিয়েছিস। সে হোটেলের স্টক থেকে আনারস সরাচ্ছে আর তুই টিন থেকে রসগোল্লা। ওরে শেষ পর্যন্ত আমাদের কপালে হরিমটর জুটবে না তো? আমাদের জন্য রস ছাড়াও দু-চার পিস বাকি রাখিস বাপ।'

—'তিষ্ঠ তিষ্ঠ বৎস।' অর্ক আমাদের দিকে ফিরল—'শোন, তুই আর দাসবাবু এইবেলা গাড়িটা নিয়ে বেড়িয়ে পড়। সব জিনিস তো আর হোটেল থেকে নেওয়া যায় না। সোমভদ্রবাবুও বিরক্ত হবেন। অন্যান্য জিনিসগুলো মোটামুটি মজুত আছে। ফল, কাঁচা আনাজ আর মাছ মাংসটা চারকামান থেকে নিয়ে আয়।'

—'কিন্তু আমি তো কোনোদিন বাজারই করিনি।'

—'এবার করবি। চাপ নিস না। দাসবাবু তো যাচ্ছেন। উনি এক্সপার্ট লোক।'

এরপর আর কিছু বলা চলে না। ভেবেছিলাম সকালটা একটু শুয়ে বসে কাটাব। কিন্তু অর্কর অনুগ্রহে সে সুখ আর সইল না। শশব্যস্ত হয়ে করিডোর ধরে নিজের ঘরের দিকে হাঁটা মারলাম এসব ঝামেলার কাজ আমার বিশেষ পোষায় না। তার উপর কাঁচাবাজার সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তা সত্ত্বেও অর্ক যখন বলেছে তখন যেতেই হয়। তাই জামাকাপড় চেঞ্জ করার জন্য রুমে যাচ্ছিলাম মাঝখানে পড়ে গেলেন সোমভদ্র চক্রবর্তী।

—'হ্যালো মিস্টার চৌধুরী।'

একটু বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। লোকটা আমাকে যে কথাগুলো গতকাল শুনিয়েছে সেগুলো এখনো মনে আছে। তারপর থেকেই ওর ভেলভেটের মতো মোলায়েম মুখ আর গলা শুনলেই বিরক্তি লাগছে।

—'আপনি বোধহয় কোথাও যাচ্ছিলেন। Sorry, কিন্তু আমাকে কয়েকটা

ইনফরমেশন দিন তো।'

—'বলুন।'

—'রাত্রে কি কেউ হোটেলে ডিনার করবেন?'

—'বোধহয়, দুই প্রফেসর সম্ভবত এখানে ডিনার করবেন।'

—'ওকে। সেকেন্ডলি বলুন। আজ বিকেলে চীজ পকোড়া হবে না পেঁয়াজি? অর্কবাবু বলেছেন চীজ পকোড়া। আর অভিজিৎবাবু বলেছেন পেঁয়াজি, কোন্‌টা ফাইনাল?'

—'সেটা ওরাই ভালো বলতে পারবে। ছশো এগারো নম্বর ঘরে দুজনেই আছে। পেয়ে যাবেন।'

—'থ্যাঙ্কস।'

সোমভদ্র চলে গেলেন। আমি আবার রুমে চলে এলাম। বাজারে যাচ্ছি। সেখানে কয়েকশো লোকের ভিড়। প্যাচ প্যাচে ঘাম, ঘেঁষাঘেঁষি, পলিউশন। তাই স্নানটা এসেই করব। গালে হাত রাখলাম। খরখর করছে। কামিয়ে নেব? নাঃ...শেভটাও তোলা থাক। আপাতত জামাটা বদলে নিলেই চলবে।

নীল জিন্‌স আর সাদা টি শার্ট পরে যখন বেরোনোর জন্য তৈরি হলাম তখন প্রায় দশটা বাজে। কালো আর সাদা দুটো রংই খুব স্মার্ট। পরতে ভালো লাগে। খুব মানানসইও। কী মনে হল, একটু পারফিউমও ঢেলে নিয়েছি। গা থেকে ঘামের গন্ধ এলে ভীষণ অস্বস্তি হয়। নিজেকে ভীষণ ক্লান্তও লাগে। পারফিউমের ঝিমঝিমে তাজা সুগন্ধের চনমনে ভাবটা ক্লান্তি কাটায়, সতেজ রাখে।

রুমের পর্দাগুলো টেনে জুতো পরে বাইরে বেরোব, হঠাৎ আবিষ্কার করি দরজার ফাঁক দিয়ে পাপোশের উপর কখন যেন এসে পড়েছে একটা সাদা চিরকুট। কৌতূহলবশত তুলে নিয়ে দেখলাম স্পষ্টাক্ষরে কালো কালিতে লেখা আছে দুটো লাইন—'I am sorry. তুমি কি আমার উপর রেগে আছ?'

ঘরের ডাস্টবিনটা খুব কাজের জিনিস। ওটা না থাকলে এসব আবর্জনা যে কোথায় ফেলতাম!

ঝকঝকে সবুজ শাক পাতায় ভরা চুপড়ি, আনাজে ভর্তি বস্তা, রুপোলি মাছের তড়বড়, পেঁয়াজ, বাঁধাকপি, টম্যাটো, ঢ্যাড়স, ধনেপাতার গায়ে এখনো ফোঁটা ফোঁটা জলবিন্দু। রং দেখেই চোখ জুড়িয়ে গেল। এত ঘন রং যে বাইরে

থেকে দেখলে তাজা বলেই মনে হয়। দাসবাবুকে সেকথা বলতেই বললেন—

—'রূপ দেখে ভুলো না ভাই। ওসব কেমিক্যাল রং। একপ্রস্থ ধুলেই উঠে যাবে।' তিনি হাসছেন—'কখনো বাজারে যাওনি—তাই না?'

—'নাঃ।'

—'কে করে বাজার?'

—'লোক আছে।'

দাসবাবু তখন কয়েকটা টম্যাটো তুলে পরখ করছেন। টুকটুকে লাল কচি কচি টম্যাটো দেখে মুঠোয় ধরার লোভ সামলাতে পারলাম না। একটা ধরতেই ঠান্ডা ঠান্ডা জলবিন্দুগুলো তালু স্পর্শ করল। আঃ!...কী ঠান্ডা! কাঁচা সবজির বুনো গন্ধ। মাটির বুকে সদ্যোজাত কচি ঘাসের সৌরভের মতো প্রাকৃতিক।

—'তোমার স্যালাডের জন্য আর কী লাগবে সম্রাট?'

—'টম্যাটো, পিঁয়াজ, শসা, বীট, গাজর, কাঁচালঙ্কা, বাঁধাকপি, পুদিনা-পাতা, আঙুর, বেদানা, আপেল...।'

টম্যাটোর থলেটা ট্রলিতে রেখে দাসবাবু বললেন—টম্যাটো, পিঁয়াজ, বাঁধাকপি, কাঁচালঙ্কা হয়েছে, বাদবাকিগুলো নিশ্চয়ই ফ্রুট ভেন্ডারস আর মছলি কামান থেকে পেয়ে যাব। চলো।

কয়েকশো লোকের ভিড়কে অগ্রাহ্য করে, একে কনুইয়ের গুঁতো মেরে ওর পা মাড়িয়ে, লোকের হিন্দি, উর্দু মেশানো গালিগালাজ খেতে খেতে এগোচ্ছি। দাসবাবুকে অর্ক যে 'এক্সপার্ট লোক' বলেছিল, দেখলাম বেশি বাড়িয়ে বলেনি। উনি যেভাবে ধীরেসুস্থে টিপেটুপে পরখ করে সবজি ব্যাগে ভরছিলেন, আর দাম দরে টানাটানি করছিলেন তাতেই বোঝা যাচ্ছিল সত্যিই অভিজ্ঞ। কিন্তু আমার আবার বেশি দরাদরি করতে খুব লজ্জা লাগে। উনি দোকানদারের সঙ্গে মারপিট করছিলেন। আর আমি গুটিগুটি পায়ে খানিকটা তফাতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। যাতে কেউ বুঝতে না পারে, যে লোকটা সবজিওয়ালার সঙ্গে দরাদরি করছে, আমি তারই সঙ্গী।'

—'হয়েছে—কই? সম্রাট?'

—'এই যে।'

ট্রলিটা আরো খানিকটা ভরে উঠল।

বাজার সারতে সারতেই বোধহয় ঘণ্টা তিনেক।

হাঁটার সময়ই টের পাচ্ছিলাম একটা বাঁধাকপির পাতা জুতোর সোলে

লেগে গেছে। মাঝেমধ্যেই পা-টা স্কিড করে যাচ্ছে। তবু সেটাকে অগ্রাহ্য করে গোটা সবজি বাজার ঘুরে, ঘেমে গলে জল হয়ে সব কটা আইটেমকেই ট্রলিবন্দি করেছি। আশেপাশে যেসব ক্রেতারা ভিড় জমিয়ে আছে তাদের প্রায় সবই হিন্দুস্থানী। এখানে প্রচুর বাঙালি থাকে বলে শুনেছি। কিন্তু সকালের এই ব্যতিব্যস্ত বাজারে তাদের কারোরই দেখা পাওয়া গেল না।

—'করলার সবজি দিয়েই এরা সব ভাত, রুটি খেয়ে নিতে পারে। ভাবতে পারো?'

—'হুঁ।'

—'করলা তো তিতো। তার তরকারিতে কী স্বাদ পায় কে জানে! যতসব অখাদ্য খাওয়া।'

—'আসলে বাঙালিদের জিভটা অন্যান্যদের তুলনায় ধারালো দাসবাবু। আমার এমন অনেক অবাঙালি বন্ধু আছে যাদের কাছে খাওয়াটা কোনো ব্যাপার নয়। দুপুরবেলা একটা স্যান্ডউইচ আর এককাপ কফি খেলেই খুশি। কিন্তু আমার তো ওতে পেট ভরে না।'

—'তা বটে।' দাসবাবু মাথা নাড়লেন—

—'আমাদের বাড়িতে অবশ্য অত খাওয়ার চল নেই। বেশিরভাগ সময়ই এক তরকারি ভাত। টুনি তো তেমন মাছ টাছ পছন্দ করে না। তোমার কাকিমা আর আমি তেমন জবরজং ভালোবাসি না।'

ভালোবাসেন না! হায়দরাবাদে এসে মাছ মাংস কিছুই তো বাদ দিচ্ছেন না। বরং অভিজিতের পর খাওয়ার ব্যাপারে ওরাই এগিয়ে। সকাল থেকে শুরু করে রাতে শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত হোটেল থেকে যা যা খাবার জিনিস দেওয়া হয় তা নির্বিবাদে খেয়ে ফেলেন।

—'অনেকদিন পর এত জিনিস একসাথে বাজার করলাম বুঝলে?' দাসবাবু হাঁটতে হাঁটতে বললেন—'বাড়িতে তো তেমন বাজার করি না। সেই এক ডাল, ভাত, আলু পটলের তরকারি। খুঁটিনাটি মোচা, লাউ, কচু, বা এঁচোড় ব্যাগ থেকে বেরোলেই তোমার কাকিমার মুখ গোমড়া হবে।'

—'মুখ গোমড়া হবে মানে? বাড়ির কর্তা আপনি। আপনার খেতে ইচ্ছে হতেই পারে। তাতে কাকিমার মুখ গোমড়া হবে কেন?'

—'মোচা, এঁচোড় কোটাটা খুব সময়সাপেক্ষ। কষ্টকর। তাই বাড়ি আনামাত্র অশান্তি শুরু হয়ে যায়।

আশ্চর্য! কেন জানি না মাথাটা আচমকা গরম হয়ে গেল। অকারণেই একরাশ ক্ষোভ এসে জুটেছে কণ্ঠস্বরে—'সে কী! আপনার ইচ্ছার কোনো দম নেই ওঁর কাছে? গোটা সংসারটাই আপনি চালান। বাড়ির আপনিই হেড। তবে?'

আমার রাগ হওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অন্যর ব্যক্তিগত ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করার অভ্যাসও নেই। কিন্তু তবু রাগ হল। বেড়াতে আসা ইস্তক লক্ষ করছি ওই মহিলা গোবেচারা স্বামীটিকে নাকে দড়ি দিয়ে নাজেহাল করে ছাড়ছেন। ভদ্রলোকও মুখ বুঁজে চুপচাপ সহ্য করে যাচ্ছেন। কোনো কিছুতেই যেন মহিলার মন ওঠে না। আমি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম সংসারের নিয়ম কি তবে এই? যা কোনোরকম আড়ম্বর না করে অনাবিল সহজভাবে নেমে আসে, যে প্রেম অনুগত, কর্তব্যপরায়ণ, যা প্রতিদান চায় না তার কোনো স্বীকৃতি নেই! তাকেই কি ছুড়ে ফেলে দেওয়া সহজ? একমাত্র সে-ই কি কিছু পায় না? তবে এই কাপুরুষগুলো কেন আজীবন ওই মহিলাদের পায়ে মাথা মুড়িয়ে পড়ে থাকে? কেন ছুড়ে ফেলে দিতে পারে না ওদের?

—'দাসবাবু, মিসেস দাসের প্রতি আপনার কোনো অভিযোগ নেই?'

দাসবাবু প্রত্যুত্তরে হাসলেন। তার হাতের ব্যাগ থেকে ভেটকি মাছের লেজ উঁকি মারছে। সেটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন—

—'অবশ্যই আছে। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সংসার করছি। এ ক'বছরে অভিযোগ থাকবে না তা হয় না কি?'

—'তবে?'

তিনি আবার হাসলেন। যেন আমার এই 'তবে?'—এর পিছনের প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন। ওই দুটো শব্দের আড়ালে যে মানেটা ছিল তা তার কাছে স্পষ্ট।

—'এক কাপ চা খাওয়াবে সম্রাট?'

নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হলাম। সত্যিই তো। প্রশ্নটা বোকার মতো করে ফেলেছি। দাম্পত্য জীবনের ব্যক্তিগত কথা আমাকেই বা বলতে যাবেন কেন উনি? প্রশ্নটা করাই অনুচিত। অনধিকার চর্চা।

—'খাওয়াব। চলুন।'

কাছেই একটা চায়ের দোকান ছিল। আমি সাধারণত যেসব জায়গায় চা খেয়ে থাকি, তার মতো একেবারেই নয়। ছোট্ট একটা গুমটির মতো দোকান।

যে সসপ্যানটায় জল গরম হচ্ছে সেটা পুড়ে পুড়ে প্রায় ননস্টিক। সামনে কাচের বয়মে দু-তিন রকমের বিস্কুট। দোকানের ভিতরে যারা বসে আছে তারা বেশির ভাগই হকার বা মজুর শ্রেণির।

—'ক্যায়া লেঙ্গে সাব?'

—'দো কাপ চায়।'

—'ব্রেড অমলেট চাহিয়ে?'

—'নেহি।'

মাটির ছোটো ছোটো ভাঁড়ে বিবর্ণ চা। প্রায় জন্ডিস রোগীর মতো ফ্যাকাশে। ধোঁয়া ওঠা বিস্বাদ তরলে চুমুক দিতে দিতে গাড়ির দিকে এগোলাম। চাঁদিফাটা রোদটা ব্রহ্মতালুকে আস্তে আস্তে উষ্ণ করে তুলেছিল। এ সি গাড়ির ভিতরে উঠে বসে হাঁফ ছাড়ি। যাক—শান্তি।

—'হোটেল চলো।'

দাসবাবু চুপচাপ চা খেয়ে যাচ্ছিলেন। আমারটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। একটা সিগ্রেট ধরালাম। বাপরে বাপ। সারাজীবনে বোধহয় এত পরিশ্রম কখনো করিনি। কপাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পড়ছিল। রুমাল দিয়ে মুছে নিই। নয়তো পরে ঘাম জমে ঘামাচি হবে। ঘামাচির কুটকুটানি—ওঃ—হরিবল।

—'তোমার বয়স কত স্যার?'

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কেউ আমায় প্রশ্নটা করল। বললাম—'থার্টি টু।'

দাসবাবু চায়ের কাপটা জানালা দিয়ে গলিয়ে বললেন—তুমি আমার বড়ো ছেলের সমবয়সি। তোমাদের বয়সে আমি দুই ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে গিয়েছিলাম। সরকারি হাসপাতালে চাকরি করতম। মাস গেলে মাইনে ছিল একশো পঁচিশ টাকা বুঝলে? বাহাত্তর সালের কথা বলছি। তখন মাথার উপর মা বাবা ছিলেন। এক বোন ছিল। সব মিলিয়ে বাড়ি ভাড়া বাদ দিয়ে মোট একশো কুড়ি টাকায় সাতজনের সংসার চলত।' উনি মিটমিট করে হাসছেন। দু চোখেও হাসি চকচক করছে। যেন খুব মজাদার একটা রসিকতা করছেন। হাসতে হাসতেই বললেন—'এ পরিস্থিতিতে তোমার কাকিমার জায়গায় অন্য কোনো মেয়ে থাকলে পালিয়ে যেত। শাড়ি, গয়না তো দূরের কথা। দু বেলা পেটপুরে খেতে দিতেও পারিনি। তোমার কাকিমা কিন্তু তখনো আমায় ছেড়ে যায়নি। মুখ বুজে সহ্য করেছে। করলে অনেক অভিযোগই করা যেত। কিন্তু একটা অভিযোগও করেনি।'

দাসবাবু স্মিত হাসি মুখে মেখে জানলার বাইরে তাকিয়ে আছেন। সেই হাসিতে কোনো অভাববোধের 'অ'ও নেই। হীনম্মন্যতা নেই। যেন জানেন যে ইকোনমিক্যালি তিনি কতটা অভাবী। আর তার সঙ্গে এ-ও জানেন যে কতটা পরিপূর্ণ। ওঁর পাশে নিজেকে কেমন যেন হিংসুটে দৈত্য বলে মনে হচ্ছিল। ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম।

—'ড্রাইভার, একটু গাড়িটা সাইড করাও তো'—দাসবাবু ড্রাইভারের কাঁধে হাত রেখে বললেন—'বুঝলে সম্রাট, ছাড়া যখন পেয়েছি তখন আরেকটু ঘুরে নিই। ঘরে ফিরলেই তো আবার সেই প্যানপ্যানানি শুরু হবে। বুঝলে, এই কচকচির ঠ্যালায় গোটা লাইফটাই হেল হয়ে গেল। এখানেও একটা পার্ক আছে দেখছি। একটু বসেই নিই—কী বলো?'

বিকেলের ক্যাম্পফায়ারের প্রস্তুতির চোটে গোটা দুপুরটাই জমজমাট হয়ে উঠল। খাবার জিনিসগুলো একটুও না ফেলে, ছড়িয়ে কিংবা ঘেঁটে গাড়িতে তোলার জন্য যে কী মারাত্মক ক্যালিবারের প্রয়োজন তা নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারছিলাম। ভুট্টাগুলোকে ডিকিতে ভরতে গিয়ে দুটোকে পিষে ফেলেছি। আঙুরগুলোর বেশ কয়েকটা টুপটাপ করে ফেটে রস ছড়িয়ে পড়ল। চিপ্‌সও গুঁড়ো গুঁড়ো হতে হতে টের পাচ্ছিল যে কার হাতে পড়েছে। কাজুবাদামগুলোরও পাউডার হওয়ার কথা। তার আগে অর্ক এসে খপ করে হাত থেকে প্যাকেটগুলো ছিনিয়ে নিয়ে বলে—'ক্ষ্যামা দে বাপ।'

সারাদুপুর ভাতঘুম মাটি করে, এর আনাড়িপনায় হেসে, ওর উপর খবরদারি করে, 'হাঁই হুঁই' করে সবাইকে তটস্থ করে দিয়ে অর্ক যখন শান্ত হয়ে বসল তখন বিকেল সাড়ে চারটে বাজে। অলসভাবে আড়মোড়া ভেঙে, ছোট্ট কয়েকটা হাই তুলে হাত-পা ছড়িয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিল। তিস্তা এসে তাকে ধাক্কা মেরে তুলেছে।

—'এই, এটা টেস্ট করে দেখ তো নুন কম হয়েছে কি না।' তার হাতে গরম পিঁয়াজি। সদ্য তেল থেকে তুলে আনা। তখনো চড়বড় করছে। অর্কর সন্তর্পণে 'উঁহু উঁহু' করতে করতে করতে আলগোছে কামড়। জিভের অল্প নাড়াচাড়া। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে মন্তব্য—মিষ্টিটা একটু বেশি মনে হচ্ছে।'

—'মিষ্টি।'

—'তাই তো মনে হচ্ছে।'

—'শিওর?'

—'হ্‌ম্‌ম্‌ম্‌... 'অর্ক একটু ভেবে বলল—'ঝালটাও বোধহয় একটু বেশি।'

—'ঝাল!'

—'নুনটাও হতে পারে।'

তিস্তা রেগে গিয়ে বলল—'এরকম কনফিউজিং কথাবার্তা কেন বলো? খেয়ে যা মনে হয়েছে সেটাই বলো না।'

—'যা মনে হল তাই-ই তো বললাম।'

—'ধ্যেৎ।' তিস্তা আমার দিকে বাটিটা এগিয়ে দিয়েছে—'তুমি টেস্ট করে বলো তো কেমন হয়েছে?'

—'আমি যে খুব বড়ো টেস্টার সে খবর তোমায় কে দিল?'

—'কেউ দেয়নি। খেয়ে দেখলেই বোঝা যায়। তার জন্য টেস্টার হওয়ার দরকার নেই।'

—'বেশ' একটা পিঁয়াজি মুখে পুরে দিলাম। জিভে পড়তেই ছ্যাঁৎ করে উঠল। গরমের চোটে প্রথমে স্বাদটা বুঝতেই পারিনি। এদিক-ওদিক নাড়াচাড়া করার পর মনে হল নোনতা স্বাদটা একটু কড়া।

—'অর্ক ঠিকই বলেছে নুনটা একটু বেশি।'

—'নুনপোড়া?'

—'না অতটাও নয়। তবে সামান্য কম হলেই বোধহয় বেশি ভালো লাগত।'

—'সামান্য কম? আচ্ছা।' বাটি নিয়ে তিস্তা চলে গেল।

এ কদিন ধরেই কথা নেই বার্তা নেই যখন-তখন বৃষ্টি এসে পড়ছিল। প্রোফেসর মুখার্জি বৃষ্টি দেখতে ভালোবাসেন। ঝড় এলেই জানালার সামনে বসে পড়েন। কিন্তু আমার ভালো লাগে না। আগেও একবার এই বৃষ্টিই আমার ডাইজাগের প্রোগ্রাম মাটি করেছে। গোটা আরাকুভ্যালিটাই দেখতে দেয়নি। এবারও যথারীতি ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখে আঁতকে উঠেছিল। ভেবেছিলাম এবারও হয়তো বৃষ্টির চোটে বেড়াতে আসা সত্ত্বেও হোটেলের রুমে ঘরবন্দি হয়ে বসতে থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অতটা ভোগায়নি। আজ সকালের ঝিলমিলে রোদটা এক ঝলক স্বস্তির নিঃশ্বাস দিয়ে গেছে। এখন শেষরক্ষা হলেই বাঁচি।

নিজের রুমে ফিরে এসে খুঁটিনাটি জরুরি জিনিসপত্র গুছোচ্ছি। সিগ্রেটের

প্যাকেট, জলের বোতল আর কয়েকটা প্রয়োজনীয় টুকিটাকি। প্রফেসর মুখার্জি সোফার উপর বসে আপেল খাচ্ছিলেন। প্রফেসর রুদ্রর কল্যাণে লাঞ্চটাও আজকাল শান্তিতে করতে পারছেন না। তাই অবসর সময়ে অল্পস্বল্প ফলটল খেয়েই পিত্ত রক্ষা করেন। আজও একটা আপেল নিয়ে বসেছেন।

—'তোমরা বেরোচ্ছ কখন?' কড়াৎ করে আপলের গায়ে কামড় বসিয়ে বললেন...

—'ফিরতে রাত হবে?'

—'জানি না প্রফ। কেন?

প্রফেসর একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—'তোমাকে খুব মিস করব।'

—'আমাকে!'

—'হ্যাঁ। তোমাকে।' তিনি হাসলেন—'এই কদিন তোমার সাথে থেকে থেকে বদভ্যাস হয়ে গিয়েছে। একা একা থাকতে ভালো লাগে না।'

—'একা কোথায়? প্রফেসর রুদ্র আছেন না?'

—হ্যাঁ...তা বটে।' একটু থেমে বললেন—'কিন্তু...।'

—'কী?'

—'কিচ্ছু না। বোতল নিয়েছ? দেখছি না যে?'

—'বোতল।'

—'তোমার প্রেমিকা—রাতে যাকে ছাড়া তোমার চলে না। তাকে সাথে নিয়েছ তো? সুরাসুন্দরী?'

—'ওঃ!' হাসলাম—'মনে করিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ প্রফ। কিন্তু আজ ওটা থাক।'

প্রফেসর এক ঝটকায় খাড়া হয়ে বসেছেন—'একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে! সিরিয়াসলি বলছ? এদিকে এসো, কাছে এসো দেখি।'

আমি ওর পাশে গিয়ে বসে পড়ি—'দেখুন।'

—'তোমার শরীর টরীর খারাপ হয়নি তো সম্রাট?'

—'না।'

—'তবে কি মন খারাপ?'

—'নাঃ।'

—'তবে কি ঠাট্টা করছ?'

—'না। তাও নয়। আজ ভালো লাগল না প্রফ।'

প্রফেসর আমার দু হাতের উপর নিজের হাত রেখে বললেন—'সত্যি বলছ?'

খুব অস্বস্তি লাগছিল। ভদ্রলোকের হাবভাব এমনিতেই রহস্যময়। আজ কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল। লোকটা ঠিক কী চায়? কিছু একটা গোলমালের ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কী।

আমাদের পিকনিক স্পটটা গোলকোন্ডা ফোর্টের একদম কাছে। গোলকোন্ডার উঁচু পাঁচিলের কালো ছায়া এখান থেকেই স্পষ্ট দেখা যায়। দপ করে আগুন জ্বলে উঠতেই লাল ফুলকিতে সামান্য লালচে হয়ে উঠল। উঁচু উঁচু পাথরের ঢাঁই সেই রক্তিম কালো অন্ধকার মেখে বুক ফুলিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রাচীরের ঢেউখেলানো খাঁজকাটা মাথায় জমাট অন্ধকার।

ওদিকে চোখ পড়তেই গা শিরশির করে ওঠে। স্বপ্নের মধ্যে কী আশ্চর্য বাস্তব হয়ে ধরা দিয়েছিল সে। সেই গম্বুজ, সেই খিলান, সেই রুচেটা ছোপ-ছোপ পাথরের দেওয়াল। ডাইনোসরের পিঠের মতো কাঁটা কাঁটা অথচ মজবুত পাঁচিল। পাথরের সিঁড়ি। একমুখ অন্ধকার নিয়ে গরাদহীন জানলার হাঁ। সবই এক। সবই অপরিবর্তিত। স্বপ্নের ঝাপসা প্রেক্ষাপট নয়। বাস্তবের মতো স্পষ্ট দৃশ্যে দেখেছি তাকে। কোথাও কোনো ভুল ছিল না। পুরোটাই ছিল নিখুঁত।

—'ঝলক দিখলাজা...ঝলক দিখলাজা...একবার আ-জা, আ-জা, আ-জা; আ-জা, আ-জা...।'

বিকটেল আনুনাসিক কণ্ঠস্বরে পিলে চমকে গেল। এ গানটা এখানকার অন্যতম একটা সুপারহিট গান। লোকে খুব শুনছে। কলকাতার যেখানেই যাই না কেন—হিমেশ রেশমিয়ার গানের চোটে কান ঝালাপালা। ভেবেছিলাম হায়দারাবাদে এসে লোকটার হাত থেকে বোধহয় বেঁচেছি। কিন্তু নাঃ—এখানেও সেই পলিপাসীয় সুরের উন্মাদনা হানা দিয়েছে।

চতুর্দিকে রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার মধ্যে জড়ো করা শুকনো কাঠে জ্বলজ্বলে আগুন জ্বলছে। মাঝেমধ্যে ফুলকি আগুন ছড়াচ্ছে। পটপট করে ছোবড়া থেকে জোনাকির মতো আগুন উড়ছিল। অভিজিৎ কাঠ দিয়ে আগুনটাকে খোঁচাচ্ছে, আর বাদবাকিরা সব গোল হয়ে মজলিশে আর আড্ডায় মশগুল। মাখন মাখানো উষ্ণ ভুট্টায় দাঁত বসানো মাত্র অকৃত্রিম আস্বাদে গলে গেল।

—'অভি, ভুট্টা একটু বেশি পুড়িয়ে ফেলেছিস।' তিস্তা বলল—'এটা নুন লেবু মারার জন্য ঠিক আছে। কিন্তু বাটারের জন্য দানাগুলো আর একটু নরম থাকা দরকার।'

—'আরো নরম! তুই ভুট্টা খাচ্ছিস না ক্ষীর!' অভিজিৎ হেঁকে বলল—চিবোতে এত কষ্ট হলে দাঁতগুলো রেখেছিস কেন? সব কটা তুলে ফেলে গঙ্গুতেলির মা হয়ে যা।'

—'পিছনে গোলকোন্ডা ফোর্টটা দেখেছিস!...হোটায় আ সিনারিও!' অর্ক একদৃষ্টে ফোর্টটার দিকে তাকিয়ে আছে—'যতবার এটাকে দেখি ততবারই গা শিরশির করে ওঠে। ভয়ও লাগে।'

—'এটা শুধু তোরই নয়, বোধহয় সবারই হয়। আমিও লক্ষ করে দেখেছি বুঝলি।' অভিজিৎ বলে—'ইনফ্যাক্ট যদি বিউটির দিক দিয়ে ধরিস তা হলে গোলকোন্ডা, আগ্রা ফোর্ট বা ফতেপুর সিক্রির ধারে কাছেও আসে না। তা সত্ত্বেও অদ্ভুত হন্টিং না?'

—'ভেবে দ্যাখ। একসময় পাঁচটা রাজবংশ এখানে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। কত আলো কত আওয়াজে তখন এই ভাঙাচোরা ফোর্টই গমগম করত। অথচ আজ...।'

ফচ করে সোডা বোতলের খোলা মুখ দিয়ে ফেনা বেরোল। শিবাকুমারণ সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের ক্যান খুলে আলতো চুমুক দিচ্ছে। একটু আগেই সে আস্ত একটা চকোলেট বার খেয়েছে। ভুট্টায় তার বিশেষ রুচি নেই। কিন্তু ইতিহাসে আছে। ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ উঠতেই তার চোখ চকচক করে উঠল—'ইতিহাস সবসময় ফিরে আসে স্যার। অতীতের হাত থেকে আজ পর্যন্ত কেউ পালাতে পারেনি। ইতিহাস সবসময় চাবুক মেরে মনে করিয়ে দিয়েছে অতীতের কথা। এর নামই ইতিহাস।'

—'সাউন্ডস ইন্টারেস্টিং।' তিস্তা চকোলেট বারে হালকা কামড় বসিয়ে বলল—ব্যাপারটা খুলে বলো।'

—'খুলে বলার কিছু নেই ম্যাডাম।' শিবাকুমারণ গুছিয়ে বসে—'history repeats itself এটাই হল ঘটনা। শুরু থেকে লক্ষ করুন। যে কটা রাজবংশ এখানে শাসন করে গেছে একটা বাদে আর সবগুলোরই ইতিহাস এক। বিশ্বাসঘাতকতা, বেইমানি, প্রবঞ্চনা। শুধু এই রাজবংশগুলো কেন? সবজায়গায় সেই একই ঘটনা। সিরাজের ছিল মীরজাফর। রাবণের ছিল

বিভীষণ। বলবন খলজীর ছিল আলাউদ্দিন। ডানকানের ছিল ম্যাকবেথ। জুলিয়াস সীজারের ব্রুটাস...।'

—'খুঁজলে আরো পাওয়া যাবে কিন্তু...।'

—'কিন্তু কিছু নয় ম্যাডাম। এটাই প্রত্যেকটা রাজবংশের ইতিহাস। প্রত্যেক রাজবংশেই থাকে ষড়যন্ত্র আর বিশ্বাসঘাতকতা। যে রাজবংশে এই দুটো জিনিস নেই, সে রাজবংশ রাজবংশই নয়।'

সন্ধ্যা নেমে আসার পর থেকে গলাটা কেমন যেন শুকনো লাগছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আজ কিছুতেই মদ খাব না। কেন এরকম প্রতিজ্ঞা আমি করেছি জানি না। কিন্তু যখন করেছি তখন রাখার চেষ্টা করতে হবে। তাই বাধ্য হয়েই সফ্ট ড্রিঙ্কসে চুমুক দিচ্ছি।

শিবাকুমারণ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—'আজ গোলকোন্ডার এই ভাঙাচোরা, হতগৌরব অবস্থাও একটা মাত্র লোকের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। ভাবতে পারেন?

—'ঘটনাটা লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের সময় শুনেছি। ব্যাপারটা বুঝিনি।' অর্ক বলল—'একটু খোলসা করে বলবে? ১৬৮৭ সালে ঔরঙ্গজেবের আক্রমণে গোলকোন্ডার পতন হয় সেটা বুঝেছি। কিন্তু ট্রেচারির ব্যাপারটা...।'

—'বলছি স্যার।' আগুনটা একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল। শিবাকুমারণ কয়েকটা কাঠের টুকরো ফেলে দিতেই আবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠে লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠল।

—'আপনারা বোধহয় জানেন না কুতুবশাহী বংশের স্থাপনই হয়েছিল ট্রেচারির মাধ্যমে। বহমনী সুলতানের এক বিশ্বস্ত সুবাদার সুলতান কুলি খাঁ তৎকালীন সুলতানকে খুন করে মসনদে বসেন।'

—'সুলতান কুলি?—মানে প্রফেসর রুদ্র?'

—'হ্যাঁ...সেই সুলতান কুলি।' শিবাকুমারণ বলল—'কিন্তু বেইমানি তাকে ছাড়ল না। তার বড়োছেলে জামশেদ-ই মসনদ পাওয়ার লোভে তাকে খুন করে। এই অবধি বুঝতে নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধা হয়নি।'

—'না। খানিকটা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড থেকে আর খানিকটা প্রফেসর রুদ্রর সৌজন্যে বুঝেছি।

—'তবে এর পরের ঘটনা শুনুন। জামশেদ কিন্তু রাজসিংহাসন বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি। ১৫৪৩ থেকে ১৫৫০ অবধি রাজত্ব করার পর তিনিও

দুরারোগ্য রোগে মারা গেলেন। তাঁর শিশুপুত্র শোভন কুলি কুতুবশাহী মসনদে বসল ঠিকই, কিন্তু সে বছরই সুলতান কুলির ছোটোছেলে আর জামশেদের ছোটো ভাই ইব্রাহিম গোলকোন্ডা আক্রমণ করে দখল করে নেন। এই ইব্রাহিম ও তার সহধর্মিনী ভাগীরথীরই সন্তান মহম্মদ কুলি কুতুব শাহ ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে স্থাপন করেন 'ভাগ্যনগর' যা বর্তমানে—হায়দরাবাদ। 'মহম্মদ কুলি গোলকোন্ডার শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁর কোনো ছেলে ছিল না। মেয়ে হায়াত বক্সি বেগমের মধ্যে যোগ্য শাসক হওয়ার সব গুণ ছিল। কিন্তু মেয়ে হওয়ার দরুন তিনি রাজ্যশাসন করতে পারেন না। তাই এই প্রথম বিনা রক্তপাতে গোলকোন্ডা আবার হস্তান্তরিত হল। আরো একটি বংশের কাছে। এবার সুলতান হলেন মহম্মদ কুতুবশাহ—হায়াত বক্সির স্বামী ও মহম্মদ কুলির জামাতা। তাঁর রাজত্বকাল ১৬১২ থেকে ১৬৩৬।

—'কিন্তু ঔরঙ্গজেব কখন আক্রমণ করেন? মহম্মদ কুতুব শাহের আমলেই কি?'

—'না। তাঁর ছেলে আবদুল্লা কুতুবশাহের আমলে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হয়ে আসেন। তখনই গোলকোন্ডার ঐশ্বর্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, শিল্প-সংস্কৃতি প্রায় তুঙ্গে উঠেছে। ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেব এলেন। আর ১৬৫৬ তে প্রথম গোলকোন্ডা আক্রমণ। আবদুল্লা কুতুবশাহ আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল দিয়ে পালিয়ে বাঁচলেও স্থির মস্তিষ্ক হায়াত বক্সি বেগম প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে সন্ধি করে নেন। প্রচুর বাৎসরিক কর দিতে স্বীকার করায় সেবারের মতো আপদ বিদেয় হল। কিন্তু এরপরের সুলতান আবুল হাসান ছিলেন স্বাধীনচেতা লোক। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি কর দেওয়া বন্ধ করে দেন। ফলস্বরূপ ১৬৮৭ তে দ্বিতীয় আক্রমণ।'

—'আর তার ফলেই গোলকোন্ডার পতন। তাই তো?' অভিজিতের বোধহয় ঐতিহাসিক আখ্যান শুনতে ভালো লাগছিল না। সে কোনোমতে প্রসঙ্গটাকে শেষ করতে পারলে বাঁচে। কিন্তু দেখা গেল শিবাকুমারণের আদৌ অত তাড়া নেই। সে আস্তে আস্তে বলল—'ব্যাপারটা অত সোজা ছিল না স্যার। আবুল হাসান তানাশা প্রস্তুতি না নিয়ে এতবড়ো সিদ্ধান্তটি নেননি। বিশ্বস্ত সেনাপতি আব্দুল রজ্জাককে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এমন তাণ্ডব শুরু করলেন যে ঔরঙ্গজেব পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। গোলকোন্ডার দরজা তখন বজ্র আঁটুনিতে আটকানো। তাই ঢোকার উপায় নেই। অগত্যা রুদ্ধ কপাটের বাইরে

থাকা গেড়ে বসে থাকতে হল ঔরঙ্গজেবকে।

কিন্তু সে বসে থাকারও একটা সীমা আছে। গোলকোন্ডার ভিতরে খাদ্যভাণ্ডার পূর্ণ থাকলে সেখানকার মানুষ নিশ্চিন্তে একবছর খেতে পারত। জল সরবরাহ এত উন্নত যে তা নিয়ে চিন্তারও কিছু ছিল না। সুতরাং ঔরঙ্গজেবকে দশমাস রুদ্ধ দরজার বাইরে থাকতে হল। ওদিকে তাদের খাওয়ার রসদ শেষ হয়ে এসেছে। রোদ, ঝড়, বৃষ্টি মাথায় করে বসে থাকতে থাকতে শরীর ভেঙে পড়েছে। সৈন্যরা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। অথচ কী বিড়ম্বনা! দুর্গের দেওয়াল ও দরজা এতই মজবুত যে কামান বা হাতি দিয়ে ভেঙে ফেলাও যাচ্ছে না। তাই আঙুল কামড়ানো ছাড়া তাদের আর অন্য উপায় ছিল না। শেষ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেব অন্য পথ নিলেন। এক বিশ্বাসঘাতককে টোপ দিলেন। তাঁর ক্যালকুলেশন একদম সঠিক ছিল। রাতের অন্ধকারে, যখন গোলকোন্ডা ফোর্টের ভিতরে সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। তখন অন্যদিকে চুপিসাড়ে খুলে গেল দুর্গের একটা দরজা, সেটা এখন ফতেহ দরওয়াজা নামে পরিচিত। অতর্কিত মোগল আক্রমণের সামনে যথাসাধ্য প্রতিশোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেও পারা গেল না। মারা গেলেন আব্দুল রাজ্জাক। বন্দি হলেন আবুল হাসান তানাশা। মোগল সৈন্য দুর্গ ভাঙচুর করল। বিশ্বাসঘাতকতায় যে রাজবংশের উত্থান হয়েছিল, সেই বিশ্বাসঘাতকতায় তার সমাপ্তি ঘটল। এই জন্যই বলেছিলাম History alaways repeats itself'।'

—'তারপর?'

—'তারপর আর কী? ঔরঙ্গজেব এবার রাজধানী গোলকোন্ডা থেকে ঔরঙ্গাবাদে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। আর তারপর রাজ্যের ভার মীর কামারুদ্দিন খানকে দিয়ে ফিরে গেলেন দিল্লিতে। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। ঠিক তার ১৭ বছর পরে অর্থাৎ ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে মীর কামারুদ্দিন চিন কিলিচ খানের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আসফজাহি বংশের প্রতিষ্ঠাও হয়। তখন থেকে ২২৪ বছর ধরে মসনদে তারাই থাকে।'

—'কুতুবশাহী বংশের আর কেউ বেঁচে নেই?'

অর্কর প্রশ্নটা শুনে শিবাকুমারণ কিছুক্ষণ চুপ থাকল। তারপর বলল—

—'কী জানি স্যার? হয়তো আছে। হয়তো বা নেই। কে খবর রাখে?'

আগুনের ছটা তার চোখে পড়ে ঝিলমিল করে উঠছিল। কাঠের স্তূপ থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে অর্ক সিগারেট ধরায়। তিস্তার ভুরু কুঁচকে

গেছে। তার ভ্রূকুটিকে একেবারে সাইডে ফেলে বলল—'আচ্ছা, তোমরা তো ফোর্টের মধ্যে অনেক ঘোরাঘুরি করেছ। কখনো এমন কিছু দেখেছ যা অস্বাভাবিক?'

—'অস্বাভাবিক মানে?'

—'মানে ও একটা ভূতের গল্প শুনতে চাইছে।' আমি এক্সপ্লেন করে বললাম—'আছে না কি স্টকে দু-চারটে?'

শিবাকুমারণ হাসল—'আছে। কিন্তু সেকি আপনাদের ভালো লাগবে? আপনারা এসব বিশ্বাস করেন না।'

—'আরে বিশ্বাস করা তো পরের কথা। আগে শোনাও তো! হিস্ট্রির চেয়ে বরং তাই ভালো।' অভিজিৎ বাবু হয়ে বসেছে—'এতবড়ো ফাঁকা মাঠ, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া, পিছনে অন্ধকার ফোর্ট আর ভূতের গল্প...।'

—'উইথ গরম পিঁয়াজি—কেমন হবে?'

অর্কর কথায় নেচে উঠল অভিজিৎ—'গ্রেট, এই কে আছ? পিঁয়াজি লাও।'

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। টকাটক তুড়ির আওয়াজে চটকা ভাঙল। অভিজিৎ দু আঙুলে তুড়ি মারতে মারতে বলে—'এত কী ভাবছিস র‍্যা? আবার কবিতা লিখতে শুরু করে দিবি না তো?'

অর্ক হা হা করে হেসে উঠে বলল—'লেখার কথা ভেবে থাকলে আমাদেরও দু-চার কলি শোনা।'

—'কলি নয়।' তিস্তা তার ভুল শুধরে দিয়েছে—'চু-চার লাইন।'

—'ওই একই হল। You know তিস্তা? একসময় সম্রাট আমাদের শায়র-এ-আজম ছিল। দারুণ কবিতা লিখত। ভালো গানও গাইতে পারত। হ্যাঁ রে...এখনো পারিস?'

—'নাঃ' বললাম—'পারি না, ছেড়ে দিয়েছি।'

—'একদম ছেড়ে দিলি?' অর্ক ব্যথিত হয়ে বলল—'কেন রে? ভালোই তো গাইতে পারতিস।'

—'আজ একটা হবে না কি?' দাসাবু বললেন—'সুন্দর একটা গা ছমছমে পরিবেশও আছে। ভালো দেখে একটা ধরেই ফেলো।'

—'না।' নিজের অজান্তেই মুখটা বোধহয় শক্ত হয়ে গিয়ে থাকবে। অর্ক সেটা লক্ষ করেই তাড়াতাড়ি বলল—'আচ্ছা...আচ্ছা...তোকে গাইতে হবে না।

তার চেয়ে সাউন্ড সিস্টেমে একটা peppy নাম্বার লাগা। একটু নেচে নিই।'

—'দারুণ আইডিয়া।' অভিজিৎ ক্যাসেটপ্লেয়ারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল—'তুই আর তিস্তা যুগলবন্দি নাচবি। ডান?' ক্যাসেট প্লেয়ারে ঝিকচিক করে বিট বেজে উঠল। অক্টোপ্যাড, আর ড্রামপেটের কানফাটানো রিদম। তার সাথে সেই আনুনাসিক কণ্ঠস্বর...

—'আঁশিক বানায়ী...আঁশিক বানায়ী...আঁশিক বানায়ী...আপনেঁ...' অর্ক তিস্তার হাত ধরে টেনে তোলে। তিস্তা একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। অর্ক হেসে তার কোমর সাপটে ধরেছে। তালে তালে পা মিলিয়ে নাচার চেষ্টা করছে। কিন্তু অর্কর তাল জ্ঞান এতই খারাপ যে তিস্তা হি হি করে হেসে তার বুকে উলটে পড়ে বলল—'ধুর, নাচতেই পারে না, আনাড়ি।'

—'তু খিলাড়ি ম্যায় আনাড়ি।' অর্ক তিস্তাকে টুইস্ট দিতে গিয়ে নিজেই একপাক ঘুরে নিল—'আরে...আরে...।'

—'ছাড়িব না...এসো...।'

অভিজিৎ একা একা নাচছিল। শিবাকুমারণ হাসতে হাসতে হাতে তাল মেলাচ্ছে। মিসেস দাসের মুখ গম্ভীর। সম্ভবত ধাড়ি ধাড়ি লোকগুলোর তাণ্ডবনৃত্য তার ভালো লাগছে না। টুনি নির্বিকার। সে একটু দূরে বসে দেখছে।

—'কী রে? উঠে আয়। অভি এগিয়ে এসে আমার কবজি চেপে ধরেছে—'আজও হুঁকোমুখো হ্যাংলা হয়ে বসে আছিস। আয় একটু নাচ প্র্যাকটিস কর। খাবারদাবার হজম হয়ে যাবে।'

—'আমি এখান থেকে দেখছি। তাই-ই ভালো লাগছে। নাচটাচ আসে না।'

—'কার আসে? আমার আসে না অর্কর আসে? যা করছি তা কুরুবক নেত্য। তাতেই মজা লাগছে। উঠে আয় না—হেভি মস্তি হবে।'

—'তোরা মজা কর। আমি দেখছি।

—'ধুস শালা। তুই আর পালটালি না। টিপিক্যাল বেরসিক।'

অভিজিৎ আবার নাচতে নাচতে ফিরে গেল আগুনের কাছে। উদ্দাম নৃত্যে হাত-পা ছুড়ে লাফাচ্ছে। নাচের চোটে হাঁফও ধরছে। কিন্তু থামাথামির কোনো সিন নেই।

আমার এই ছেলেমানুষি পাগলামি ভালো লাগছিল না। মনে মনে হিসাব করছিলাম, আর ক'ঘন্টা হাতে রয়েছে। আজকের রাতটা কাটলেই কাল সারা

দিন আবার সেই ব্যস্ততা। বেরোনোর তাড়া, গুছানোর তাড়া। স্থিরতার সম্ভাবনা নেই। পরশু ফেরার পালা। সবাই নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। দৈনন্দিন ব্যস্ততায় হয়তো যোগাযোগও থাকবে না। টুনি উত্তর না পেয়েই ফিরে যাবে। আমিও উত্তর দেওয়ার সুযোগ আর পাব না।

তার চেয়ে এই সুযোগ! ভাবতেই মনটা হাঁকপাক করে উঠল। নাঃ... যথেষ্ট হয়েছে! যা করার এখনই করতে হবে। যে আমার, তাকে আমিই নেব, এখনই! অনেক দেরি করে ফেলেছি। আর দেরি করা যাবে না!

সোজা তাকিয়ে দেখলাম আগুনের ওপ্রান্ত থেকে টুনিও আমার দিকেই দেখছে। নিষ্পলক, অনিমেষ।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াই।

—'কোথায় যাচ্ছিস?' অর্ক নাচতে নাচতে বলল—'লাফিয়ে উঠলি যে?'

—'এই একটু আসছি।' পাছে আরো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় এই ভয়ে কোনোদিকে না তাকিয়েই হনহন করে হাঁটা মেরেছি। টুনি এই নাচানাচি থেকে একটু দূরে বসে আমাকেই দেখছিল। ওর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি দেখে অবাক হল। ভয়ও পেল বোধহয়।

—'এই উঠে আয়।'

—'কেন?' ভীতু ভীতু গলায় বলল সে—'আমি কী করেছি?'

—'আমি তোকে উঠতে বলেছি।'

—'কিন্তু...।'

—'তোর সাথে আমার কথা আছে।'

—'কথা?' সে তাকিয়ে দেখল সকলেই নাচানাচিতে ব্যস্ত। মিসেস দাস বুড়ো লোকগুলোর নাচানাচিতে অতিষ্ঠ হয়ে রান্নাগুলো গরম করতে শেফকে সাহায্য করছেন। অভিজিৎ দাসবাবুকে টেনে নিয়ে দলে ভিড়িয়েছে।

—'আচ্ছা চলো।'

দুজনে মিলে হাঁটতে হাঁটতে মাঠ পেরিয়ে রাস্তার দিকে চলেছি। দূর থেকেই আমাদের গাড়িটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল। বিরাট ফাঁকা জায়গায় একমাত্র মানুষের উপস্থিতির চিহ্ন। দূরে গোলকোন্ডা ফোর্টের লম্বা দেওয়াল-টাও আমাদের সাথে হেঁটে চলেছে। ঝোপের গায়ে জোনাকি জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। একগুচ্ছ সবুজ আলোর মহোৎসব।

—'তুমি কি এখনো রেগে আছ সম্রাটদা?'

—'না।'

—'তবে?'

—'তবে কী?'

—'আমায় ডেকে আনলে কেন?'

—'বললাম না, কথা আছে।'

—'কী কথা?'

—'শুনতেই পাবি।'

টুনি আর কোনো কথা বলল না। নিশ্চুপে আমার সাথে হেঁটে চলল। জঙ্গলের গায়ে বুনো গন্ধ। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ডাক। এখানকার জমি মেটে নয়, পাথুরে। ছোটো ছোটো নুড়ি, কাঁকড়ের উপর সাদা জ্যোৎস্না পড়ে চকচক করে উঠছে। যেন দিগন্ত বিস্তৃত নদীর চর। কাছেই কোথাও পাখির ডানা ঝাপটানোর ফটপট শব্দ। কোনো রাতচর উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। আস্তে আস্তে পিছনের আগুনটা একবিন্দু আলো হয়ে আসছে। তার পাশে নৃত্যরত ছায়াগুলোও অন্ধকারে মিশে গেল।

—'টুনি, দাঁড়া।'

টুনি থমকে দাঁড়াল। নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগছে। উশখুশ করছি। এসব কথা কী করে বলে? কীভাবে বলতে হয়? কিছুই তো জানি না।

—'তোকে এভাবে এখানে ডেকে আনার জন্য sorry। কিন্তু এমন কিছু বলতে চাই যা সবার সামনে বলা যায় না।'

—'বলো।'

—'টুনি, আমি...।'

টুনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। চাঁদের আলোয় স্নান করে অনাঘ্রাত কুঁড়ির মতো পবিত্র সৌরভ নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমার জন্য! রোমাঞ্চে, আনন্দ, বুকে একটা তীব্র যন্ত্রণা হাঁসফাঁস করছিল।

—'টুনি আমি তোকে...

—'কী?'

—'আমি...আমি জানি না।'

আবেগ যতক্ষণ রুদ্ধকপাটে মাথা ঠুকে মরে ততক্ষণ তাকে লাগাম দিয়ে রাখা যায়। কিন্তু একবার দরজা ভেঙে বেরোতে পারলে তাকে আর আটকানো মুশকিল। একেবারে হা রে রে রে করতে করতে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমি সারাজীবনে যে বিন্দুতে কখনো যাইনি, অদম্য আবেগ আমাকে সেইখানেই টেনে নিয়ে গেল। জ্বরবিকারগ্রস্ত রোগীর মতো আমি একটা মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে প্রলাপ বকতে চাইছি। টুনিকে জাপটে ধরে প্রথমে বৃষ্টির উচ্ছ্বাসে বলতে চাইছি—'টুনি আমি খারাপ। আমার অতীত খারাপ। সব ভুলতে চাই। তুই ভুলিয়ে দে। অনেক রাত জেগে জেগে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি। তুই ঘুম পাড়িয়ে দে। আমি বেওয়ারিশ। কারো নই। তুই আমাকে তোর করে নে। সারাজীবনের জন্য। চিরদিনের জন্য। জন্মজন্মান্তরের জন্য।'

কিন্তু আমি মুখে কিছু বলতে পারিনি। আমার শরীর বলছিল। টুনি বাধা দিল না। সপ্রতিভভাবে বক্ষলগ্না হয়ে বলল—'এখানে নয়। কেউ দেখে ফেলবে। গাড়িতে চলো।'

টুনির শরীরটা আমি আজ দ্বিতীয়বার দেখলাম। একেবারেই সাদামাটা শরীর। তবু কী অজানা আকর্ষণ আমাকে পাগল করে দিচ্ছিল।

টুনি...টুনি...আমার পার্বতী, আমায় ভালোবাসবি? টুনি, আমাকে কেউ ভালোবাসতে শেখায়নি। শুধু শরীরকে দলিত মথিত করতে শিখিয়েছে। তোর কচি নরম বুকের উপর আমায় টেনে নে। নীলকণ্ঠ ফুলের স্তূপের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ব আমি। তোর সাথে একা নেমে যাব সমুদ্রের গভীরে। জানি তোর দু পায়ের মাঝখানে সে অঙ্গটা আছে সেখানে অনেক ঝিনুক জমে আছে। প্রতিমাসের শেষে যে ঝিনুকগুলো ভেঙে মুচড়ে ঝরে পড়ে তোর রজস্রাবের সঙ্গে। আমি সেই ঝিনুকের মৃতদেহ সম্মানে সারাদেহে মেখে নেব। তুই চাইলে তোর রজস্রাব আমি তিলকের মতো মাথায় পরে নিতে পারি। তুই চাইলে অতলে তলিয়ে থাকা ঘুমন্ত ঝিনুকগুলোকে নিষিক্ত করে দেব আমি। যা কখনো কাউকে দিইনি, তাই দেব তোকে। একটা সত্যিকারের অমূল্য মুক্তো। তোর গর্ভে একটু একটু করে ফুটে উঠবে সে। সে পিতৃপরিচয়হীন হবে না। সে অসুস্থ হবে না।

টুনি, তোর ব্যথা লাগছে না তো? এই দ্যাখ, তোর বুকে আমি আলতো আলতো করে চুমু খাচ্ছি। কামড়াচ্ছি না—যদি তোর লাগে। চাঁদের আলোয় পুরু, বুক দুটো বড়ো লোভনীয়; তবু কামড়াচ্ছি না। শুধু ঠোঁট, মুখ ছোটো ছেলের মতো তোর বুকে ঘষছি। 'হাত বোলাচ্ছি।' নরম ত্বক, নরম স্তনগোলকের স্পর্শ আমায় টেনে নিচ্ছে তোর দিকে। আজ আমায় আশ্রয় দে টুনি। সম্রাট চৌধুরী কখনো এমন ভিখিরির মতো রিক্ত হতে চায়নি আরো

কাছে। আয় টুনি। আমি আর পারছি না।

টুনি, তুই জানিস না, কতকগুলো যোনি আমি পেরিয়ে এসেছি। আমার লিঙ্গ ক্লেদাক্ত হতে হতে ক্রমাগত ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। তুই তার গায়ে চন্দন মাখিয়ে দে। তোর মধ্যে আমায় টেনে নে। রাহুর মতো পুরোপুরি গ্রাস করে নে। আমার...আমার লজ্জা করছে টুনি...আমার শীত করছে। তোর পায়রার মতো শরীরে ঢেকে দে আমার শরীরটাকে। দুই ডানায় আঁকড়ে ধরে মিশিয়ে নে তোর দেহে। ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে আমার শেষ নিঃশ্বাসটুকুও ধরে রাখ। রাক্ষসের প্রাণ তিস্তার জরায়ুতে থাকবে না। থাকতে পারে না। তোর নিঃশ্বাসে হৃৎস্পন্দনে তার প্রাণভোমরা নেচে বেড়াবে। আয় টুনি, যোনি মেলে ধর। আমায় নে...আমি এসেছি...সম্পূর্ণভাবে নে...তোর দেহে স্বার্থপরের মতো... আঃ...টুনি...টুনি...শুধু তুই...শুধু তুই আমার ঠিকানা...তোর ভ্যাজাইনায় ঘুমোব আমি...ঘুমোবে বহু সম্রাট চৌধুরীরর সফল-অসফল সত্তা।

আঃ...টুনি...ঢুকতে দে আমায়...গভীরে...আরো গভীরে...উষ্ণ, সিক্ত বিবরে দুই ডানায় আঁকড়ে ধরে মিলিয়ে নে তোর দেহে। ...আঃ...আঃ...আঃ!

গাড়ির নীল কাচের উপর জ্যোৎস্নার আলো পড়ে কেমন একটা নীলাভ আভা এসে পড়েছিল আমাদের উপর। সামনে স্টিয়ারিংয়ের গোল চাকতিটা ঢালের মতো চকচক করছে। গুমোট গরমে দুজনেই ঘামছিলাম। একজোড়া আদিম মানব-মানবীর মতো আমরা। টুনির গরম ঠোঁট আমার গলার কাছে নীরব। আবেগঘন গরম নিঃশ্বাস ঝাপটা মারছে চোখে মুখে। পেলব কমনীয়তায় যৌবন ঢলঢল করছে শরীরে।

—'টুনি? খুব কষ্ট হয়েছে?'

টুনি মাথা নাড়ল। তারপর আবার আমার বুকে মুখ গুঁজে চুপ করে শুয়ে রইল। ওর উরুর উপর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। দু উরুতে যেন গর্জন তেল মাখানো। কিংবা কাচের তৈরি। রেশমি আলো পিছলে পড়ে অপার্থিব সুন্দর লাগছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে তাই-ই দেখছিলাম। দেখছিলাম আর ভাবছিলাম জীবনটা এত সুন্দর। আগে কখনো দেখিনি তো!

—'সম্রাটদা, কিছু হবে না তো?'

—'কী হবে?'

ভীতু ভীতু গলায় মেয়েটা বলল—'যদি কিছু হয়?'

—'হলে হবে। দেখা যাবে।'

সে আমার বুকের ভিতর থেকে বলল—'আমার পিরিয়ড শেষ হয়েছে দশ দিন হল।

কথাটা শুনে সাংঘাতিক কিছু প্রতিক্রিয়া হল না। সন্তান যদি আসে তো আসবে। সে আমারই উত্তরাধিকার। তার দায়িত্ব নেওয়ার সামর্থ আমার আছে। তবু ঠান্ডা গলায় বললাম—'আগে বলিসনি কেন? এখন বলে তো লাভ নেই। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।'

টুনি চুপ করে গেল। বুকের উপর একটা কম্পন অনুভব করে বুঝলাম সে কাঁদছে। হেসে বলি—'দূর বোকা। খোকা মানুষ করতে হবে ভেবে কাঁদছিস। আমি তো আছি। এত ভয় কীসের?'

সে আমাকে দু হাতে আরো জোরে আঁকড়ে ধরেছে। কান্নার বেগ আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

—আবার কী হল?'

—'একটা কথা বলব?'

—'বল।'

—'তুমি আমার সেদিনের কথাটায় রাগ করোনি তো?'

পাগলি! এখনো সেদিনের ঘটনাটা মনে করে বসে আছে। যত বলি রেগে নেই, কিছুতেই বিশ্বাস করে না। এটাকে নিয়ে আমি যে কী করব। সারাজীবনই টিস্যুপেপারের রোল হাতে নিয়ে বসে থাকতে হবে দেখছি।

—'না রে বাবা রেগে নেই।'

—'ঠিক?'

—'ঠিক।'

—'সম্রাটদা।' সে মুখ তুলে বলল—'প্লিজ তুমি আমার ওপর রেগে থেকো না। তুমি যা বলবে আমি তাই করব। যা চাইবে তাই করব। সারাজীবন যদি তোমার কেপ্ট হয়েও থাকতে বলো, থাকব। কিন্তু...।

—'কিন্তু কী?'

—'আমার দাদার চাকরিটা হওয়া ভীষণ দরকার! ওটা না হলে আমাদের সংসার চলবে না। প্লিজ সম্রাটদা, তুমি ওটা করে দাও। আমি আর কিছু চাই না। শুধু দাদার চাকরিটা...।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলাম। শুনছিলাম কি? কানের ভিতর দিয়ে শব্দগুলো মাথায় পৌঁছে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কিছুই বুঝতে

পারছি না। কী বলছে ও?

জীবনে এই প্রথমবার মনে হয়েছিল Life is beautiful. এই প্রথম মনে হয়েছিল বেঁচে থাকার একটা মানে আছে। মনে হয়েছিল আমি আবার-আমার কৈশোরে ফিরে গিয়েছি। অন্ধকারের জগৎ আমায় স্পর্শ করেনি। ছাতে গোলাপের টবে কুঁড়ি ধরলে উদগ্র কৌতূহলে প্রতি মুহূর্তে চেয়ে থেকেছি। দেখতে চেয়েছি কেমন করে ওটা ফুল হয়ে ফোটে। বাবার পাঞ্জাবির ন্যাপথলিনের গন্ধের মতো তাজা একটা চনমনে জীবন কয়েক মুহূর্তের জন্য সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু আমার জীবনটা আসলে পাগলা মেহের আলি। যখনই ক্ষুধিত পাষাণের রোম্যান্টিক পেলব সৌন্দর্য আমায় ঘিরে ধরে, তখনই সে গলা ছেড়ে চিৎকার করে বলে—'সব ঝুট হ্যায়...।'

সব মিথ্যে! ওদের চোখের জল মিথ্যে। ওদের প্রতিশ্রুতি মিথ্যে! সব মায়াবীর ছলনা। আসলে ওরা সব রান্ডি!... সব শালা রান্ডি... সব শালা...।

টিভিটা চলছিল। চলতে চলতে নাচছিল। ভোল্টেজ আপ ডাউন হওয়ার সাথে সাথেই চৌকা পর্দাটা তিড়িক তিড়িক করে নাচছে। স্ক্রিনে সলমন খান আর প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। স্পিডবোটের উপরে অনাবৃত পেশির নাচনকোঁদন আর সি বিচে বিকিনি পরা নায়িকার বালির উপর একা একা শুয়ে নানা বিভঙ্গে রতিরসের প্রদর্শনী।

ঘড়িতে রাত দশটা বাজছে। বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে চ্যানেল সার্ফ করছি। প্রফেসর এখনো ফেরেননি। দরজাটা তারই প্রতীক্ষায় হাট করে খোলা। ঘরে ফিরে আমাকে এই অবস্থায় দেখে কতটা অবাক হবেন সেটাই দেখার। ভেবেছিলেন মাতালটা বোধহয় এবার মদ ছাড়ল। ভেবে বেশ খুশিও হয়েছিলেন। তিনি তো আর জানেন না মাতালের মদ ছাড়া আর স্ত্রৈণের ডিভোর্স প্রায় একই।

আমিও ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম হয়তো ছাড়তে পারব। কিন্তু দেখছি মদ আমায় ছাড়বে না। পাপ আমায় ছাড়বে না। অতীত আমায় ছাড়বে না। স্বপ্ন দেখতে দেখতে ভেঙে যাওয়াটা একরকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এ অভ্যাস হয়তো আমরণ-ই থেকে যাবে। যেমন করে থেকে গেছে কালো চাদর। যেমন করে রয়ে গেল গোলকোন্ডা ফোর্টের অন্ধকার।

চটর চটর করে চটির শব্দ। টেনে দেওয়া পর্দাটা নড়ে উঠল।

—'হ্যালো সম্রাট।' প্রফেসর দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে পড়েছেন—'How is life? ফাস্‌ক্লাস?'

—'Life is so boring proff... বলতে পারেন কেন?' আমি বোতলটা ব্ল্যাঙ্কেটের তলায় গুঁজে দিই। কিন্তু প্রফেসরের চোখ বোধহয় এড়ায়নি। একটু অবাক হয়েই বললেন—'একী! তুমি আবার...!'

—'স্ব মূর্তিতে প্রফ।' হেসে বলি—'চোরায় না শোনে ধর্মের কাহিনি।'

—'সে জানি।' প্রফেসরের চোখেমুখে ছোটো ছোটো জলের কণা। একটা সুন্দর ফ্রেশ মিষ্টি গন্ধ লেগে আছে। স্নানটা বোধহয় অভিজিতদের ঘরেই সেরেছেন। চিন্তিত স্বরে বললেন—'কিন্তু চোরা তো নিজেই ধর্মের কাহিনি বলছিল। হঠাৎ উলটো সুর ধরল কেন?'

—'ওঃ হো...এটাও জানেন না। ওটা তো ছল ছিল। দুর্জনের ছলের অভাব হয় না।'

—'প্রবাদ থাক।' প্রফেসর দরজায় ছিটকিনি এঁটে দিয়ে পাশে এসে বসলেন।

—'কী হয়েছে?'

—'কী হবে?'

—'পিকনিকে যাওয়ার সময় তো খুব খোশমেজাজে ছিলে, হঠাৎ আবার কী হল?'

—'কী হবে? কিছুই হয়নি।' আমি পা দুটো ভাঁজ করে পাশ ফিরলাম।

—'মানুষের মন প্রফ। কখন ভালো থাকবে, কখন খারাপ তার ঠিক কী?'

—'Philosophy' তিনি হাসলেন—'Philosophy' আউড়ে সব সময় সব কিছু চাপা দেওয়া যায় না সম্রাট। যেমন মদের গন্ধ। বোতলটা যতই ব্ল্যাঙ্কেটের তলায় চাপা দাও, গন্ধটাকে লুকোতে পারোনি।'

—'লুকোনোর চেষ্টাও হয়তো করিনি। আপনি বয়স্ক মানুষ, সেইজন্য সৌজন্যবশত ওটা চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলেছিলাম। দেখেই যখন ফেলেছেন তখন লুকিয়ে লাভ নেই।'

—'সৌজন্যবশত যখন এ কাজটা করেই ফেলেছ তখন আরো একটা কাজও করেই ফেলো।'

—'কী?'

—'তোমার বুকে খয়েরি রঙের লিপস্টিক লেগে আছে। চোখ পড়লেই অস্বস্তি হচ্ছে। একটু সাফা করে এসো।'

—'শিওর।'

ইচ্ছে না থাকলেও বিছানা ছেড়ে উঠতেই হল। প্রফেসরের কতটা অস্বস্তি হয়েছে জানি না। কিন্তু তার কথা শোনামাত্রই আমার তিক্ততাটা আরো কয়েক মাত্রা বাড়ল। কিছু কিছু জিনিস মুছে ফেলা অসম্ভব। লিপস্টিকের দাগ মোছা সহজ। কিন্তু চুমুগুলো মোছা যায় না।

জলের ঝাপটায়, সাবানের ঘষাঘষির চোটে দাগ তো মুছলই, তার সাথে সাথে জায়গাটা লাল হয়ে উঠল। ঘষা খেয়ে আর নখের খোঁচায় অল্প অল্প জ্বালাও করছে। আফটার শেভ লাগাতেই প্রথমে কটকট করে উঠল। তারপর আস্তে আস্তে ঠান্ডা। সব ধুয়ে মুছে বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি প্রফেসর টিভি-র চ্যানেল পালটে দিয়েছেন। সেট ম্যাক্সের জায়গায় এখন চলছে আজ তক। রঙিন পর্দায় গ্রেগ চ্যাপেলের উদ্যত তর্জনী। বারবার রিপ্লেতে ফিরে ফিরে আসছে।

তিনি গম্ভীর মুখে খবর দেখছিলেন। আমি পাশে গিয়ে বসতেই টিভি অফ করে দিলেন।

—'অফ করলেন কেন? দিব্যি তো চলছিল।'

—'এতক্ষণ দিব্যি চলছিল। এবারে চলবে না।' প্রফেসর রিমোটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলেন—'এখন আমি তোমার কথা শুনব।' আমি ব্র্যাঙ্কেটের তলা হাতড়াচ্ছি। বোতলটা রাখলাম কোথায়? তাড়াহুড়োয় এখানেই তো রেখেছিলাম। অথচ এখন পাচ্ছি না। আড়চোখে সেটা লক্ষ করে বললেন—

—'কী খুঁজছ? মদের বোতল?'

—'হ্যাঁ। এখানেই তো রেখেছিলাম...।'

—'ওটা এখানে আছে।' তিনি বাঁ হাত তুলে দেখালেন। তার হাতে আমার বারো পেগের মদের বোতল। সিকিভাগ ফাঁকা।

—'ওঃ...দিন।'

—'না।' বোতলটা দূরে সরিয়ে রেখে বলেন—'ওটা এখন পাবে না। আগে তোমার কথা বলো।'

—'কী বলব?'

—'আজ তুমি মদ খাবে না বলেছিলে। এমন হওয়ার কথা ছিল না। তবে

হচ্ছে কেন?'

—'আপনার কেনর কোনো উত্তর নেই প্রফ। ওটা একটা অভ্যাস হয়ে গেছে। না খেলে ঘুম আসে না।'

—'কেন? আমাদের তো এমনিই ঘুম আসে। তার জন্য মদ খেতে হয় না।'

—'আপনার ব্যাপার আলাদা।'

—'কোথায় আলাদা?'

—'আপনার সাথে তর্ক করে পেরে উঠব না প্রফ। তার চেয়ে বোতলটাই দিন।'

এই লোকটা কী চায়! যত ভাবি লোকটাকে খারাপ কিছু বলব না, ততই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খারাপ কথাগুলো টেনে আনে। ওর উপর বিরক্ত হতে চাই না। তবু বিরক্ত করেই ছাড়বে। আমায় এমন তিতিবিরক্ত করে, নৃশংস করে তুলে লোকটা কী আনন্দ পায়?

হাল ছেড়ে দিয়ে বলি—'আচ্ছা, বলুন কী শুনতে চান?'

—'কী হয়েছে তোমার?'

—'Nothing Proff...'

—'তবে?'

—'তবে কী?'

—'বোতল নিয়ে বসলে কেন?'

—'বললাম তো আমার ঘুম হয় না।'

—'না হয় না হবে। তোমার সাথে আমিও আজ জেগে থাকব। আমরা দুজনে মিলে গল্প করব। দুটো সুখ দুঃখের কথা বলব। মন্দ কী? একটা রাত না হয় না-ঘুমিয়েই কাটালে। নেশায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকার চেয়ে সে অনেক ভালো।'

—'তা হয় না।'

—'কেন?'

—'আপনার ঘুম আমি মাটি করতে পারি না।'

—'আমাকে বন্ধু ভাবলেই পারো।'

—'আপনাকে বন্ধুত্ব আমার কোন্ কাজে লাগবে?'

—'কাজে লাগিয়েই দেখো। লাগবে।'

নাঃ, ফালতু কথা হয়েছে। ভদ্রলোক যেন ইচ্ছে করেই খোঁচাচ্ছেন। লক্ষ করে দেখেছি উনি যেন আমাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই উত্তেজিত করে তুলতে চান। তাতে ওঁর কী উপকার হয় জানি না। কিন্তু আমার ভীষণ এনব্যারাসিং লাগে।

—'কী হয়েছে সম্রাট?' উনি ঝুঁকে পড়ে কাধে হাত রাখলেন—'কেউ কিছু বলেছে? অর্ক বা অভিজিৎ?'

—'না।'

—'তবে কি মন খারাপ? পিকনিকে কিছু ঘটেছে? বন্দনার ব্যাপারে...।'

—'ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওসব থাক। দিন।'

—'না।'

—'প্লিজ।'

—'তুমি বোধহয় শোনোনি সম্রাট। আমি বলেছি 'না।'

—'It's enough Professor.' মরিয়া হয়ে বলি—'আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন।'

—'করলে করছি।' তিনিও শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন—'শোনো, তুমি হয়তো গুরুজনদের সম্মান জানাতে শেখোনি। এটা তোমার দোষ নয়। হয়তো সে শিক্ষা তুমি পাওনি। কিন্তু আমি পেয়েছি। আমার সামনে তুমি মাতলামি করে ভুলভাল বকবে তা আর সহ্য করব না।'

—'ঠিক আছে, আমি ছাতে গিয়ে খাচ্ছি।'

—'না। তুমি কোথাও গিয়ে খাবে না। তুমি আজ কিছুতেই খাবে না।'

—'আশ্চর্য! আপনি আমার উপর জোর করছেন!'

—'হ্যাঁ, করছি। কারণ তোমার একটু শিক্ষা পাওয়ার দরকার।'

—'শিক্ষাটা কে দেবে? আপনি না কি?'

—'প্রয়োজন পড়লে আমিই দেব।'

এবার রাগের পারদ ধৈর্যের চরম সীমা অতিক্রম করে গেল। অনেকক্ষণ সহ্য করছিলাম। এবার আর থাকতে না পেরে ফেটে পড়ি।

—'কী শিক্ষা দেবেন আপনি আমায়? অন্যের ব্যাপারে গায়ে পড়ে হস্তক্ষেপের শিক্ষা? ওসব মিডল ক্লাস সেন্টিমেন্ট। You are nothing but a piping tom.'

—'Yes, I am piping tom. একটা লোক নিজেই নিজের সর্বনাশ করছে

তা আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না। আমার সবচেয়ে বড়ো শত্রু slow poison করে suicide করতে চাইলেও আমি বাধা দেব। এটা প্যানপ্যানে Melodrama নয়, humanity'.

—'আপনাদের মতো humanism-এ বিশ্বাসী লোকেদের জন্য আমার একটাই কথা আছে। G-o to he-ll, দিন।'

—'ফাইন, নাও।' প্রফেসর বোতলটা নিয়ে জানলার কাছে উঠে গেছেন। জানলার কাচ খুলে হাতটা বাইরে চলে গেছে।

—'What the hell are you...' আমি বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেলাম তার দিকে। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমার চোখের সামনে বোতলটা লাট খেতে খেতে নীচে পড়ছে। চোখ বড়ো বড়ো করে দেখছি। কিছু করার নেই। চটাস করে নীচে আছড়ে পড়ার শব্দ। ঝন্‌ঝন্ করে কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়েছে।

আমর মাথার ঠিক ছিল না। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে গিয়েছিল। ওই বোতলটা...ওই বোতলটা একটু ঘুম এনে দিতে পারত। একটু শান্তি এনে দিতে পারত। ওই যে, নীচে শত টুকরো হয়ে পড়ে আছে আমার ক্ষণিকের উপশম। এই লোকটা...স্কাউন্ড্রেলটা ওটা ভেঙে দিয়েছে। ওকে...ওকে আমি...।

খপ করে লোকটার কলার চেপে ধরেছি। হাত উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে।

—'You rascal ! What are you think about yourself !'

—'সম্রাট!'

—'মদ খেয়ো না...মদ খেয়ো না...কেন খাব না? আমি পুরুষ। তাই খাই। তোমরা হিজড়ে। মায়ের আঁচলে ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে থাকো। আমাকেও হিজড়ে করে রাখার প্ল্যান।'

—'সম্রাট, কলার ছাড়ো।'

—'ছাড়ব না। মেয়েছেলে আর মদ পুরুষমানুষের জন্য। আমার জন্য, নপুংসকের জন্য নয়। কী চাও...কী চাও তুমি?...কী পেলে...।'

ঠাস করে গালে একটা মোক্ষম চড় এসে পড়ল। তার সাথে সাথেই আরো একটা। অবধারিত পাঁচ আঙুলের আঘাত। সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে দু গালে ছাপ বসে গেল। আমি হতবুদ্ধি। মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছিল না।

দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিস করে বললেন প্রফেসর—'বড্ড উদ্ধত তুমি।

বাবা-মা ভদ্রতা সভ্যতা কিচ্ছু শেখাননি। অনেক আগে...অনেক আগে এটা দরকার ছিল। কেউ কিছু না বলে একটা অমানুষ তৈরি করেছে।'

আমি কথা বলতে পারছিলাম না। বিস্ময়ে, রাগে, ক্ষোভে, দুরন্ত আক্রোশে কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

—'তুমি আমাকে মারলে!'

—'হ্যাঁ...পারলে তোমায় চাবকাতাম। কিন্তু অতটা অধিকার আমার নেই। নয়তো...।'

—'নয়তো কী?' বোধহয় আমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। কিংবা তিন পেগ খেয়েই মাতাল। পাঁচ আঙুলের স্পর্শে গালে নয়, বুকের ভিতর জ্বালা করছিল। একটা তীব্র যন্ত্রণা বুক, গলা পোড়াতে পোড়াতে একরাশ বুদ্বুদ আর আর আগুনের হলকা নিয়ে উঠে আসছে।

—'থামলে কেন প্রফেসর? মারো আরো মারো।'

—'সম্রাট!'

—'মারো...মারো আমাকে...।'

—'সম্রাট!'

—'দাঁড়িয়ে থেকো না।' চোখের সামনে অন্ধকার। কানের ভিতরে গোঁ গোঁ করে একটা আওয়াজ। শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছি। গলা কাঁপছে। তবু শুনতে পেলাম নিজের উন্মত্ত চিৎকার—'মারো...মারো আমায়...ধরে চাবকাও...তুমি জানো না...তুমি জানো না...আমি একটা জানোয়ার, পশু, বর্বর। তুমি জানে না আমি টোপ ঝুলিয়ে মেয়েদের শিকার করি। আমি টুনিকেও...।'

—'সম্রাট!'

—'কী শুনতে চাও? কী জানতে চাও তুমি? শুনবে? শোনো—আমি একটা খুনি। আমি আমার কাকাকে খুন করেছি। আমি আমার কাকা, আমার অবৈধ জন্মদাতাকে খুন করেছি। প্রফ...আমি জামশেদ, আমিই জামশেদ...আমি খুনি....আমি খুনি...A bloody murderer.'

সারা শরীর অবশ হয়ে আসছিল। পৃথিবীর কেন্দ্রগামী বল সর্বশক্তি দিয়ে তার ভূগর্ভে টানছে। হয়তো আজ পাতালেই চলে যেতাম, তার আগেই দুটো হাত জাপটে ধরে জোর করে বুকে টেনে নিয়েছে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য হুঁশ হারাতে হারাতে কানে এল কয়েকটা শব্দ—'কোয়ায়েট, কোয়ায়েট...শান্ত হও...।'

'বিশ্বাস করো প্রফ, আমি জানতাম না ধাক্কাটা এতজোরে লাগবে...।'

'ছোটোবেলায় বাবার কাছে শুতাম। আমি আর বাবা এক বিছানায়। বাবার গায়ে সাদা পাঞ্জাবি। গায়ে সাবানের গন্ধ। আর প্রতি রাতে ওই লোকটা কালো চাদর গায়ে দিয়ে মায়ের ঘরে যেত। ভয়ে, কাউকে কোনোদিন কিছু বলতে পারিনি। লজ্জায়, ঘেন্নায় কান্না পেয়েছে। প্রথম প্রথম বালিশে মুখ চেপে কেঁদেছি। পরে কান্না চেপে রাখতে শিখেছি। একটু একটু করে মেজাজটা বিক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রাণপণে খারাপ লোক হতে চেয়েছি। আদ্যোপান্ত একটা শয়তান। বাবার মতো ভগবান হলে ঠকতে হয়। তাই শয়তানের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

'বিশ্বাস করো প্রফেসর। আমি লোকটাকে মারতে চাইনি। ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম। বোঝাতে চেয়েছিলাম ওকে কতটা ঘৃণা করি। আঘাত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বুঝতে পারিনি সেই আঘাতে ওর হৃৎপিণ্ড থেমে যাবে। বিশ্বাস করো, আমি ইচ্ছে করে ওকে খুন করিনি। প্রফেসর রুদ্র যাই বলুন... আমি ইচ্ছে করে ওকে মারিনি, তুমি অন্তত বিশ্বাস করো প্রফেসর—আমি খুনি নই...আমি খুনি নই।'

প্রফেসর আমায় আদর করেছিলেন। অনেকটা বাবার মতো। অনেকটা প্রেমিকের মতো। তার ঠোঁট গাল, চিবুক, কপাল ছুঁয়ে যাচ্ছিল। দুটো হাত আমার পিঠে, বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যত ধুলো গায়ে জমা আছে তা সে মুছে দিতে চায়। সমস্ত ব্যথার উপর শান্তির প্রলেপ এগিয়ে দিতে চায়। যে আঙুল একটু আগেই নিষ্ঠুর ছাপ লাগিয়ে দিয়েছে, সেই আঙুলগুলো থেকেই সহানুভূতি ঝরে ঝরে পড়ছিল।

...আমি চেতন অবচেতনের মাঝামাঝি স্তরে ছিলাম। পাকস্থলী থেকে শেষ খাদ্যকণাটুকুও উগরে দেওয়ার পর যে ক্লান্তি ভর করে বসে সেই ক্লান্তিই বহুগুণে ঘিরে ধরেছে। উঠে বসার মতো শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই। প্রফেসরের কাঁধের উপর মাথা রেখে নিস্তেজ নির্বীর্য হয়ে পড়ে আছি...।

'...সম্রাট, তোমার চেয়ে আমি আরো বড়ো পাপী। আমার পাপ—আমি সমকামী। তোমরা ঘেন্নায় মুখ কুঁচকে যে ইংরেজি তিন অক্ষরের শব্দটা ব্যবহার করো—আমি সেই গে। আমার পাপ আমি নারীকে ভালোবাসতে পারিনি। আমার পাপ, আমি বিকৃতরুচি। নিজে একজন পুরুষ হয়েও পুরুষকেই কামনা করি। আমার অপরাধ আমি তোমাকে ভালোবাসি।

কিছু কিছু কথা কানে আসছিল। কিছু আসছিল না। শুধু একটা আলিঙ্গনের আশ্বাস। একটা ওয়েসিস...সবুজে ঘেরা। খেজুর গাছের ছায়া। টলটলে জলের হ্রদ...।

প্রফেসর আমায় আস্তে আস্তে বিছানার উপর শুইয়ে দিচ্ছেন। চোখ বুঁজে সেই স্পর্শটুকু প্রতিটা রোমকূপ দিয়ে ভিতরে টেনে নিচ্ছি। লোভীর মতো একটু ছোঁয়া তারিয়ে তারিয়ে চেখে দেখি। প্রতিটা কোষ হাভাতে জিভ বের করে বলল—'অমৃত...অমৃত...আরো চাই..আরো...।'

—'প্রফ...প্রফ...।'

প্রশান্ত মুখটা ঝুঁকে পড়ল—'কী সম্রাট?'

—'প্রফ...আমায় একটু ঘুম পাড়িয়ে দেবে? আমি ঘুমোতে চাই, তুমি একটু ঘুম এনে দেবে? সারা গায়ে বড্ড ব্যথা...।'

প্রফেসর শুয়ে পড়লেন। বুকের উপর হাত রেখে বললেন—'কোথায় ব্যথা সম্রাট?'

—'সারা গায়ে।'

—'আদর করে দেব?'

—'করো। আদর করো..প্লিজ।'

প্রফেসর কপালে চুমু খেলেন। আস্তে আস্তে চোখ, নাক বেয়ে ঠোঁটের উপর নামলেন। সুদীর্ঘ একটা চুম্বন। যে মানুষটা চুমু খাচ্ছে সে নারী না পুরুষ সেটা আমার কাছে খুব বড়ো হয়ে দাঁড়ায়নি। কিন্তু যে চুমু খাচ্ছে তার মধ্যে কোনো কামড় নেই। কোনো স্বার্থ নেই, রিরংসা নেই। রক্তারক্তিও নেই। আদর করে পাখির পালক বুলিয়ে দেওয়া। তাতে শান্তি আছে। আরো কিছু...।

—'আর কোথায় ব্যথা সম্রাট?'

—'এই যে...এইখানে...।'

—'আর?'

—'এখানে প্রফ...।'

—'তারপর?'

—'এখানে...এখানে...এখানে...।'

সারারাত ধরে এক প্রৌঢ় আর এক যুবক ব্যথার দাওয়াই খুঁজে হাতড়ে বেড়াল। বিছানায়, চাদরে, তোষকে, বালিশে-পাশবালিশে। নিজেদের শরীরে...।'

মানুষের জীবন অন্তহীন। তার শেষ নেই। এরপরও অনেক কিছুই হতে পারে। প্রফেসর রুদ্র সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। আবার না-ও পারেন। কলকাতায় এসে তার জীবন নতুন মোড় নিতে পারে। আবার না-ও পারে।

তিস্তা অরা অর্কর দাম্পত্যজীবন আবার আগের মতো হয়ে উঠতে পারে। অথবা সূক্ষ্ম চিড়ের মতো সম্রাট তাদের মধ্যে থেকে যেতে পারে। তিস্তা অসম দুঃসাহসিকতায় তার সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে। না-ও পারে।

সম্রাট তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারে। আবার উলটোটাও সম্ভব। তিস্তাকে আপন করবে না বন্দনাকে, প্রফেসর মুখার্জির কাছে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেবে কি না, মদ ছাড়বে কি না সবই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সে বিষয়ে কেউ কথা বলে সাধ্য কী?

অভিজিৎ আগের মতোই বিন্দাস থাকতে পারে। কিংবা বিয়ে করে বউয়ের আঁচলধরা হতেও পারে। যাই হোক না কেন, ভবিষ্যৎ সেটা বলে দেবে।

আর প্রফেসর মুখার্জি? তার কথা নাহয় তোলাই থাক। সমকামীর দ্বিধা, দ্বন্দ্বকে ছাড়িয়ে সম্রাটের হাত ধরেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারেন। প্রফেসর রুদ্রর সেবায় লেগে যেতে পারেন। কিংবা সেই একাকিত্বই আবার ফিরে আসতে পারে। কী হবে তা বলবে সময়। কারণ সময় অনেক কথাই বলে।

তারপর?

জীবনের গল্পের কোনো শেষ নেই। তাই তার আর পর নেই, নেই কোনো ঠিকানা। শুধু সারারাত ধরে সেই প্রৌঢ় আর সেই যুবক ব্যথার দাওয়াই খুঁজে হাতড়ে হাতড়ে বেড়ায়। বিছানায়, চাদরে, তোষকে, বালিশে, নিজেদের শরীরে...।

—❋—